নবাঙ্কুর

নবাঙ্কুর

নবাঙ্কুর
নবাঙ্কুর
নবাঙ্কুর
নবাঙ্কুর
নবাঙ্কুর
নবাঙ্কুর

নবাঙ্কুর

সুলেখা সান্যাল

মনীষা

Nabankur
a Bengali Novel
by Sulekha Sanyal
Rupees Twenty Four only.

প্রচ্ছদ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

প্রকাশক
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৫৪এ, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

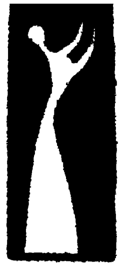
মুদ্রক
মৃণাল কান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা-৯

পঃ বঃ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আংশিক অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

মা ও বাবাকে

এই উপন্যাসের রচনাকাল ১৯২৪ সাল।

এক



এখনও অন্ধকার কাটেনি—শুধু দুটো একটা কাক ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে—এখান থেকে ওখান থেকে। আর সারা বাড়িটায়, আজই প্রথম—আগে, সবা.য়র আগে ঘুম ভেঙেছে ছবির।

রায় দাদুদের গোয়াল থেকে গরুগুলোর পা ঠুকবার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে থেকে থেকে—ঠক্-ঠক্ ঠকাস্, ঠক্-ঠক্ ঠকাস্। কোনদিকের একটা খোলা জানালা যেন বাতাসে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে একবার বন্ধ হচ্ছে, একবার খুলছে। আবার খুলছে, বন্ধ হচ্ছে! জানলার বাইরে বাতাসের শব্দ হচ্ছে—শাঁই, শাঁই—ই।

ঘামে গা ভিজে চপ্‌চপে হয়ে গেছে গরমে। আস্তে আস্তে চোখ খুলে ছবি এবার তার ঘামে ভেজা হাতের তেলোটা চোখের সামনে তুলে ধরে।

দেখতে হয়! বাঁ হাত না—ডান হাত। হাতটাও ঘেমেছে কিন্তু কত পরিষ্কার! হাতের করগুলো এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। রোজ সকালে উঠে হাতটা ময়লা হবার আগেই দেখতে হয়। তাহলে দিন ভাল যায়—পরিষ্কার হাতের মতো মনটাও খুব পরিষ্কার থাকে। ঠাকুমা বলেছে।

ছাই থাকে! সে তো রোজ দেখে হাত, তবু তো তার ঝগড়া হয় কারুর না কারুর সঙ্গে—সেন্টু, দুর্গা, উমা, আশীষ, নয়তো মণিদা।

মণিদাটা কেমন করে ঘুমোচ্ছে দেখ। হি! হি! হাঁ হয়ে আছে মুখটা, এতটুকু একটা গোল হাঁ। এখন যদি মণিদার নিশ্বাস নেওয়া নাকটা দু আঙুলে টিপে ধরা যায়, তাহলে! না বাবা থাক! মার ঘুম ভাঙবে, বাবার ঘুম ভাঙবে।

বাবা ওপাশে ঘুমোচ্ছেন পাশ ফিরে। ছোট্ট খাটখানা বাবার একার। খালি গা, পৈতেটা দেখা যাচ্ছে পেছন থেকে—ঘাড়ের পাশ দিয়ে পড়ে আছে।

ব্রাহ্মণদের পৈতে পরতে হয়—কখনও ছাড়তে নেই। দাদু চান করতে গিয়ে হাত ভরা জল আর পৈতে উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন মন্ত্র পড়ে। বাবা কিন্তু মন্ত্র পড়ে না—বড়কাও না। শুধু পৈতেটা সঙ্গে রাখে।

কায়স্থদের পৈতে নেই। চাঁড়ালদেরও নেই। দুর্গারা তো কায়স্থ। আর পাঠশালার এককোণায় রোজ যারা বসে—হারান, জীবন আর যুগল—ওরা হোল চাঁড়াল। দাদু বলে, চাঁড়ালরা ছোটলোক, ওদের ভাত খেলে জাত যায়, জল খেলেও যায়। কায়স্থদের জল খাওয়া যায় কিন্তু ভাত খেলে জাত যায়।

কিন্তু অধীরকা বলে ওসব নাকি বাজে কথা। মানুষ সবাই একরকম। অধীরকা মাঝে মাঝে ভারি সুন্দর সব কথা বলে···বলে, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র আমার রক্ত, আমার ভাই। চণ্ডাল ভারতবাসী···না, তারপরে আর মনে নেই। অধীরকা-র নিজের কথা না, মাথায় পাগড়ী বাঁধা যার ছবিটা টাঙ্গান আছে তাঁর কথা। তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি কোনও জাত মানতেন না। অধীরকা-ও জাত মানে না। তাই তাকে কেউ দেখতে পারে না। দাদু না, রায়দাদু না এমনকি অধীরকা-র নিজের বাবা পর্যন্ত না। ওরা নাকি স্বদেশী।

স্বদেশীরা ছোটলোকেদের ভাত খায়—ওরা নাকি বন্দুকও চালাতে জানে। সবাই বলে, অধীরকা-ই নাকি পাণ্ডা—অরুণকা, ধীরেনকা, প্রসন্নকা-দের পাণ্ডা। পাণ্ডা কাকে বলে কে জানে! মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

মার গা থেকে কাপড় সরে গেছে। খালি গা দেখা যাচ্ছে। মা কি কালো! রায়দাদুর রঙ কিন্তু খুব ফর্সা। মার রঙ সেরকম নয়। আর কালো হোল অধীরকা, মা'র রঙ সেরকমও নয়। লাল ইঁটের মতো রঙ—পোড়া পোড়া। রান্নাঘরে থেকে থেকে নাকি ওরকম হয়, মা নিজেই বলেছে। হাতগুলোও শিরা ওঠা মার, নীল নীল শিরা, সে হাতে অনেকগুলো চুড়ি আছে, শাঁখা আছে, লোহা আছে। কাকীমার হাতে কাঁচের চুড়ি আছে কিন্তু মার হাতে নেই। মা বলে, বুড়োবয়সে আবার কাঁচের চুড়ি!

ও পাশে ফেরানো মুখ, দেখা যাচ্ছে একটা পাশ। মার কপালটা

খুব চওড়া, বড় কপাল হওয়া নাকি ভাল। ছবির কপালও তো বড়—তারও কি ভাল হবে? কিন্তু মা বলে, মেয়েদের ছোট কপালেই সুন্দর দেখায়। যেমন সেফুর! সবাই সেফুকে সুন্দর বলে। তা আর কি হবে বাবা। ছবির কি দোষ, মা-ই তো তাকে অত বড় কপাল দিয়েছে। মণিদারও তো এ্যাত্তো বড় কপাল!

মণিদার আগে নাকি আরও দুটো বোন ছিল তাদের। কিন্তু সেই দিদিরা মরে গেছে সে হবার আগেই—মণিদারও আগে। মা মাঝে মাঝে সে কথা বলে আর আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। তারা শুনতে চাইলে তবেই বলে, নইলে নয়।

মা খুব কম কথা বলে, কিন্তু সারাদিন কাজ করে। আর একটু পরেই তো উঠবে, উঠে ঘাটে যাবে চান করতে, তারপর ঢুকবে হেঁসেলে। সেই যে ঢুকবে আর রাতের আগে মাকে দেখতেই পাবে না তারা। কত রাত যে হয় মার আসতে!

হয়তো ঘুমটা ভেঙে গেছে তখন শুনতে পায়, এলো-মেলো হয়ে থাকা হাত-পা সরিয়ে দিতে দিতে বকবক করছেন: ছেলের শোওয়ার ছিরি দেখেছ! এই মণি! ভাল হয়ে শো শিগ্‌গির। দেব আর কদিন পরে বৈঠকখানায় পাঠিয়ে।

মণিদাকে মা খুব ভালবাসে। মা-ই তো নাম রেখেছে প্রদীপ। একটা কবিতা পড়েছিল মা—তা থেকেই মণিদার নাম। মা বলে, মণিদা নাকি অনেক বড় হবে—খুব নাম হবে মণিদার।

আহা! ইচ্ছে করলেই যেন হয়! কিন্তু হয় যেন বাবা! হলেতো ভালই।

মা কবিতা বলে মাঝে মাঝে; তাও অনেক করে বললে। গান জানে কিন্তু কখনও গায় না। বউদের নাকি গান গাইতে নেই। ঠাকুমা তবু কিন্তু মাকে বলে: শহুরে বিবি, মেমসাহেব!

মার সামনে বলে না। দাদুর কাছে বলে, নয়তো ঘাটে গিয়ে অন্য বুড়িদের কাছে বলে ঠাকুমা।

ঠাকুমার আরও ছেলে-মেয়ে ছিল তারা মরে গেছে, মাঝে মাঝে ঠাকুমা তাই কাঁদে। ঠাকুমার সঙ্গে দাদুর নাকি বিয়ে হয়েছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে, আট বছর বয়সে।

আট বছর বয়স তো তার পার হয়েই গেছে কিন্তু তার বিয়ে হবে না। আজকাল হয় না। বিন্তিপিসির তো আঠারো, কুড়ি, একুশ বছর বয়স, বিন্তিপিসিরই বলে হোল না।

পিসি কালো বিচ্ছিরি দেখতে, তাই নাকি বিয়ে হয় না। ক-ত বার যে দেখে যায় লোকেরা কিন্তু কেউ পছন্দ করে না। কালো হলে কি হয়? 'কালো তো জগতের আলো।'

এইবার আলো ফুটে উঠেছে বাইরে। মাথার কাছের জানালাটার ওপর বসে একটা কাক কি যেন খাচ্ছে ঠুকরে ঠুকরে। একবার বিচ্ছিরি গলায় ডেকে উঠলেই হয়—সব্বাই উঠে পড়বে। তখন আর আগে ওঠার মজাটা থাকবে না।

উঠে বসা মুস্কিল। শুয়ে শুয়ে ক্রমশ পায়ের দিকে সরে গিয়ে ঝুপ করে খাট থেকে নেমে চোরের মতো নিঃশব্দে দরজা খুলে ছবি চলে আসে একেবারে ছাদে। তারপর ছাদের এক কোণায় পূবদিকটায় ব্যগ্র দুই চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকে গোল থালার মতো আলোক-চক্রটার দিকে তাকিয়ে।

খুব ভোরে ভাল করে লক্ষ্য করলে, ওর মধ্যে সত্যি সত্যি সুয্যি-ঠাকুরকে দেখা যায়! রথে বসে আছেন, মাথায় সোনার মুকুট, হাতে চাবুক। সেই রথ সারাদিন ছুটবে—ছুটবে, ঘুরে বেড়াবে সারা আকাশময়। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে ছবি সেই মুকুট-পরা দেবতাকে দেখার চেষ্টা করে।

পূবদিকের ছাদের ঠিক নিচে রায়দাদুদের মস্ত বড় আম-কাঁঠালের বাগান, তার ভেতর পাখিদের বাসায় ঘুম-ভাঙা পাখিরা, তাদের ছানা পোনারা চেঁচাচ্ছে! শোনা যাচ্ছে তাদের তারস্বর চেঁচামেচি আর পাখা ঝাপটানির শব্দ।

সারা গ্রামটার ওপর ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে—মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন আর ভয় নেই। সূর্যের আলোয় ভয় থাকে না। এখন তাকানো যায় সোজা সামনে, যেদিকে কুসুমপুরের খাল, চিকচিকে জল। উত্তরদিকের কুঠিবাড়িটাকেও এখন আর ভয় করে না, ভয় করে না ছাদের পশ্চিম দিকটার ভাঙা-চোরা ঘরগুলোর দিকে তাকাতে।

বরং কাছে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। ভাঙা জানলা দিয়ে ভাঙা

ঘরগুলোয় উঁকি মারলে গায়ের মধ্যে কেমন শির-শির করে। একটা মস্ত বড় কাঠের সিন্দুক, দুটো মাটির সরার মধ্যে দড়ি ভরে কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া একটা আলনা, কটা উই-খাওয়া কাঠের পিঁড়ি, আর ঘরের মধ্যে রাশীকৃত ভেঙে-পড়া চুন শুরকি। দরজার একটা মরচে-ধরা তালা।

ওরা নাকি চলে গেছে। শহরে চলে গেছে অনেকদিন আগে। কোন্ শহরে, তাও ভালো করে কেউ বলতে পারে না। ছবিদের আর এক শরিক তারা! আর কি কোনও দিন আসবে না? সে কথাও কেউ জানে না।

কিন্তু প্রতি বছর পুজোর সময় দাদুর নামে টাকা পাঠায় সেই শরিকরা—যারা চলে গেছে। সেই টাকা নাকি পুজোয় লাগে!

এই ভাঙা দোতালার ঘর দুখানা একেবারে ধ্বসে যাচ্ছে, তাদের দোতালার ছাদের সঙ্গেই লাগানো। ঘর দুখানার জন্যে ছাদটাও নাকি ধ্বসে যাচ্ছে। কোন্ দিন যে একেবারে পড়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। ওপাশের ছাদের মাঝখানটায় মস্ত বড় একটা ফাটল, তার গা ফুঁড়ে উঠেছে বট, অশথ, পাকুড় গাছ—তাদের ডাল-পাতা মেলে দিয়ে হাঁ-করা ফাটলটা বন্ধ করে দিয়েছে। সেইজন্যেই নাকি আরও ভয়। যদি দেখতে না পেয়ে কেউ এগিয়ে যায়! পড়ে যায় ভেতরে!

ভীষণ ইচ্ছে করে একবার ঐ ফাটলটার মধ্যে উঁকি মেরে দেখতে। কি আছে ওখানে সে ভেবে পায় না। মা বলে: ওর মধ্যে বিষাক্ত সাপ আছে, খাটাস আর বন-বেড়ালের বাসা আছে।

দূর থেকে ছাদ ঝাঁট দেওয়া ময়লা ধুলো-বালি ছুঁড়ে ফেলা হয়। ঠাকুরঘরের শুকনো ফুল-বেলপাতাও ঠাকুমা ফেলে।

শক্ত করে সিমেন্ট দিয়ে বেঁধে ভাঙা ছাদ থেকে আস্ত ছাদ আলাদা করে রাখা হয়েছে। যদি ভেঙে পড়েও, তবুও নাকি এদিকটা ঠিকই থাকবে। অদ্ভুত সব কথা!

তাই আবার হয় নাকি! আমরা দাঁড়িয়ে আছি এদিকটায়—বেশ আছি। কিছু হোল না। কিন্তু ওদিকটা ধ্বসে গেল। যাঃ! সব বাজে কথা।

ঠাকুমা তো বলে, একশো বছরের পুরনো বাড়ি। অত পুরনো

বাড়ি আবার টেঁকে নাকি। আসলে সবটাই ধ্বসে যাবে একদিন। মাঝে মাঝে ঝুপঝাপ ইঁট খসে পড়া নয়—একেবারে সত্যি সত্যি হুড়মুড় করে। তারপর একদিন নীলকুঠিটার মতো ভাঙা কতকগুলো ইঁট পড়ে থাকবে এখানে-ওখানে। লোকে বলবে মেজ রায়দের বাড়ি।

মেজ রায় মানে দাদু। ছোট হোল হরিদাদু, অধীরকার বাবা। আর বড় রায় হোল রায়দাদু। আর সবচেয়ে মজার কথাটা ছবি ভাবলেই আশ্চর্য হয়ে যায়—হরিদাদু, দাদু, বড় রায়দাদু আর ওই ভাঙা ঘরগুলোর চলে যাওয়া তুই দাদুদের ঠাকুরদা নাকি ছিল একজন! আগে এমন আলাদা ছিল না সবাই, এমন নাকি ভাগ ছিল না বাড়িগুলোর। উনিশটা নীলকুঠির মালিক ছিল রায় বংশ।

কিন্তু কেমন করে সব কি হয়ে গেল! দাদুর ঠাকুরদার এক ভাই শহরে গিয়ে, চুপি চুপি সব নীলকুঠি সাহেবদের কাছে বেচে দিয়ে আর কোনও দিন ফেরেনি বাড়িতে। ফিরলে নাকি অন্য ভাইরা খুন করে ফেলত।

লোকে ছড়া বেঁধেছিল সেই সময়। ঠাকুমা এখনও বলে, ভারী মজার ছড়াটা—

'স্বন্নবাবু হয়ে হোল, কুঠি বেচে দীনহীন,
বাঙলায় বাঙালীর কুঠি থাকবে ঘোড়ার ডিম।"

ঘোড়ার ডিম! হিঃ, হিঃ।

দাদু বলে, জমিদারিতো সত্যি সত্যি দাদুদেরই ছিল কিন্তু ভাগাভাগি, মামলা-মকর্দমায় কেমন করে সব চলে গেল।

এখন জমিদার কে? যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই বলবে, বড় রায়। তারপর কে হবে? তার ছেলে অনিল রায়।

সবাই বলে, অনিলকাকা নাকি বউকে ধরে মারে। দু'একদিন অনেক রাতে হঠাৎ কান্না-কাটি চেঁচামেচির শব্দে ছবিরও ঘুম ভেঙেছে —আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালে উঠে হয়তো মা-কাকীমার কথার মধ্যে দিয়ে বুঝতে পেরেছে অনিলকাকা আবার তার বউকে ধরে মেরেছে। কিন্তু ঠাকুমা বলে: পুরুষমানুষ ওরকম একটু হয়েই থাকে। আমাদের সময়—

কিন্তু ঠাকুমার ওই দোষ। সব কথা শেষ না করে হয়তো একটা কাজে চলে যায়।

কিন্তু সেই অনিলকাকাকেও আবার উল্টে মার খেতে হয়েছে। কারা মেরেছে কেউ জানে না। সন্ধ্যেবেলা ঘোড়ায় চড়ে আসছিল কাছারি থেকে, হঠাৎ দেখা গেল খালি ঘোড়া ছুটতে ছুটতে আসছে— মানুষ নেই। খালের ধারে কারা যেন মেরে অজ্ঞান করে ফেলে গিয়েছিল অনিলকাকাকে। এই তো কদিন আগে। বাব্বাঃ! সে কথা ছবি কখনও ভুলবে না।

সে আর মণিদা চুপি চুপি দেখতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে সারা গায়ে রক্ত মেখে অনিলকাকা চীৎকার করছে যন্ত্রণায়। সমস্ত গ্রামের লোক এসে জড় হয়েছে, নাটমণ্ডপের বারান্দায় যেখানে অনিলকাকাকে আনা হয়েছে।

কেউ বলেছিল বাঁচবে, কেউ বলেছিল বাঁচবে না।

রায়দাদু তাঁর লাঠিয়ালদের ডেকে পাঠালেন সেই রাত্রে। তারপর মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ছবি শুধু শুনেছিল অনেক গলার আর্তনাদ, বাঁশ ফাটার শব্দ। সবায়ের সঙ্গে ছাদে দাঁড়িয়ে দেখেছিল, কুসুমপুরের দিকে লাল হয়ে গেছে আকাশ, মাঝে মাঝে তার ছাই উড়ে আসছে এতদূর পর্যন্ত।

আর ঘুম ভাঙা চোখে দেখেছিল আর একটা জিনিস, সেটাও ভোলা যাবে না। জোরে শব্দ করে সদর দরজাটা খুলে অধীরকা বেরিয়ে আসছে, পেছনে লণ্ঠন হাতে নতুন দিদিমা। কাকার দুহাতে দুটো বড় বালতি। নতুন দিদিমা বারণ করলেন যেতে, অধীরকা সেকথা শুনলও না।

তারপর সে-আগুন নিভেছে। অনিলকাকা চলে গেছে শহরের হাসপাতালে পাল্কি করে কিন্তু কিসের একটা ফিস্‌ফিসানি আজ কদিনেও থামেনি।

রায়দাদু শহরে খবর দিয়েছে, পুলিশ আসবে, খুঁজে বার করবে সব লোককে। কেমন একটা থমকানো ভয় যেন কটা দিন গাঁ-খানার ওপর দিয়ে ছিল। কদিন অধীরকাই বা কোথায় ছিল কে জানে। কাল বিকেলে ফিরেছে। ছাদে যখন ডাম্বেল, মুগুর ভাঁজছিল তখন এই ছাদ থেকে ছবি দেখেছে।

মণিদাটা বলে, পুলিশ এসে নাকি স্বদেশীদের আগে ধরবে। ওরাই নাকি পাণ্ডা সব কিছুর। কে জানে বাবা!

অধীরকার কত বড় লম্বা-চওড়া শরীর। কী মোটা-সোটা হাত-পা!

ধরতে আসা এতই সোজা নাকি! মণিদা বলেছে, ধরতে এলেই কাকা বন্দুক চালিয়ে দেবে। দাদু বলেছে, ভাল লোকদের কখনও পুলিশে ধরে না। চোর, ডাকাতদের ধরে।

ভাল লোকদের ধরে না? ছবি মনে মনে কথাটা আওড়ায়। অধীরকা তো ভাল।

যে ছোট খালের মতো সরু পুকুরটা এ-পাড়া, ও-পাড়াকে মাঝখানে ভাগ করে দিয়েছে তাতে কে যেন স্নান করতে নেমেছে। নিশ্চয় হারান্ ঠাকুর। নইলে স্তোত্র বলবে কে অমন করে এত সকালে—

'ওঁ জবাকুসুম সংকাশং,

কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।'

মা একদিন মানেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। সূর্যের স্তব করছে ঠাকুরমশাই।

ঠাকুরমশাই ভীষণ গরিব। দুর্গাদের চেয়েও, শ্যামলদের চেয়েও। আর ঠাকুরমশাই-এর ভাগ্নীই তো মায়াদি। মায়াদিকে ছবি মনে মনে খুব ভালবাসে।

মন নাকি বাতাসেরও আগে চলে, ঠাকুমা বলে। কত কথা যে মনে হয় একা থাকলে। অদ্ভুত, মজার সব! হিঃ হিঃ। তার মনটাও তবে এখন বাতাসের আগে চলছে? সূর্যের রথেরও আগে?

খানিকক্ষণ থেকে একটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল—মাঝে মাঝে। কিন্তু এখন সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হরিদাদুর বাড়ির দিক থেকে আসছে শব্দটা। কে যেন হরিদাদুর দরজায় ঘা দিচ্ছে ক্রমাগত, গম্ভীর মোটা গলায় ডাকছে—হরিবাবু! রায়মশাই!

কোনও উত্তর নেই। অধীর হয়ে-ওঠা গলাটা এবার বিকৃত আওয়াজে চেঁচাচ্ছে: হরিনন্দন রায়! দরজা খুলুন! দরজাটা খুলে দিন, নইলে ভেঙে ফেলবো!

সে শব্দে সারা বাড়িশুদ্ধু লোক জেগে উঠেছে। এখানে দাঁড়িয়েই অধীরকাদের মোটা কাঠের দরজাটা খোলার শব্দ পাচ্ছে ছবি। খট্‌খট করে কারা যেন ঢুকছে শান বাঁধানো উঠোনে।

ছবি ছুটে আসে ঘরের দিকে। বাবা ছাদের কার্নিশে ঝুঁকে পড়ে নিচে

কাকে যেন কি জিজ্ঞেস করলেন, তারপর ফ্যাকাসে মুখে মার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন : পুলিশ !

নিচে রোয়াকে কাদের এলো-মেলো গলার শব্দ শোনা যাচ্ছে কিন্তু চেঁচাচ্ছে না কেউ। সারা বাড়িটা থম্‌থম্‌ করছে।

কোমরে কাপড় গুঁজতে গুঁজতে বাবা নিচে নেমে গিয়েছিলেন, মা-ও গেল পেছন পেছন মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে। কি যে হয়েছে ! একটা কথাও জিজ্ঞেস করা গেল না মাকে।

আজকের সকালটা অদ্ভুত ! সবচেয়ে আগে উঠেছে বলে এত আনন্দ হচ্ছিল, এখন তার বিশ্রী লাগছে ! কেউ কিছু বলবেও না ! এমনি সব। নিজেরা কেবল ফিস্‌ফিস্‌ করবে।

হতভম্বের মতো খানিক দাঁড়িয়ে থেকে শেষে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত প্রদীপকেই ছবি ডেকে তোলে ঠেলে ঠেলে : এ্যাই দাদা, এ্যাই। ওঠ না শিগগির। বাবা বললে হরিদাদুর বাড়ি পুলিশ এসেছে।

ছবির ঠেলাঠেলিতে আচমকা ঘুম-ভাঙা প্রদীপ তার লাল লাল দুই চোখ মেলে এক মুহূর্ত বোকার মতো তাকিয়ে থেকে তারপরেই হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে বলে : পুলিশ। তবে অধীরকাদের সত্যিই ধরতে এসেছে রে ছবু !

এতক্ষণে পুলিশ আসার কারণটা মাথায় ঢুকতেই মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে যায় ছবিরও। এই রকমই একটা কথাতো আজ সাতদিন ধরে গ্রামটার ওপর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—লোকের মুখে মুখে চলে বেড়াচ্ছে। কেবল বিশ্বাস করে'ন তারা দু'ভাই-বোন।

সেই কথাটাই সত্যি হয়ে গেল এমন !

বিরক্তি আর উত্তেজনায় ছবি মাথা ঝাঁকায় : কেন ধরবে ? তুই যে বলিস ধরতে পারবে না। দাদু বলে, ভাল মানুষদের পুলিশে ধরে না। প্রদীপ একটু ভাবে। একটু সময় নিয়েই ভাবে, তারপর গম্ভীর গলায় বুড়ো-মানুষের মতো বলে : বুঝলি ছবি, রায়দাদুই পুলিশদের ডেকে এনেছে। পুলিশরা তো জানেই যে কাকারা স্বদেশী। অরুণকা, প্রসন্নকা, ধীরেনকা সব্বাইকে ওরা চেনে—এতদিন ধরতে পারেনি, এবার রায়দাদুর জন্যেই ধরবে। অনিলকাকা নাকি শহরে গিয়ে পুলিশের কাছে বলেছে, যারা মাথা ফাটিয়েছে তার মধ্যে একজন নাকি ধীরেনকার মতো দেখতে ছিল। কি মিথ্যুক ভাই !

তারপরেই দৃঢ় প্রত্যয়ে মাথা নেড়ে সে বোনের মুখের দিকে তাকায় : কিন্তু কাকাদের হাতে পিস্তল থাকে! দেখিস্, আমি বলে দিলাম, কিছুতেই পুলিশ ধরতে পারবে না অধীরকাকে। অত সোজা নয়!

: যাবি ভাই দেখতে?—ছবি মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে।

প্রদীপেরও কৌতূহল কম নয়, কিন্তু সে যেতে রাজী হয় না। বলে : না ভাই, গেলে বাবা এইসা মারবে।

: জানতে পারবে নাকি? আমরা তো লুকিয়ে যাব।

দুজনে চোরের মতো পেছনের দরজা দিয়ে অধীরদের বাড়ির মধ্যে ঢোকে। উঠোনের সিঁড়িতে হরিনন্দন বসে আছেন চুপ করে। তাদের দিকে একবার কেবল তাকিয়ে আবার আগের মতোই মাথা নিচু করে বসে থাকেন।

লতু-পিসি আর নতুন দিদিমা রান্নাঘরের দরজার কাছে কাঠের মতো বসে। সমস্ত উঠোনে বাক্স-পেঁটরা, বই-কাপড়, লেপ-তোষক বোঝাই হয়ে আছে, দুজন লাল পাগড়ী-পরা লোক সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছে তখনও। রান্নার হাঁড়ি, গামলা, দরজার কাছে ছড়িয়ে, ছিটিয়ে পড়ে আছে।

তারই মধ্যে হতভম্ব ভাই-বোন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকে খানিক। কিন্তু কেউ ওদের বকে না, একটা কথাও কেউ বলে না ওদের সঙ্গে। শেষে দুজনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে।

বড় দালানটার মাথায় লাল পাগড়ী-বাঁধা কতগুলো লোক ঘিরে আছে কাকাকে। কেবল হাফপ্যান্ট পরা মোটা মতো ফর্সা যে লোকটা ঘরের কোণ থেকে জিনিস-পত্র টেনে বার করছে—তার মাথায় শুধু লাল পাগড়ী নেই, আছে টুপি।

অধীর ওদের দেখে অবাক হয়ে অর্থহীন একটু হাসি হাসে। তার হাত দুখানা কোলের মধ্যে জড়ো করা, যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছে।

ছবি সেই হাত দুখানা লক্ষ্য করে বারে বারে। কই পিস্তল! হাতের মুঠোতেও তো নেই। লোহার শেকল দিয়ে জড়ানো খালি দুখানা মোটা মোটা হাত!

ছবি এবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রদীপের মুখের দিকে তাকায়। আর বাজি হেরে যাওয়ার মতো ফ্যাকাসে মুখ দিয়ে প্রদীপও স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে

থাকে সে হাত দুখানার দিকে। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কিছুতেই, মস্ত বড় একটা আঘাত পেয়েছে কারুর কাছ থেকে এমনি ভাবে সদ্য ঘুমভাঙা, এলো-মেলো চুলে ঘেরা মুখখানা হঠাৎ তার যেন বেঁকেচুরে যায় দু'একবার। তারপরেই হঠাৎ সে কেঁদে ফেলে। টপ্ টপ্ করে গাল বেয়ে পড়তে থাকে চোখের জল।

ছবি অত সহজে কাঁদে না। আট-ন'বছরের মেয়ে কিন্তু দেখে মনে হয় প্রদীপের চেয়ে বড়। তার রঙ ফর্সা, প্রদীপের মতো কালো নয় কিন্তু তাতে আবার প্রদীপের মতো শ্রীও নেই। প্রদীপ রোগা কিন্তু ছবির শরীরে স্বাস্থ্যের দীপ্তি আছে। প্রদীপের স্বভাবটা মেয়েদের মতো কোমল, ছবির স্বভাব ছেলেদের মতো—খানিকটা উদ্ধত, খানিকটা বিরক্ত। মনে হয় সব সময় ও যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটার ওপর রাগ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

সে সোজা এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে: তোমার হাত বেঁধেছে কে অধীরকা? —সে উত্তর শুনতে চায় না, প্রশ্নটা সবাইকে শোনাতে চায়।

উত্তর দেয় খাঁকি হাফ প্যাণ্ট পরা লোকটা। কাজ করতে করতে সে এদিকে তাকিয়ে একবার হাসে, তারপর বলে: না বেঁধে কি করি বল খুকি! কখন কি চালিয়ে-টালিয়ে বসেন কে জানে!

প্রদীপের দিকে এগিয়ে এসে সে বলে: কি হোল খোকা? এঁ্যা? কাঁদছ কেন? কাকার জন্যে? ওঁকে তো ধরব না আমরা—দেখো ছেড়ে দেব। তোমার আপন কাকা উনি? না? আচ্ছা খোকা, তুমি ধীরেন-বাবুকে চেন? প্রসন্নবাবুকে? ওঁরাও কি তোমার কাকা? ওঁরা তো এখন এখানে নেই? কোথায় গেছেন জান? না, তুমি আর জানবে কি করে?

অধীর এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এবার হঠাৎ সে নিচু করে থাকা মাথাটা তুলে ডাকে: প্রদীপ!

সে ডাকে কি ছিল কে জানে। প্রদীপ তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে একটু ম্লান হাসি হাসে।

ছবি কি বোঝে কে জানে, হঠাৎ প্রদীপের হাতখানা চেপে ধরে বলে: চল ভাই, আমরা মুখ ধুতে যাই—বলে অধীরের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ঝড়ের মতো সে প্রদীপকে নিয়ে ঘর ছাড়ে। তার

রঙ-ওঠা আধময়লা ফ্রকটা, রুক্ষ লালচে চুলগুলো বাতাসে নাড়া পেয়ে ফুলে ওঠে একবার, তারপর মিলিয়ে যায় দরজার বাইরে।

দরজার বাইরে পা দিয়েই হঠাৎ ফুঁসে উঠে ঘুরে দাঁড়ায় সে ভাইয়ের দিকে, মুখ ভেংচে বলে: বুড়োধাড়ি ছেলে! কাঁদলি কি বলে ঐ লোকটার সামনে?

প্রদীপ অপ্রতিভ মুখে কি একটা বলতে গিয়েও আবার চুপ করে থাকে।

খিড়কির পুকুরের সেই পাতা কাঠখানার ওপর এসে রোজকার মতো দুজনে বসে। অন্যদিন রোজ ওদিকের ঘাটে মায়াদি আসে—বাসন মাজে, কাপড়-চোপড় কাচে। আজ ঘাট খালি। আজ যে বেলা হয়ে গেছে। অনেক বেলা! আজকের সকাল সব সকালের চেয়ে অদ্ভুত। আজকের সকালে পুলিশ এসেছে, এখনও আছে তারা। অথচ তবু ভয় করছে না সেদিনকার রাতের মতো। কেবল একটা বুক-চাপা আতংক আর আশংকায় ছেয়ে রয়েছে মনটা। ছবি বারে বারে মনকে প্রবোধ দেয়—না না, নিয়ে যাবে না কাকাকে।

কোনও মতে মুখ ধোওয়া শেষ করে ছবি দেখে প্রদীপ তখনও বসে আছে চুপ করে। দুঃখ হলে মণিদা এমনিই চুপ করে থাকে, কেবল চোখ দুটো ছল-ছল করতে থাকে।

ছবির তা নয়। দুঃখ হলে সে সোজাসুজি প্রকাশ করে। পল্টু, মণ্টু, মীনাদের সঙ্গে যখন মারামারি হয়, ঝগড়া হয়, সে দুমদাম চড় কিল বসিয়ে, নয়তো আঁচড়ে কামড়ে দিয়ে চলে আসে। মণিদাকে তাই সে বুঝে উঠতে পারে না। কি করবে ভেবে না পেয়ে সে ব্যথিত মুখে চুপ করে থাকে।

হঠাৎ ঝড়ের মতো ছুটতে ছুটতে পল্টু এসে ঢোকে, প্রদীপকে খুঁজছে সে। বলে: অধীরকাকে যে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। জানিস নে তোরা? তোরা কিরে? ছাখ্‌গে লতু পিসিমা আর নতুন দিদিমা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে উঠোনে কেমন করে। সব ওই রায়কত্তার জন্যে, জানিস না? তোরা আবার বলিস রায়দাদু! দাদু না হাতি!

কিন্তু পরমুহূর্তেই পল্টুর মুখখানায় খুসি ছড়িয়ে পড়ে কি মনে করে,

বলে : কিন্তু আর কাউকে ওরা ধরতে পারেনি ভাই—ধীরেনকা, প্রসন্নকা, অরুণকা, কাউকে না। কাল সারারাত ধরে ওরা গ্রামখানাকে ঘিরেছে—তবু পায়নি, হি-হি। বেশ মজা না রে? একেবারে জব্দ হয়ে গেছে পুলিশ, না রে? যাবি দেখতে অধীরকাকে? এখনও কুঠিবাড়ির মাঠ ছাড়ায়নি বোধহয়—গেলে দেখতে পাবি। বলেই পণ্টু ছুট দেয়—যেমন এসেছিল।

ছবি চমকে উঠে বলে : সত্যি সত্যি নিয়ে যাচ্ছে? তবে যে লোকটা বলল, ছেড়ে দেবে?

প্রদীপ স্থির দৃষ্টিতে তখনও তাকিয়ে আছে দূরের দিকে, একবারও সে ঘাড় ফেরায় না। ঘাটের পাশে কটা বেতের গাছ মিলে গিয়ে ঝোপের মতো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একটু জায়গা করেছে, সেখানে একটা ডাহুকের বাসা আছে। সেই ডাহুকটার ডাক শুনছে প্রদীপ।

ছবির এবার খুব রাগ হয়, সে বলে : এ্যাই দাদা, বসেই থাকবি?

এতক্ষণে প্রদীপ মুখ ফেরায়, জল দিয়ে চোখ-মুখ ধুয়ে ফেললেও বোঝা যায় সে কেঁদেছে। ভাঙা ভাঙা গলায় বলে : পিস্তল না ছাই—হাতি আছে! সব বানানো কথা! নইলে কখনও ধরতে পারে, হাতে শেকল পরাতে পারে! দোষ না থাকলে তো ওরা ধরে না।

সে কথা শুনে ছবিও একটা মুহূর্ত কেমন ভাবনায় পড়ে, তারপর হঠাৎ সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে ভাইয়ের হাতখানা শক্ত করে ধরে বলে : চল, জিজ্ঞেস করে আসি। কি দোষ করেছে কাকা যে ওরা ধরে নিয়ে যাবে!

দুজনে ছুটতে থাকে ঘাটের পথ দিয়ে। বেতঝোপ আর কাঁটাগাছ মাড়িয়ে আগাছা-বিপথের মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ির পথটা বেছে নেয় ছবি, আর তার ধরে থাকা হাতের টানে টানে প্রদীপও ছোটে।

দোল পুকুরটার পাড়ের ওপর উঠে একটুখানি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দুজন। রুক্ষ চুলগুলো বাতাসে উড়ছে ছবির, তার হাঁটুর নিচেটা বেতের কাঁটায় রক্তারক্তি হয়ে গেছে।

কিন্তু কোথায় কাকা?

পুকুরের পাশের মটর খেতটায় লাল-নীল-সবুজ ফুলগুলো নেই। তাতে এখন মটর ধরেছে, সেগুলোও প্রায় পেকে এল। ফুলের আর

ফলের মতো বোধহয় ফসলেরও গন্ধ থাকে। কেমন একটা সোঁদা সোঁদা মৃদু গন্ধ আসছে। তা কি মাটির? কে জানে!

পলাশ গাছটায় মাঘমাসে যেন আগুন লেগেছিল। সরস্বতী পুজোয় লাগে তখন পলাশ ফুল। কিন্তু এখন ন্যাখ—ন্যাড়া পাতাঝরা একটা ঊর্ধ্ববাহু মুনির মতো ওটা দাঁড়িয়ে। তারই একটা উঁচু ডালে বসে একটা চিল চেঁচাচ্ছে তারস্বরে তীক্ষ্নকণ্ঠে।

সারা মাঠ জুড়ে মৌমাছি আর ভোমরার গুন গুন আওয়াজ খুব মৃদু গানের সুরের মতো শোনাচ্ছে।

সব ওরা দেখছে, শুনছে, কিন্তু বুকের ভেতরটা হয়ে গেছে খালি। কী একটা যন্ত্রণা যেন ঠেলে ঠেলে গলা পযন্ত উঠছে।

হঠাৎ আঙুল-বাড়িয়ে ছবি প্রায় চিৎকার করে ওঠে: ওই—ওইরে দাদা। কুঠি বাড়ি থেকে বেরচ্ছে, ওই তো কাকা!

কথা শেষ না করেই সে ছোটে প্রাণপণে, প্রদীপেরও আগে। দুবার আছাড় খায় ছবি। পড়ে ঠোঁট কেটে গেছে তবু ছুটছে। খোলা মাঠের হু-হু করা হাওয়া ওকে ঠেলে রাখতে চাইছে উল্টো দিকে, চুলগুলো চোখে-মুখে এসে পড়েছে, বাতাস জোরে নাকে-মুখে ঢুকে নিশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে তার, তবু ছুটছে আর দু'চোখের জাগ্রত দৃষ্টি মেলে রেখেছে ওই কটা বিন্দুর দিকে!

ক্রমশ ওরা স্পষ্ট হচ্ছে। ওই তো কাকা আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে, দু'পাশে পুলিশ।

ছবি প্রাণপণে চেঁচায়: কাকা, অধীরকা দাঁড়াও, আমি আর দাদা আসছি। দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে তার ক্ষীণ গলার ডাক একটানা সুরের মতো ভেসে ভেসে মিলিয়ে যায়। অধীর সেই সুরটা বোধহয় শুনতে পায়। সে চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে মাঝ-রাস্তায়।

অনেকে—গ্রামের লোক, পথ-চলতি মানুষ সজল চোখে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে দিয়ে গেছে তাকে গাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত। অপ্রত্যাশিত শ্রদ্ধা দেখিয়ে তারা তার সাহস বাড়িয়েছিল।

কিন্তু ওই যে দুটো ছোট মানুষ তীরের মতো ছুটে আসছে। অনেকের ভীড়ে ওদের সে দেখতে চেয়েও পায়নি এদিক-ওদিক তাকিয়ে! ওদের না দেখে সে আর এক পাও এগোবে না।

হাতকড়া-বাঁধা হাত নিয়েই সে মাটিতে বসে পড়ে—তার চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়ায় দেহ-রক্ষীরা।

ছবি হাঁফায়, তার ছোট বুকটা ওঠা-নামা করে পরিশ্রমে। সে কাছে বসে অধীরের হাত-কড়া বাঁধা হাত দুখানায় তার হাত বুলিয়ে দিয়ে বিষণ্নমুখে বলে: এখনও তোমার হাত বাঁধা—নিয়ে যাচ্ছে? তবে যে বলল ছেড়ে দেবে?

কান্নাভরা গলায় কেবলই প্রশ্ন করে: সেদিন দিনু চৌকিদার এজমালিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে থানায় নিয়ে গেল, সে নাকি চোর। দাদু যে মণিদাকে বলে, চোর-ডাকাত ছাড়া ভাল মানুষদের পুলিশে ধরে না? তুমি কি চোর-ডাকাত?

প্রদীপ একটা কথাও বলছে না। সে জানে কথা বলতে গেলেই আগে তার চোখের জল ঝরে পড়বে। সে কেবল চুপ করে অধীরের গা ঘেঁসে বসে আছে।

দারোগা বক্সীরও বোধহয় ভাল লাগে না এ নিস্তব্ধতা। উত্তরটা সেই দেয়, কেউ শুনতে চায়নি তার কাছে থেকে তবু দেয়: তোমার কাকাও যে ডাকাত খুকু! স্বদেশী ডাকাত। তারা করে মানুষের ঘরে চুরি, এঁরা করেন সরকারের ঘরে। আপনার চুপ করে থাকা যে আমারও সহ্য হচ্ছে না। যাহোক একটা কিছু বলুন না—শুনছেন ও মশাই? ও অধীরবাবু!—কথা শেষ করে সে সিগারেট বার করে, নিজে নেয়, অধীরকেও একটা দিতে গিয়ে হঠাৎ তার হাত-কড়া বাঁধা হাতের দিকে তাকিয়ে নিজের সিগারেটটাও তুলে রাখে প্যাকেটে।

তবুও একটা কথা বলে না অধীর। নিজেই সে উঠে দাঁড়ায়, চলবার জন্য পা-ও বাড়ায় কিন্তু ছবি পেছন থেকে তার কাপড় চেপে ধরে: কবে আসবে তুমি আবার, অধীরকা? ওরা তোমাকে আসতে দেবে তো?

ছবির দু'চোখের সেই করুণ জিজ্ঞাসা, তার ব্যাকুলতা, পাশে দাঁড়িয়ে অদম্য চেষ্টায় কান্না চেপে রাখা প্রদীপ, সব মিলিয়ে বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠে এতক্ষণ পরে অধীরের চোখেও হঠাৎ জল এসে পড়ে, সে হাত-কড়া বাঁধা হাত দু'খানা চেষ্টা করে তুলে আঙুলের ডগায় চোখের কোণটা মুছে ফেলে।

পাড়ার ছেলেরা এসে ভিড় করেছে তার কাছে, তাদের সে দেশের কথা শুনিয়েছে, ভবিষ্যতের কথা শুনিয়েছে নানা গল্পের মধ্যে দিয়ে। দেশপ্রেমের কবিতা পড়ে শুনিয়েছে আর তখন কোথা থেকে যেন ও-বাড়ির কুন্দদা-দার এই মেয়েটা এসে চুপ করে বসে থাকত, কেউ তাকে না ডাকলেও।

গল্প শুনে, কবিতা শুনে কে কি বুঝেছে পরীক্ষা করত অধীর। সবায়ের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে শেষে হেসে জিজ্ঞেস করত: বল কি বুঝলে?

সেই না বোঝার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কখন এক কোণ থেকে ছবি বলে উঠতো রিনরিনে গলায়: আমি বলব কাকা?

তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সে বলত: তুই পারবি বলতে? আচ্ছা বল, তুই-ই বল।

ছেলেরা নড়ে-চড়ে বসত, তারা চটে যেত সেটা অধীরের চোখ এড়াত না। তবু সে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকত, বাধা দিতে পারত না ছবিকে।

তারপর কখন হয়তো একসময় ও-বাড়ি থেকে শোনা যেত ছবির ঠাকুমার গলা: ছবি, ও ছবি! একটু বড়ি কটা পাহারা দেবে যে এমন কেউ নেই। মেয়েমানুষ—কিন্তু বাড়িতে পা বসে না মেয়ের।

সঙ্গে সঙ্গে মমতাও খুঁজতে আসতেন।

কোনো দিন ছবিকে রাগ করে ধরে নিয়ে যেতেন, কোনো দিন নিজেই উঠে যেত মেয়েটা ছলছলে চোখে। চুপি চুপি বলে যেত: রাত্তিরে কি আবার পড়বে কাকা? আমি আসব কিন্তু।

খেলার মাঠে অধীর ছেলেদের নানারকম ব্যায়াম শেখাত, শরীর পালনের উপদেশ দিত—সেখানেও এসে হাজির হোত মেয়েটা। তার দুই চোখে জ্বলে জ্বলে ওঠা আগ্রহ: আমাকে নেবে না কাকা? আমিও ওদের মতো ব্যায়াম করব, দৌড়ব।

পল্টুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লাফ দিতে গিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল একদিন। একদিন দৌড়তে গিয়ে পা কেটে রক্তারক্তি করে বসল।

তবু আসত। ছেলেদের সঙ্গে সমান করে পারত না, মুখ লাল হয়ে যেত, হাঁফাত—তবু।

আজও সেই মেয়েটাই। তেমনি করুণ আগ্রহভরা দুই চোখ নিয়ে, জিজ্ঞাসা নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কী বলবে অধীর? কী উত্তরে শান্ত করবে ওকে?

একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়েছে ওর চোখে-মুখে, ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে, অথচ কাঁদতে পারছে না। জোর করে ধরে আছে—যেন এমনি করে ধরেই রাখবে।

: চোর-ডাকাতকে তো ধরে? ভালমানুষকে ধরবে কেন? কেন?

এতক্ষণে এই প্রথম কথা বলে অধীর। গলার স্বর তার এই প্রথম কাঁপে: ছাড় ছবু, অমন করতে নেই। আসব না কেন? কয়েকদিন পরেই তো ফিরব—ওরা কি আমাদের ধরে রাখতে পারে? যাও, লক্ষ্মী মেয়ে, প্রদীপের সঙ্গে বাড়ি যাও। মন দিয়ে পড়াশোনা করবে দুজনে—কেমন? ছাড় ছবি, ধরে রাখতে নেই।

আরও অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে অধীরের, যা সে কাউকে বলেনি। ছবির প্রশ্নটার উত্তর সে দারোগা বক্সীর মুখের ওপরেই শুনিয়ে দিতে পারত, বলে যেতে পারত রায়কত্তার কথা। বলতে পারত ভবিষ্যতের কথা, তার আদর্শ—কিন্তু এই মুহূর্তটাতে সে সব আর ইচ্ছে করছে না।

ছবি ছোট বলে, অত কথা বুঝবে না বলে ইচ্ছে করছে না তা নয়। কথা বলে বলে ওই ছোট হাতের মুঠো ছাড়িয়ে দেবে না সে। জোর করে ছাড়িয়ে নিতে হবে। মেয়েটা কাঁদুক, বুঝতে চেষ্টা করুক!

অধৈর্য হয়ে অধীর এবার নিজেই এগিয়ে যায়।

এমনিতে এমন শক্ত মন তার। বাবা-মা-বোনের কান্না দেখে এসেছে আসার সময়। নিজেই ওদের সান্ত্বনা দিয়েছে, মৃদু ধমক দিয়েছে, কিন্তু কষ্টের এতটুকু ছাপ তার মুখে পড়েনি। কিন্তু ছবিটা তাকে আবার পেছনে টানছে।

ও যেন মনে পড়িয়ে দিয়েছে তার মায়ের যন্ত্রণামাখা চোখের জলে-ভাসা মুখখানা। এখন মনে পড়ছে মায়া জানতেও পারল না তার চলে আসা। শুনে নিঃশব্দে কাঁদবে মামীমার ভয়ে।

এখন মনে হচ্ছে ওদের দিয়ে মায়াকে একটা খবর পাঠালে হয়। এখনও গ্রামের সীমানা ছাড়ায়নি সে, কিন্তু গ্রাম তাকে আবার টানছে। টানছে স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতা।

ঘাড় শক্ত করে সামনে চোখ রেখে সে সোজা হেঁটে চলে, একবারও পেছনে তাকায় না।

খানিকটা সামনে স্কুল বাড়ির টিনের চালটা রোদ পড়ে ঝকঝক করছে—সেটাও আস্তে আস্তে পেছনে পড়ে থাকে। বাঁয়ে পোস্টাপিসের খড়ের চালাও মিলিয়ে গেল।

কেবল খানিকদূর থেকে ভেসে এল ছবির গলা, কাঁপা কাঁপা, অস্থির রিনরিনে গলা: কাকা, শোন, শুনছ! তুমিও বল 'বন্দেমাতরম্'।

প্রদীপ আর ছবির একসঙ্গে মেশানো গলা আরও দু'একবার শোনা গেল: বন্দেমাতরম্।

তারপর আর নয়।

পথ চলতি মানুষ, স্টেশনের পথে যাওয়া মানুষ, হাটুরে লোক অবাক চোখে তাকিয়ে অধীরকে দেখে—দেখে তার দেহরক্ষীদের। দারোগার মাথায় টুপিটার ওপর রাজার মুকটের পেতলে সূর্যের আলো পড়ে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে ওঠাটাও দেখে। দেখে কিন্তু কথা বলে না! মাথা নীচু করে প্রণাম করে—অধীরকে, না দারোগাকে, না পুলিশদের বোঝা যায় না।

কেবল ডানদিকের ছোট পটলের খেতটায় আগাছা ওপড়াতে ওপড়াতে হাতের কাস্তেটা রেখে উঠে দাঁড়ায় মামুদ। নিঃশব্দে একবার সেলাম জানায় অধীরকেই তারপর আবার তেমনি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পেছনে তখনও ছবি আর প্রদীপ তেমনি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে চোখ পেতে। অধীরকে আর দেখা যাচ্ছে না, শেষ বিন্দু কটিও যে মিলিয়ে গেছে দিগন্তে সে খেয়াল ওদের নেই।

ছবির কাছে এ আর এক নতুন বিস্ময় আর ব্যথা। তার উত্তপ্ত মনটা কিছুতেই যেন শান্ত হতে চায় না।

এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল তার জীবনে!

সবাই বলে, আর একবারও কাকাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে শহর থেকে। কাকা যখন সেখানে পড়ত। তখন ছবি দেখেনি। এখন দেখল।

কেন ধরল? ভালমানুষদেরও ধরে নিয়ে যায়—কেন নিয়ে যায়? এ প্রশ্নটাই তার মনে ফুটন্ত জলের মতো ফুটে উঠে উঠে তাকে অশান্ত করে তোলে।

প্রদীপ এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি কিন্তু কেঁদেছে। কেঁদেছে এটা সে প্রকাশ হতে দিতে রাজী নয়, চট করে পেছন ফিরে জামা দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলে ছবির হাত ধরে। তখনও চোখের জল তার দীর্ঘ চোখের পল্লবে অভ্রের কুচির মতো লেগে আছে! বলে : চল ছবি।

ছবি এতক্ষণ কাঁদেনি। সেও যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার থমকে দাঁড়ায় দিগন্ত-প্রসারিত মাঠের দিকে মুখ করে। চোখ ছাপিয়ে এবার জল আসে—ঝাপসা হয়ে যায় সব কিছু, বলে : কাকাকে ওরা যদি না ছাড়ে দাদা?

বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠছে এক অব্যক্ত ব্যথায়, ছবি তা বুঝতে পারছে না, বোঝাতেও পারছে না। তাদের মাঠে-ঘাটের ছুটোছুটিতে পাঠশালায় কিংবা খেলা-ঘরের কোণে—সব জায়গায় একটা নিয়ম আছে। সেখানে সব্বাই জানে যে অন্যায় করলে তার শাস্তি পেতেই হবে।

কিন্তু এতো পল্টু, সেফু, উমা নয় যে খিমচে, কামড়ে, চড় মেরে প্রতিশোধ নেওয়া যাবে! এ কেমনতর অন্যায়! যার কোনও শাস্তি নেই? সবাই কেবল দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখে অধীরকাকে শেকল বেঁধে ধরে নিয়ে যাওয়া?

থেকে থেকে তার বুকের ভেতরটায় ছুরির খোঁচা খাওয়ার মতো যন্ত্রণায় ব্যথিয়ে ওঠে।

ফ্রকের কোণায় চোখ মুছে ফেলে নিজেই প্রদীপের হাত ধরে সে এগিয়ে চলে ঝরা আমপাতা মাড়িয়ে। ছোট দু'জোড়া খালি পায়ের চাপে শুকনো আমপাতার মড় শব্দ উঠতে থাকে একটানা।

দুই

কুঠিবাড়ি ছাড়িয়ে সামান্য পথ এগিয়ে গেলে বাঁদিকে পড়ে রায়েদের বৈঠকখানা—বড় তরফের ভাগ। উঠোনের ওপর অনেকগুলো ঘরওয়ালা দালান লম্বা হয়ে চলে গেছে। দালানের নিচে খানিকটা জায়গা জুড়ে একটুকরো বাগান। কিছু ফুল, কিছু ফলের গাছ, তরকারীর চাষও আছে।

দালানের বারান্দায় রায়কর্তা সকাল থেকে প্রায় সারাটা দিন একটা লম্বা বেঞ্চিতে গা এলিয়ে দিয়ে বসে তামাক টানেন। ওখানেই তাঁর কোর্ট, কাছারি। ওখানে বসেই তাঁর পাওনা কিংবা বিচার শেষ করে তবে ওঠেন। তাঁর অম্বুরী তামাকের গন্ধ সারা বৈঠকখানা ছাড়িয়েও অনেকটা দূর পর্যন্ত মাতিয়ে রাখে।

খুব বড় বড় টানা টানা চোখ রায়কর্তার আর তেমনি প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা, বিরাট লম্বা-চওড়া পুরুষ, আর গলার স্বরও তেমনি। জোরে কথা বললে বুকের মধ্যেটা যেন চমকে ওঠে।

দূর গ্রামের চাষী গেরস্থ কিংবা এ-পাড়া, ও-পাড়ার নতুন আসা লোকজন যারা তাঁর বৈঠকখানার ওপর দিয়ে রাস্তা করে নেয় আর এক পাড়ায় যাবার জন্যে কিংবা ইচ্ছে করেও যারা পথ কমিয়ে ও-পথ দিয়ে যেতে চায় তাদের সবাইকেই একবার থমকে দাঁড়াতে হয় সেই বজ্রগম্ভীর গলার শব্দে।

চেনা হলে, অচেনা হলেও, মুখ থেকে নল নামিয়ে বলেন : কে যায় ?

তার তখন থমকে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় থাকে না।

যদি কারো তাড়াতাড়ি ... অতি দ্রুত পায়ে সরে যেতে চায় কথা বলে সময় নষ্ট না করে, তাঁরও রেহাই নেই।

নিজে ওঠেন না, একটু দূরে বসে থাকা সব সময়ের চাকর রোগা পেটমোটা মানিক বাগ্দীকে হুকুম করেন : ডেকে আয় তো

মানিক ধরে আনে।' যদি সে লোক গরীব কিষান/গেরস্থ হয় তবে মুখ থেকে নল নামিয়ে অপাঙ্গে তার দিকে একবার তাকান। বিদ্রূপের হাসিতে বাঁকানো ঠোঁটে বলেন: ডাকলে সাড়া দিস্‌নে? ব্যাটা, তোরা কি নবাব হচ্ছিস দিন দিন?

আর যদি সে লোক ফর্সা জামা-কাপড়-পরা কোনও ভদ্রলোক হয় তবে তাকে বসতে দেন, কথা বলেন।

এরও ব্যতিক্রম আছে, মাঝে মাঝে হেরে যান এ-পাড়া ও-পাড়ার কাজিল ছোট ছোট ছেলেগুলোর কাছে। ওরা ইচ্ছে করে পায়ের শব্দ করে উঠোন ডিঙিয়ে চলে। রায় বলেন: কে যায়?

ওরা চার-পাঁচজন সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে: কে আবার! রায়কত্তার গোঁফ যায়।

নল মুখ থেকে সরিয়ে রায়কর্তা চেঁচান: ছ্যাখ্‌তো, ছ্যাখ্‌তো রে মানিক।

মানিক ছুটেও যায় যথারীতি কিন্তু ছেলেরা ততক্ষণে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেছে।

সে দলে পল্টু আছে, প্রদীপও থাকে।

যত অদ্ভুত অদ্ভুত নাম সব পল্টুর দেওয়া। রায়কর্তাকে বর্লে, গোঁফ। দাদুর নাম রেখেছে, শালিক। বড়কাকারও কি একটা নাম আছে, ছবিদের বাবারও। সবাই জানে না। প্রদীপ জানে, ছবিকেও সে বলেছে চুপি চুপি।

কাউকে হঠাৎ কানমলা কিংবা বকুনি খাবার হাত থেকে বাঁচাতে হলে বাবা, দাদু কিংবা বড়কার নাম না করেও ঐ নাম করে সাবধান করা যায়। সবাই তো আর বুঝবে না। যারা বুঝবার তারা বুঝে নেবে ঠিক।

রায়কর্তা আর মানিক বাগ্দীকে নিয়ে একটা ছড়াও আছে। মানিকের বাবা ছিল হরিশ বাগ্দী—রায়কত্তার লেঠেল! ঠাকুমারা দেখেছে তাকে, ইয়া লম্বা-চওড়া যোয়ান মানুষ, কালো আবলুষ কাঠের মতো রঙ, দৈত্যের মতো চেহারা, পাটার মতো ছিল তার বুক। রায়কর্তার জন্যে জমির দখল নিতে গিয়ে সেই বুকে কোঁচের খোঁচা খেয়ে মরে গেল হরিশ। রায়দাদু বলেছিলেন: যা হরিশ, তোর ছেলের সারাজীবনের ভার আমি নিলাম।

রায়দাদু তারপর থেকে মানককে তার সারাক্ষণের চাকর করে নিয়েছেন। ওর বাবা ছিল লাঠিয়াল আর ও হয়েছে চাকর।

তাও আবার চেহারা দেখ না!

ঠাকুমার কাছে শোনা হরিশের চেহারার সঙ্গে তার ছেলে মানিকের একটুকু মিল নেই। তার হাত-পা সরু সরু, পেটটা মোটা, বোকা বোকা চাউনি। সারাক্ষণ সে রায়কর্তার কাছে বসে থাকে, তামাক সেজে দেয়, গা টিপে দেয়। একটু কি রাগও হয় না ওর রায়কত্তার ওপর?

পল্টু ভাই ছড়া বেঁধেছে, দূরে দাঁড়িয়ে বলে। রায়কত্তা থাকলে, বলেই ছুটে পালায়। আর মানিককে একা পেলে পালায় না—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওকে শোনায়:

ঢাল নেই, তলোয়ার নেই,
রায়কত্তা জমিদার,
পেট মোটা, পা সরু, মানিক বাগ্দী সদার।

আর আশ্চর্য লোকটা। কখনও দাঁত বার করে হাসে, কখনও বিষণ্ণ মুখ করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে: কও বাবুরা, কও। কবাই তো।

সামনে বিরাট পুকুর, বাঁয়ে একটা আম আর নারকেল গাছের বাগান সামনে রেখে রায় বসে থাকেন। অম্বুরি তামাকের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, নলের শব্দ হয় ভুড়ুক ভুড়ুক করে আর তার ফাঁকে মাঝে মাঝে ঝুলে পড়া ভুরুর নিচে থেকে তাকান প্রদীপদের বৈঠকখানাটার দিকে।

সেখানে বারান্দায় নয়, ঘরের মধ্যে বসে থাকেন প্রদীপের ঠাকুরদা, দক্ষিণা রায়।

তিনিও তামাক টানেন। দক্ষিণার সব সময়ের চাকর নেই, বাড়ির চাকর নিবাসই সেজে দিয়ে যায় তামাক। মাঝে মাঝে কোনও মুনিশকে কিংবা চেনা-শোনা, কাউকে পেলেও সাজিয়ে নেন। আর কেউ যখন থাকে না, তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজেই ওঠেন, সেজে নেন।

কিন্তু সে তামাকের অমন মিষ্টি গন্ধ নেই। প্রদীপ অনেকদিন বাতাসে নাক রেখে শুঁকে শুঁকে দেখেছে, এ গন্ধটা রায়দাদুর মতো নয়।

আজও অন্যমনস্ক হয়ে তামাক টানছিলেন দক্ষিণা, হঠাৎ বাইরে শশী মাঝিকে যেতে দেখে উঠে আসেন: এই ব্যাটা, শোন্ দেখি।

শশী এগিয়ে আসে বিস্মিতমুখে।

সে-মুখের দিকে তাকিয়ে রাগে দক্ষিণা রায়ের গা জ্বলে যায়, বলেন: তুই অধর জেলের ছেলে না?

শশী মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

: বাঁওড়ে যে মাছ ধরলি—তার ভাগ কই? ঘাড় ধরে আদায় না করলে বুঝি টনক নড়ে না তোদের?

নিশ্চিত ভঙ্গিতে শশী বলে: দিছি তো।

: দিছিস? কই? কবে দিলি?

: ক্যান, বাবুগোরে ন্যায্য পাওনা মিটোয়ে দিয়ে গ্যালাম যে সেদিন। বাবুরা লোক পাঠায়ে দশ সের মাছ মাপায়ে আনিছেন! বাঁওড় আপনাগারে, না দিয়ে কি উপায় আছে?—বলে শশী একটু হাসবার চেষ্টা করে দক্ষিণার আরও রেগে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে। পরে যখন বুঝতে পারে দক্ষিণা তার কথা বিশ্বাস করছেন না, তখন বলে: আমার কথা বিশ্বাস করতিছেন না? রায়কত্তারে জিজ্ঞেস করবেন? ওই তো তামাক খাচ্ছেন। চলেন মুকাবালা করি।

কথাটা শুনে একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকেন দক্ষিণারঞ্জন। সারা শরীর রাগে থরথর করে কেঁপে ওঠে। হঠাৎ ছুটে গিয়ে লোকটার চুলের মুঠি চেপে ধরেন: হারামজাদা। সেদিন পর্যন্তও তুমি আমার বাড়ি বয়ে মাছ দিয়ে গেছ, আজ দিচ্ছ ও-তরফে। আর আমি যাব মুকাবালা করতে!

প্রথম একটা মুহূর্ত শশী কেমন হতভম্ব হয়ে থাকে। তারপরেই জোরে ঝাঁকানি দিয়ে মাথা ছাড়িয়ে নিয়ে সে সরে দাঁড়ায়; বলে: যখন জায়গা আপনাগারে ছিল দিছি, বাড়ি বয়েই দিছি। নিজেগারে জায়গা নিজেরা রাখতি পারেন নাই, আমার উপর দাপট করেন ক্যান?

শুনে দক্ষিণা এবার পা থেকে খুলে নেন বিদ্যাসাগরী চটি। কয়েক ঘা বসিয়ে দেন কাঁপা কাঁপা হাতে।

লোকটা সরে যায় না। দাঁড়িয়ে মার খায় আর ভাঙা-ভাঙা গলায় চেঁচায়।

গোলমাল শুনে এদিক-ওদিক থেকে লোকজন ছুটে আসে। এসে দাঁড়ান দক্ষিণার মেজ ছেলে সুখদারঞ্জনও। নাটমণ্ডপের বারান্দায় মাদুর

বিছিয়ে গোটাকয়েক ছেলেকে নিয়ে পড়াতে বসেছিলেন, ছুটে এসে থমকে দাঁড়ান। দক্ষিণার হাত থেকে চটিটা কেড়ে নিতে নিতে কঠিন দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় কেবল বলেন : আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন বাবা ? ছিঃ ছিঃ !

হঠাৎ কি হোল কে জানে। দক্ষিণার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। ক্লান্ত, রুগ্ন মানুষের মতো তিঁনি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে বৈঠকখানার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন।

মার খেয়ে শশী এতক্ষণ আক্রোশে, রাগে ফুলছিল। এবার হঠাৎ সুখদার পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে : দ্যাখেন মাজেবাবু দ্যাখেন, গরীবের উপর অত্যাচার কেমন ! উনি যদি ভালভাবে কতেন, আমি নিজের ভাগের মাছ দিয়ে যাতাম। কিন্তু কথার আগেই জুতোর বাড়ি।

ঝরঝর করে জল ঝরে পড়তে থাকে শশীর দু'চোখ বেয়ে. সে গামছায় চোখ মোছে।

সুখদা একবার চারপাশের দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনদের দিকে তাকান। অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে, কেউ হাসছে, কেউ বিরক্ত হয়েছে। কেউ কথা বলছে, কেউ চুপ করে আছে। লোক নেহাত কম জোটেনি।

এতক্ষণ ভিড়ের মধ্যে সবায়ের মাথা ছাড়িয়ে ওঠা বিশাল দেহ আর একজোড়া খুসি খুসি চোখ নিয়ে ব্যবধান রেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন রায়কর্তাও। তেমনি নিঃশব্দে চলে যাচ্ছেন।

পেছনে দাঁড়িয়ে সুখদার ছেলে আর ছাত্র দুজন।

আর ! সমস্ত বড়মানুষগুলোর আড়ালে, ভিড়ের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে কুলদার দুটি ছেলে-মেয়ে, ছবি আর প্রদীপ।

সুখদা তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিয়ে শশীর নগ্ন কালো পিঠের ওপর আলগোছে হাত রেখে বলেন : যা রে শশী, বাড়ি যা। বুড়ো হয়ে গেছেন, কি বলতে কি বলে বসেন, মনে রাখতে নেই।

আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে আসে। সবাই চলে গেছে। পল্টু আর ছাত্র দুটিও পড়তে বসেছে। সমস্ত উঠোনটার মধ্যে এখন দাঁড়িয়ে কেবল সুখদারঞ্জন আর কাকার চোখের দিকে ভয় মেশানো আতঙ্কিত দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছবি আর প্রদীপ।

একবার কেবল শান্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে আস্তে আস্তে সুখদা বলেন : যাও, বাড়ি যাও।

: বড়কা কিছু বলল না তো, বলল না, কিছু না,—প্রদীপ ভারি খুসি হয়ে ওঠে ভেবে। খুসি মুখেই সে বোনের দিকে তাকায় তারপর উঠোন ডিঙিয়ে দুজনেই বাড়িমুখো চলতে থাকে।

সুখদা আবার তাকান ওদের দিকে। কি যেন জিজ্ঞেস করবেন এমনিভাবে থমকে দাঁড়ান কিন্তু তারপর গিয়ে বসেন নিজের জায়গায়। ছাত্রদের বলেন, নিজের ছেলেকেও বলেন : পড় সব। হাঁ করে দেখছ কি ?

জানলা দিয়ে দক্ষিণাও দেখতে পেয়েছেন ওদের। হাত ধরাধরি করে চলেছে দুজনে। হঠাৎ পেছন থেকে ডেকে ওঠেন তিনি : প্রদীপ, এদিকে আয় তো। শোন !

সে ডাক রায়কর্ত্তার মতো গম্ভীর না হলেও ভয়ে প্রদীপের বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে ওঠে। সে থমকে দাঁড়িয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালে কি হবে ছবি জোর করে হাত চেপে রাখে।

পাংশুমুখে প্রদীপ বলে : ছাড় না ভাই, শুনে আসি।

: না, যাবিনে তুই। যা নিষ্ঠুর দাদুটা। শশী মাঝিকে কেমন করে মারল শুধু শুধু। ডাকলেই যেতে হবে ?

: যদি বলে, ডাকলাম এলিনে যে বড়—কি বলব তখন ?

চলতে চলতেই ছবি উত্তরটা শেখায় : বলবি, শুনতেই পাইনি।

: আমাকে কিন্তু ভাই দাদু খুব ভালবাসে, বলে আমি নাকি বংশের প্রদীপ। পন্টু, মন্টুকেও ভালবাসে, কিন্তু—, বলে হঠাৎ দাঁড়ায় একটু ; খানিকটা অবাক হওয়া গলায় বলে : আর তোকে কেন দেখতে পারে না ছবু ? বলে, নাচুনে মেয়ে, ধিঙ্গি। ঠাকমা সেদিন কাকীমাকে বলছিল, ও মেয়ে এ বংশের হাড়ে কালি দেবে। কেন ?

: জানিনে—, বলে তার রুক্ষ চুলগুলোকে একবার নাড়া দিয়ে ছবি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে পেছনে চটির শব্দ করতে করতে এসে ঢোকেন দক্ষিণাও।

পেছন থেকে প্রথমে কান টেনে ধরেন ছবির, আর এক হাতে ধরেন প্রদীপের, তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে ওঠেন : ভদ্দরলোকের

বাড়ির ছেলে-মেয়ে হয়ে দিনরাত চাষা-ভূষোর মতো মাঠে মাঠে ঘোরা। তোমাদের হাড়-মাংস আজ আমি আলাদা করব।

সেই চিৎকার শুনে ভাঁড়ার ঘর থেকে ঠাকুমা পূর্ণশশী ছুটে আসেন। বাবা নেমে আসেন সিঁড়ি দিয়ে। বিস্তিপিসিমা পান সাজা ফেলে ছুটে আসে কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে।

প্রদীপ কেঁদে ফেলেছে ভয়ে। দাদাটা যেন কি? ব্যথা কি তার লাগছে না! ছবির সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে লজ্জায়, কান ধরার অপমানে। সে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে সহ্য করে সেই চিমটি কাটা যন্ত্রণাটা, উদ্ধত ভঙ্গিতে। কেবল যখন দেখতে পায় মাও রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে বেরিয়ে এসেছে, ঘোমটাটা একটু টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার আড়ালে তখন আর চোখদুটো সামনে তুলে রাখা যায় না, নামিয়ে ফেলতে হয় মাটির দিকে।

ব্যাপারটা কয়েকটা মুহূর্তের কিন্তু ছবির মনে হতে থাকে সে যেন অনন্তকাল ধরে দাদুর হাতের মধ্যে ধরা তার লাল হয়ে যাওয়া কানটা নিয়ে শূন্যে ঝুলে আছে।

হঠাৎ ঠাকুমা প্রায় ছুটে আসেন। দুজনকেই দাদুর হাত থেকে মুক্ত করে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ঝংকার দিয়ে ওঠেন: ছাড় ছাড়। এমনি বকতে হয় বক, গায়েটায়ে হাত তোলা কেন? মেয়েছেলের গায়ে হাত দেয় কখনও? হোলই বা ছোট!

বাবা কোথা থেকে খুঁজে একগাছা কঞ্চি যোগাড় করে পূর্ণশশীর হাত থেকে প্রদীপকে কান ধরে সরিয়ে নিয়ে এসে বলেন: হতভাগা, পড়া নেই শোনা নেই, এত বেলা পর্যন্ত কোথায় পুলিশ, কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে! কাকা তোমাকে রাজা করে দিয়ে গেছে তো! পাজী-নচ্ছার! চাপা স্বরে কথাটা বলে একবার তাকান হরিনন্দনের ঘরের দিকে। সেদিকে একটা মুখকেও উঁকি মারতে দেখা যায় না।

সরু কঞ্চিটা বাতাসে একবার নেচে ওঠে। বাবার রাগকে জানে প্রদীপ। অন্তত এক ঘা না মেরে তা শান্ত হবে না। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে যায়। সে জলে ডোবার আগে কিছু একটা আঁকড়ে ধরার মতো করে কাঁপা গলায় বলে ওঠে: আমি কি একা গিয়েছি। ছবিও তো ছিল।

পূর্ণশশী এতক্ষণ ভারি করুণ চোখে তাকিয়েছিলেন সেই উদ্যত

বেতের দিকে। এবার সাহস করে এগিয়ে গিয়ে বেত চেপে ধরে প্রদীপকে একেবারে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেন : ওই ছাখ, আমি জানি যে ছেলের কোনও দোষ নেই। ওই মেয়েইতো ওকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, নইলে ওর সাধ্যি কি পুলিশের সামনে যায়। উনি কত ভয় দেখান, কত বোঝান—অধীরের কাছে বোমা-পিস্তল থাকে, ওরা মানুষ মারে, যেতে নেই। তা কি শোনার যো আছে? মেয়ে দিনরাত কানে মন্ত্র দিচ্ছে, দাদা চল কাকা ডাকছে, কাকা গল্প বলবে।

ছবির দিকে একবার ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে বলেন : মেয়ে নয়তো যেন সিংহবাহিনী, দিনরাত ছেলেদের সঙ্গে হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে। এ বাড়ির আরও তো মেয়েরা ছিল, আছে। এমন কাউকে দেখিনি। বেত তুমি ছেলের গায়ে তুলতে পারলে কুলদা, কিন্তু ওঠাও তো দেখি মেয়ের দিকে। যত জুলুম তম্বি তোমার সোনার চাঁদ ছেলেদের ওপর—, মনের সমস্ত জ্বালাটুকু উজাড় করে দিয়ে প্রদীপের হাত ধরে বেরিয়ে যেতে যেতে ঠাকুমা স্নেহমিশ্রিত স্বরে বলেন : চল দাদু, তোমাকে নাড়ু দিইগে। আর যেও না যেখানে-সেখানে। তুমি লেখা-পড়া শিখে কত টাকা-পয়সা রোজগার করবে। তোমার কি মেয়েমানুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে চলে।

ছবি চোখ তুলে একবার তাকায় ভাইয়ের মুখের দিকে। সে তাকানো দেখে প্রদীপ ঠাকুমার আঁচলে মুখ ঢেকে পালায়!

সবাই চলে গেলে এবার দরজার আড়াল ছেড়ে মা বেরিয়ে এসেছে, আর বাবা তখনও দাঁড়িয়ে আছে কঞ্চিখানা হাতে করে। রেগে আছে তা বোঝা যায় কিন্তু মারছে না তাকে। কেন মারছে না? অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে মারাও ভাল। এ নিস্তব্ধতা ছবির ভাল লাগে না।

হঠাৎ টের পায় পেছন থেকে কে যেন তার চুলের গোছা চেপে ধরেছে। ব্যথা পায় তবু বুঝতে পারে মায়ের হাত সেটা।

মমতা তাঁর হাতের খুস্তি দিয়েই পিঠের ওপর দু'ঘা বসিয়ে দিয়ে চাপা চাপা গলায় বলেন : হতভাগা মেয়ে, দিনরাত তোর জন্য আমার ঘরে-বাইরে কথা শুনতে হবে কেন! আর আমার সহ্য হয় না।

কুলদার দিকে চোখ পড়তেই মমতা আরও জ্বলে ওঠেন, বলেন :

দাঁড়িয়ে আছ কেন হাত নামিয়ে। পিটুনি দিয়ে ওঁদের খুসি করতে পারলে না? তাহলে তো ওঁদেরও শান্তি হোত—আমারও হোত।

নিজেরই কেমন গলা ভারি হয়ে ওঠে কথা বলতে বলতে, সজল হয়ে ওঠে চোখ। হাত ধরে হিড় হিড় করে ছবিকে উঠোন থেকে রোয়াকে এনে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন: সাতটা না, পাঁচটা না, একটা মাত্র মেয়ে আমার। তাকে একটু ভাল খাওয়াতে পারিনে, ভাল একটা জামা দিতে পারিনে অথচ আমি নাকি জমিদারের ছেলের বউ। দোষের মধ্যে মেয়েটাকে একটু বাইরে বেরোতে দিই, ঘরে আটকে রেখে পাকা করিনে, এইতো আমার অপরাধ? আজ থেকে আর তাও দেব না।

তাকে এমন করে টেনে সিঁড়ি দিয়ে তোলেন যেন সে একটা যন্ত্র—। মার খুন্তির বাড়ি পিঠে বেশ ভাল করেই লেগেছে, কানটা জলে যাচ্ছে এখনও। কিছুই যেন ভাল করে অনুভব করা যাচ্ছে না। ছবির চোখে যেন সকালের ঝলমলে আলোটা নিভে গেছে।

কাকাকে যে অমন করে বেঁধে নিয়ে গেল, কেউ কিছু বলল না। কাকার বাবা-মা ছাড়া আর কারুর কষ্ট পর্যন্ত হোল না। সে যন্ত্রণাটা জমা ছিল। শশীকে বিনা কারণে মার খেতে দেখে আর এক ধরনের জ্বালা জমা হয়েছিল মনের মধ্যে। তারপর প্রদীপকে ঠাকুমার কথায় সায় দিয়ে ভাল ছেলের মতো চলে যেতে দেখে অভিমানে মনটা ভরে উঠেছিল, কিন্তু মার কাছে হঠাৎ মার খাওয়া তার সব কষ্টকে ছাপিয়ে উঠেছে। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন তার বুকের পাঁজর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। সে হঠাৎ এতক্ষণে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

মমতা একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন। তারপর নিজেরও দু'চোখ ভরা জল নিয়ে দু'হাতে তাকে কাছে টেনে নেন: ইস্, বড্ড লেগেছে। দেখি। কেন তুই অমন করে আমার মাথা গরম করে দিস বল্‌তো। অন্য মেয়েরা কেমন ঘরে থাকে, কাজ করে আর তুই দিনরাত হৈ হৈ করে ঘুরবি, বলবে না লোকে! অধীরকে নিয়ে গেল, সবাই দূরে দাঁড়িয়ে দেখল। পল্টু, মন্টু সবাই। আর তোরা দু'টোতে কোন্ সাহসে অতদূর গেলি?

ছবি দু'হাতে মাকে আঁকড়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে আর তার

ভাঙা ভাঙা গলা থেকে শোনা যায়ঃ কাকাকে ওরা লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেল। কেউ কিছু বলল না—কেন?

পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে মমতা খানিকটা ভেবে নিয়ে বলেনঃ বলবে কি! অত সাহস কার আছে? ওদের যে কামান বন্দুক আছে। সবই তো ওদের। দেশটাই যে আমাদের নয়।

এত কথা বলতে পারেন মমতা বোধহয় নিজেও জানতেন না। তাঁরও মনের কোণে সকাল থেকে একটা কান্নার সুর বাজছিল সেটা এতক্ষণ পরে ছবির পিঠে হাত বোলাতে গিয়ে, কথা বলতে গিয়ে জল হয়ে ঝরে পড়ে। কেন তা তিনি বুঝি নিজেও জানেন না।

এবার ছবি মুখ তোলে। হাতের তালু দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে সোজাসুজি তাকায় মায়ের মুখের দিকে, বলেঃ কেন?

ঃ কেন?—মমতাও আঁচলে চোখ মুছে ফেলে বুঝি একটু হাসবার চেষ্টা করে। ম্লান ভাবেঃ অধীরকাকারাও তো তাই বলে, কেন! বলে, আমাদের দেশ আমাদের হবে, সেইজন্যেই তো ওদের ওপর এত রাগ ইংরেজদের। দেশের লোকও এত ভীতু, বন্দুক দেখে ভয় পায়। স্বদেশীদের দূর দূর করে। অথচ এমন সোনার টুকরোর মতো ছেলে অধীর, ধীরেন, প্রসন্ন—।

ছবি বলেঃ অনেক লেখাপড়া শিখলে কি তবে অধীরকা, ধীরেন-কাদের মতো সাহসী হওয়া যায় মা? আমিও তবে অনেক লেখা-পড়া শিখব।

মমতার মুখের ওপর দিয়ে নিমেষে আশা-নিরাশার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের যে লুকোচুরি খেলাটা হয়ে যায় তা বুঝবার ক্ষমতা ছবির নেই। মৃদুকণ্ঠে, আপন মনে বলা মায়ের কথাগুল্লোই কেবল ছবির কানে যায়ঃ মেয়ে হয়ে জন্মেছ এই সংসারে, জানিনে কি হবে। হয়ত পারতাম, হয়ত! যদি—।

প্রদীপ এসে দাঁড়িয়েছিল পেছনে, এতক্ষণে তা টের পান মমতা। তখন অনেক কথা মনে পড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলেনঃ যাও, দু'জনে চান করে এস-গে। তোমার ইস্কুলের বেলা হয়ে গেছে মণি, ছবিরও পাঠশালা আছে। পড়াশোনা তো কিছু করলে না—দেখো আজ কি কপালে আছে দু'জনের। আমার রান্না পড়ে রয়েছে—গ্যাখ কাণ্ড,—বলতে বলতে ছুটলেন নিচে।

আবার সেই ব্যস্ত মা। ছবির ভাল লাগে না কেবল কাজ আর কাজ —সারা দিন কাজ। রান্নাঘর। রান্না করা আর খেতে দেওয়া। অত কাজ না করলে কি হয় মানুষের?

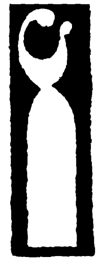
মা চলে যেতেই ঘর খালি। প্রদীপ যেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানর মতো, ছোটবোনের সামনে দাঁড়ায়।

ছবি চটেছে। সে কথা বলে না। মুখ ফিরিয়ে একদৃষ্টিতে দেখতে থাকে দেওয়ালের কৃষ্ণের ছবি-আঁকা ক্যালেণ্ডারখানা।

প্রদীপ পেছন থেকে তার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে অনুতপ্ত গলায় বলে : মা তোকে মেরেছে, না রে ছবু? আমি কি করব? আমার ভাই দোষ নেই!

: দোষ নেই!—ছবি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় : তুই অত ভীতু কেন রে দাদা? দাদুর কান ধরাতেই ওমনি কান্না? কেন—আমরা তো আর ঝগড়াও করিনি, মারিও নি কাউকে। কেবল দেখতে গিয়েছিলাম। আর দাদুরা কি? কাকাকে বেঁধে নিয়ে গেল, নিজেরা ঘরে বসে রইলেন। শশী মাঝিকে শুধু শুধু জুতো দিয়ে মারলেন। ওঁদের কোনও দোষ নেই তাতে?

তিন



লম্বা টানা বারান্দায় সুখদার সঙ্গে খেতে বসেছে প্রদীপ, পল্টু, মন্টু। ওরা স্কুলে যাবে। দুপুরবেলায় রোদের মধ্যে দূরের স্কুল থেকে ওদের আসতে দেওয়া হয় না, অন্য ছেলেরাও কেউ আসে না।

আসে ছবি। পাঠশালা কাছে বলে ও খেয়ে যায় না। দুপুরবেলা একটা বিশেষ সময় ঠিক আছে তার, রোদ্দুর দেখে ঠিক করে নেয়। কালী পণ্ডিতের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বই-শ্লেট বগলে সে ছুটতে ছুটতে আসে ও-পাড়া থেকে এ-পাড়ায়। রোজ একই সময়ে আসা চাই। কেন ? সে কথা ছবি কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারে না—বলেও না। কিন্তু মনে মনে নিজে ভেবে দেখে বুঝেছে ঐ সময়টায় মাকে একা পাওয়া যায়।

সারা বাড়িটা তখন নিঝুম্। উঠোন আর রোয়াক ভরা রোদে পা রাখা যায় না, পুড়ে পুড়ে যায়। তারই মধ্যিখানে একটা নেড়িকুকুর রোজ বসে বসে হাঁফায় জিভ বার করে, রোজ। তাকে দেখলেই কুকুরটার লেজ নড়ে, চোখ দুটো চকচক করে ওঠে, কারণ রোজ খেয়ে উঠে ছবি তাকে পাতের ভাত দেয়।

রান্নাঘরের বড় বড় উনুনদুটো তখন নিভে যায়। বারান্দাটা ধোওয়া হয়ে কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হয়ে থাকে, তখন ঢুকলে ভাল লাগে। সেই বারান্দার এক কোণে মা তার ভাত নিয়ে বসে থাকে, সে না আসা পর্যন্ত নিজে খায় না। কাকীমাকে আগে জোর করে খাইয়ে দেয়।

মেয়েটা যা পাজি! সবায়ের সঙ্গে খেতে বসালে মমতারই লজ্জা। মাছ, ডিমের ছোট-বড় নিয়ে চেঁচামেচি করে। কিছু বোঝে না—বোঝালেও বোঝে না। সেজন্যে তিনিই ইচ্ছে করে এ ব্যবস্থা করেছেন। কাউকে না জানিয়ে ওর পছন্দ-মত তরকারী রেখে দেন বেশি করে, বড় মাছ রেখে দেন।

যেমন জেদী আর উদ্ধত সব ব্যাপারে, তেমনি খাওয়ার ব্যাপারেও। তা নিয়ে ওর কোন লজ্জা পর্যন্ত নেই। এ যেন মেয়েই না।

ওর চেয়ে প্রদীপ অনেক ভাল। শান্ত, ভীতু ভীতু। এ মেয়েকে নিয়ে তাঁর কী যে জ্বালা!

কিন্তু শুধুই কি তাই? শুধুই পাঁচজনের সঙ্গে খেতে বসে ভাগের কম-বেশি নিয়ে চেঁচিয়ে তাঁকে লজ্জা দেবে এটাই কি সব!

নিস্তব্ধ দুপুরটায় যখন কেউ ঘুমোয়, কেউ কাজ করে বসে, তখন এই লম্বা বারান্দাটার এক কোণে মা-মেয়ে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে এক হয়ে যায় যে তার সুর সারাক্ষণ ধরে বাজতে থাকে মমতার মনে।

ঝাঁটার কাঠির মতো সোজা সোজা একরাশ চুল মেয়ের মাথায়, লাল লাল! হাজার তেল মাখাও, যে কে সেই! সেই রুক্ষ চুলের গোছা থেকে চুল উড়ে মেয়ের চোখে পড়ে, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে থাকে রোদে লাল হয়ে যাওয়া মুখে। সযত্নে মুছিয়ে দেন মমতা।

প্রদীপ তাঁর ছেলে, তাকেও ভালবাসেন প্রাণের মতো কিন্তু ছবির জন্যে কি যেন ব্যথা আছে—কিসের সে ব্যথা তা বুঝি মমতা নিজেও বোঝেন না। প্রদীপ তো ছেলে, এ বাড়ির সবায়ের সতর্ক দৃষ্টি তার ওপর। ছেলের দাবিতে সে সব পায়। চেয়েও পায়, না চেয়েও পায়। মেয়েটাও তেমনি করে পেতে চায়। তারও সব চাই, সবায়ের মতো করে চাই। অতটুকু মেয়ে সেকু যা নিজে বোঝে, ওকে তা বুঝিয়ে দিতে হয়।

মমতা নিজে তাই ওকে আগলে বেড়ান। এই সময় ওকে কাছে নিয়ে খাওয়ান, ভালটুকু, বড়টুকু। ভাল হবার জন্যে, শান্ত হবার জন্যে অনুরোধ করেন। মেয়ে খিদের মুখে গোগ্রাসে খায় আর খুব শান্ত হয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। তারপরেই আবার ভুলে গিয়ে যে কে সেই।

আজও তেমনি বসে আছেন, ভাতের থালা সামনে নিয়ে। বসে থাকতে থাকতে চমকে উঠেছেন প্রতিটি পায়ের শব্দে। কিন্তু এল না।

নিজের পেটের ভেতরটাও জ্বলে যাচ্ছে খিদেয়। রোজকার মতো আজও নেড়ি কুকুরটা বসে বসে হাঁফাচ্ছে জিভ বার করে।

: লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! বিকেলে এসেই খাই খাই করে পাগল করে দেবে..., বিড় বিড় করতে করতে নিজে খেতে বসেন কিন্তু কতবার খেতে খেতে হাত গুটিয়ে নেন! শেষে ছবির ভাত ঢেকে রেখে দরজায় শেকল দিয়ে আসেন বটে কিন্তু মনটা ভারী হয়ে থাকে।

কারণ ছিল না আসার।

পাঠশালায় ঢুকে রোজকার মতো আজও ছেলে-মেয়েরা যে যার জায়গা নিয়ে বসেছিল। কেবল কালী পণ্ডিতের লোহার চেয়ারখানা খালি, তিনপায়া কোণা-ভাঙা টেবিলটার ওপর বেতখানা তেমনি শোওয়ান। শানবাঁধান জায়গাটায় কতকগুলো লম্বা কাঠের বাক্স উপুড় করে পাতা। তারই একখানায় বসে পাঠশালার পাঁচটা মেয়ে, ছবি, উমা, দুর্গা, বাসন্তী আর সুরমা।

আজ ছবি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে সে মন দিয়ে পড়াশোনা করবে—বড হবে। অনেক বড়—অধীরকার মতো বড়, অত সাহসী! ধরে বেঁধে নিয়ে গেলেও ভয় পাবে না।

সে এতক্ষণ বন্ধুদের শোনাচ্ছিল অধীরকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কাহিনী। বলতে বলতে কখন তার মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠেছে, চোখ ছলছলে হয়ে উঠেছে। সঙ্গিনীরা তার কথা শুনছে কি না লক্ষ্যও করছে না। তার নিজের মুখটা কখনও রাগে, কখনও দুঃখে বেঁকে-চুরে এক এক সময় এক এক রকম হয়ে যেতে থাকে।

হঠাৎ কখন এক সময় খেয়াল হয়, এক দুর্গা আর তিন দিন ধরে আড়ি-দেওয়া শ্যামল ছাড়া কেউ শোনেনি তার কথা। ছবি এ দিকে মুখ ফেরাতেই শ্যামলও উঠে চলে গেছে। থাকৃগে! বড় হিংসুক শ্যামল! অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলতে দেবে না সে ছবিকে, খেলতে দেবে না, ওমনি রেগে যাবে। ছবি কি একলা শ্যামলের নাকি! নিজে আড়ি দিয়ে আবার চুপি চুপি কথা শুনতে আসাই বা কেন তবে! এসে আবার পালিয়েই-বা যাওয়া কেন! যাকৃগে! অন্যেরা ইসারা করছে, হাসাহাসি করছে। শেষে উমা যেন তাকে জোর করে চুপ করানর জন্যেই বলে: জানি! আজ হারাণঠাকুরের ভাগ্নীর ভাব দেখেই তা বুঝেছি। পুলিশ এসেছে তো এসেছে! তাতে তার কি বাবা! সবাই তো জানে! সকালবেলা

আমাদের বাড়ি এসে বলছে কি—উমা, তুই একবার ছবিদের বাড়ি যেতে পারিস? তোকে দুটো ডাব খাওয়াব।

: গেলি তো তুই ডাবের লোভে?—বাসন্তী বলে।

: আমি যাব? মা তাহলে চুলের মুঠি ছিঁড়ে দিত না? শেষে ওদের দিকের ঘাটে চান করতে গিয়ে দেখি, মায়াদি বাসন মাজতে মাজতে কাঁদছে। আমাকে বলল, ছবিকে একবার আসতে বলবি? তোর কাছে বুঝি চিঠি-পত্তর কিছু আছে অধীরদার?

ছবি অবাক হয়ে বলে: কই না তো? তোরা হাসছিস কেন ভাই? কেউ কাঁদলে সে জন্যে বুঝি হাসতে হয়? মায়াদি কেঁদেছে কাকার জন্যে—সত্যি সত্যি দেখেছিস? ছবি উমার কাছে ঘেঁষে আসে।

: আহা কাঁদবে না?—শাড়ি-পরা অকাল পক্ক মেয়ে তিনটে মুখ টিপে টিপে হাসে তার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে।

ওরা তিনজনে ফিস্‌ফিস্ করে সারাক্ষণ; হাসাহাসি, কানাকানি আছেই। পাঠশালার বন্ধু তাই, নইলে ওদের একটুও ভাল লাগে না। ওদের চারজনের মধ্যে দুর্গাটাই যা কেবল ভাল।

উমা, বাসন্তীদের নাকি আর পড়া হবে না, পাঠশালায় আসা বন্ধ হয়ে যাবে। ওরা নাকি বড় হয়ে গেছে! তাই বুঝি ওরা যখন তখন ইচ্ছে করে করে গায়ের ওপর কাপড় টেনে দেয়। যেন বিন্তিপিসির মতো বড় হয়ে গেছে এমনি ভাব!

ছবিরও তো ইচ্ছে করে শাড়ি পরতে। কিন্তু মা এখন দেবে না। তাহলে সেও ওদের মতো বড় হতে পারত।

কালীপণ্ডিত এসে ঢুকতেই এক মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে যায় সমস্বর চেঁচামেচি। শুধু পাঠশালার পণ্ডিত নয়, খড়ের চাল দেওয়া, উই খাওয়া, ঘুন লাগা বাঁশের খুঁটি দেওয়া পোস্টাপিসটার পোস্টমাস্টারও তিনি। সে কাজ সেরে আসতে আসতে বেশ বেলা হয়ে গেলেও ছেলে-মেয়েরা তার অনেক আগে থেকেই এসে বসে থাকে। ইচ্ছে মতো চেঁচায়, ঝগড়া করে—মারামারিও।

কালী এসেই বেতগাছটা টেবিলের ওপর সশব্দে বাড়ি মেরে হুংকার দিয়ে ওঠেন: নামতা পড়। সবাই পড়বি। কেউ চুপ করে থাকবিনে কিন্তু।

ছেলে-মেয়েরা তখনই সমস্বরে সুর ধরে: তিন দশে তিরিশ, চার দশে চল্লিশ, পাঁচ দশে…

ছবি দেখে সেই একটানা সুরের মধ্যেই উমা আর বাসন্তী তখনও ফিস্‌ফিস্ করছে, মায়াদির নামটাও দু'একবার কানে আসে।

সে বলে: উমা! বলে দেব কিন্তু পণ্ডিতমশাইকে।

পাশ থেকে ঝগড়াটে গলায় বাসন্তী বলে: বলে দিগে তো বয়ে গেল! তুই বিদ্বেন হবি, পড়গে যা। আমাদের কি? আর কদিন বাদে আমরা পাঠশালাতেই তো আসব না।

: তবে অধীরকার আর মায়াদির নাম করে তোরা হাসতে পাবিনে।

: ইস্—, মুখের বিকৃত ভঙ্গি করে উমা উত্তর দেয়: হাসব। আমাদের ইচ্ছে। সবাই জানে মায়াদির কিত্তি। বুড়ো মেয়ে হয়ে মামীমার কাছে মার খায় কেন জানিস?

জানবার জন্যে ছবির কোনও আগ্রহ হয় না। আহত অভিমানে সে চুপ করে থাকে আর টুকরো টুকরো কথা তার মনের মধ্যে ভেসে বেড়ায় এলোমেলো হয়ে, অত বড় মেয়ে মায়াদি! শান্ত ভালমানুষ! মার খায়! কেন?

নামতা পড়ার পর হাতের লেখা। সবাইকে দু'পাতা হাতের লেখা লিখতে দিয়ে এ সময় কালী পণ্ডিতের ঘুমানোর সময়। একটিপ নস্যি নিয়ে মাথাটা আলগোছে চেয়ারের ওপর ছেড়ে দিয়ে খানিক নিস্তব্ধ হয়ে থাকতে থাকতে একসময় কখন মাথাটা ঝুলে পড়ে চেয়ার ছেড়ে, নাক ডাকতে থাকে। ছেলেরা সেই সুযোগে কথা বলে, গুঞ্জন ক্রমে শব্দে পরিণত হয়। সে শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছলে তবে পণ্ডিতের ঘুম ভাঙে। ধড়মড় করে উঠে বসে হুংকার ছাড়লে তবে আবার পাঠশালা চুপ হয়ে যায়—এমনি ঘটে রোজ।

হাতের লেখা দেখাতে এসে কেউ বেতের বাড়ি খায়, গাঁট্টা খেয়ে কপালে ফুল ওঠে কারোর, কারোর চিমটি খেয়ে চোখের জল পড়ে।

ভুল বানান বলে পড়া না পেরে কেউ নীলডাউন হয়ে থাকে, কারোর মাথায় ইট চাপিয়ে বসিয়ে রাখা হয়।

এ সব পাঠশালা করার মতোই একটা নৈমিত্তিক কাজ মাত্র। পাঠশালার *কোন্ ছেলেটা ভাল, কোন্‌টা খারাপ সে উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার তিনি আজ পর্যন্ত করে দেখেন নি। পড়া করছে না, পড়া পারছে না—ভবিষ্যৎ খারাপ* হবে এ সব কথা ভেবে শাস্তি তিনি দেন না। পড়া না পারলে শাস্তি পেতে হবে এটাই শুধু জানা কথা।

তিনি জানেন, এ পাঠশালায় ছেলেগুলোর পড়ার মেয়াদ বছর দুই তিন, মেয়েদের হয়তো বছর খানেক।

কোনও মতে নামটা বানান করে লিখতে পারলেই মেয়েগুলোর পাঠশালার পড়া শেষ। তারপর ঘরসংসারের কাজ করবে, ভাই বোন রাখতে রাখতে ক্রমে নিজেরাও বিয়ের বয়সী হয়ে উঠবে। যার ভাগ্য ভাল তার বিয়েটা হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি, যে মেয়ের হবে না সে ধুমসী হয়ে ঘরে বসে থাকবে। মুখে বয়সের ছাপের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে মোছা চোখের জল লেগে থাকবে।

কিন্তু কোনও মেয়েকে তো আজ পর্যন্ত পড়ে থাকতেও দেখলেন না কালী পণ্ডিত। সেই ধুমসী, কালো, সারা মুখে ব্রণের দাগওয়ালা মেয়েটারও একদিন হঠাৎ বিয়ে হয়। পাল্কি চড়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কেঁদে ভাসায়। এই তো তাঁর পড়ানোর দাম!

আর ছেলেগুলো? তাদের কোনও মতে ইস্কুলের নিচু ক্লাসের উপযুক্ত করতে পারলেই হোল। তার জন্যে যতখানি ইচ্ছে বেত মারা যাবে। মাথা ফাটলে কিংবা হাত ভাঙলেও খুব ক্ষতি হবে না।

ছেলেগুলোর সবাই যে আবার ইস্কুলে ভর্তিই হবে এমন কোনও কথা নেই। এতদিন পাঠশালাটা চালাবার পর একটা অভিজ্ঞতা পণ্ডিতের হয়েছে···পড়াশোনাটা ভদ্রলোকদেরই। চাঁড়াল, কামার, কুমোরদের যে গোটাকয়েক ছেলে বছরে বছরে এক কোণে বসে পড়ে যায়, পাঠশালা ছাড়বার পর তাদের মধ্যে একটা কি দুটো ছাড়া কেউ আর ইস্কুলে ভর্তি হয়নি। ওদের অবস্থাও মেয়েগুলোর মতো। বানান করে নামটা লিখতে শিখলেই হোল। তারপর

কেউ হাঁড়ি গড়ে, রূপো-লোহার দোকান সাজিয়ে বসে গঞ্জে, কেউ ক্ষেতে লাঙল দেয়।

এ সবই তাঁর দেখা—দেখে দেখে চুল পেকে গেছে। তাঁর পাঠশালায় পড়া ভদ্রলোকদের ছেলেদের মধ্যে দু'একজন অনেক বড় হয়েছে। তারা পাঠশালা ছেড়ে ইস্কুলে গেছে, ইস্কুল ছেড়ে কলেজে, কলেজ ছেড়ে আরও ওপরে—ততখানি উঁচুর কথা ভেবে কালীর চিন্তা থই পায় না। তারপর তারা নাম করেছে, যশ করেছে। কিন্তু কালী পণ্ডিতের আর কোনও চিহ্ন থাকেনি কোথাও। গ্রামে এলে তারা দেখা করা তো দূরের কথা, দেখা হলেও কথা বলতে ভুলে যায়।

তাঁর জন্যে না হোক, তাঁর পাঠশালাটার জন্যেও কারোর মাথা ব্যথা নেই। ছেলে-মেয়েদের দেওয়া দু'আনা, চার আনা, আর ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের ন'মাসে ছ'মাসে ছুঁড়ে দেওয়া সাত টাকা আট আনার হিসেব ধরলে তাঁর মাসিক আয় পনের টাকা।

সে টাকায় সংসার চলে না বলে অনেক হাতে-পায়ে ধরে গ্রামের পোস্টমাস্টারীটা পণ্ডিত পেয়েছেন। কিন্তু ভাল লাগে না।

টাকার জন্যে পণ্ডিতের দুঃখ নেই—বুনো রামনাথের গল্প তাঁর জানা আছে। ছেলেদের কতদিন সে গল্প শুনিয়েছেন।

কিন্তু শোনালে কি হবে! সে শ্রদ্ধা নেই, সম্মান নেই! ছেলেগুলো যতদিন পাঠশালায় পড়ে, হয়তো শাস্তির ভয়ে চুপ করে থাকে। কিন্তু পাঠশালা ছেড়ে, যখন সদ্য গোঁফের রেখা-দেওয়া মুখে এক ক্লাস ডিঙিয়ে আর এক ক্লাসে উঠতে থাকে তখন কেমন করে যেন কালীকে অশ্রদ্ধা দেখানোর একটা অধিকার ওরা তৈরি করে নেয়। তখন আর পণ্ডিতমশাই বলে না, বাবা-কাকাদের দেখাদেখি বলে 'মাস্টার'।

সে ডাক পোস্টাপিসের মাস্টারীর জন্যে।

তাঁর ট্যারা চোখ নিয়ে হাসাহাসি করে। খোঁড়া পা নিয়ে—এমনকি পড়ানো নিয়েও। কেউ দাম দিতে চায় না।

কেবল একজনের কাছ থেকে দাম পেয়েছেন। খুশিতে কালী পণ্ডিতের ইচ্ছে হয়েছে সে কথা সবাইকে ডেকে শোনাতে কিন্তু কি

ভেবে আবার থেমে গেছেন। এমনকি নিজের বউকে পর্যন্ত বলেননি সে মানুষটার কথা। তিনি ছবির মা—মমতা।

ব্যাপারটা সামান্যই।

একদিন কালীকে ডেকে পাঠিয়ে মমতা বলেছিলেন: কালী ঠাকুরপো। ছেলেটাকে তার বাবা-কাকারা নিয়ম মতো পড়াবে তা তুমি জান। কিন্তু আমার ছবুটার ওই পাঠশালা পর্যন্তই। যতদিন পার, তোমার যতখানি বিদ্যে আছে সব দিয়ে ওকে শেখাও ভাই। তারপর যা থাকে ওর ভাগ্যে।

হয়তো সে কথা বলতে গিয়ে মমতার গলা ধরে এসেছিল, চোখ মুছেছিলেন আঁচলে কিন্তু কালী একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন।

ইচ্ছে হয়েছিল অনেক কথা বলবার, যা তিনি ভাবেন, কিন্তু বলেন না।

তবুও সব বলা না গেলেও অভিভূত কালী গলা পরিষ্কার করে শুধু বলেছিলেন: দেখব, আমি ছবুকে দেখব। এমন মা যার সে মেয়ের ভাগ্য ভালই হবে—আমি বলছি, ভাল ভাগ্য হবে ছবির।

মমতা বলেছিলেন: ভাল ভাগ্য মানে তো বিয়ে? সে তো মেয়েদের আছেই।

একমাত্র ভাগ্য বিয়ে নয়। কি তবে বলতে চায় ঘোমটা টানা রায়বাড়ির এই বউ। কোন্ স্পর্ধায় বলতে চায় বিয়ে নয়—অন্য কিছু! অন্য ভাগ্য।

ভারি আশ্চর্য আর নতুন লেগেছিল মানুষটাকে। ভারি খুশি হয়েছিলেন তিনি। সে খুশি মমতার দেওয়া টাকাকটার জন্যে নয়, নতুন শোনা কথাটার জন্যে।

কিন্তু নিঃশব্দে বেরিয়ে যাওয়া হয়নি। পূর্ণশশী এসে সামনে দাঁড়িয়ে হেসেই জিজ্ঞেস করেছিলেন: বড় বউমা ডেকেছিলেন মেয়ের পড়াশোনার খোঁজ নিতে বুঝি?

কালীর উত্তর দেবার কিছু ছিল না।

পূর্ণশশী অবশ্য নিজের মনেই বলেছিলেন: মেয়েকে একেবারে জজ্ ম্যাজিস্টর করবেন মায়ে। নয় পেরিয়ে দশে পড়বে, আর পাঠশালায়

রাখতে দিলে তো কত্তা। বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি গেলে কোথায় যাবে লেখা-পড়া ? তখন হাঁড়ি ঠেলে, ছেলে মানুষ করেই কূল পাবে না। মেয়েমানুষের কপাল !

প্রতিবাদ করে কি হবে—সে ভবিষ্যতের কথা কালীও ভাবেননি। কিন্তু সেদিন থেকেই তাঁর গলায় স্নেহের সুর লেগেছে ছবির জন্যে।

আজও পড়া দেওয়া শেষ হলে যথারীতি বলে ছবি : খেতে যাব পণ্ডিতমশাই ?

কালী বলেন : যা। বেশি দেরি করিসনে। এসে ভূগোল পড়া আর শ্রুতিলিখন দিবি।

বই-শ্লেট নিয়ে বাড়িমুখে প্রায় খানিকটা ছুটে চলে ছবি। হঠাৎ দাঁড়ায় একেবারে পেছন ফিরে, মায়াদির কাছে যেতে হবে যে।

বাড়ি যাওয়া হয় না। আবার উল্টোমুখো হাঁটতে শুরু করে সে। প্রায় দৌড়নোর মতো করে হাঁটে। ভয়ও করে একটু একটু। পাঠশালার ছেলে-মেয়েরা কিংবা বড়রা যদি কেউ দেখে ফেলে যে সে ঠিক দুপুরবেলায় রোদের মধ্যে চলেছে ভট্‌চাযি্যি পাড়ার দিকে তবে বকুনি খেতে খেতে তার প্রাণটা বেরিয়ে যাবে বাবা ! তাদের খিড়কির পুকুরের ঘাটে দাঁড়ালেই মায়াদিকে দেখে কথা বলা যায় কিন্তু পাড়া ঘুরে যাওয়া—ক-তখানি হাঁটতে হবে তাকে !

খানিকটা দৌড়ে গিয়ে ফুটবল খেলার মাঠটার মধ্যে থেকে ছবি এবার আস্তে আস্তে হাঁটে। অনেকদূর চলে এসেছে সে—এবার আর কেউ দেখতে পাবে না তাকে। কেবল সামনের আমবাগানটা পার হতে পারলেই হয়ে গেল। কিন্তু এইবার তার বুক ঢিপঢিপ করে—ঠিক দুপুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা। কেউ কোথাও নেই। যদি কিছু হয় ! যদি ধাঁই করে একটা ইঁট এসে তার মাথায় লাগে।

ভেবে একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে যায় সে। ভয়ে মাটির সঙ্গে পা দুটো যেন আটকে থাকে তার, তারপরই হঠাৎ সমস্ত শক্তি একত্র করে দৌড়য়—ছুট্, ছুট্।

রঘু ভট্‌চাযি্যির বাড়ি ঢোকার সময় আবার পায়ের শব্দটা থামিয়ে

নিঃশব্দ হয়ে যেতে হয়। উঠোনে বাঁশের ওপর ছেঁড়া ঝুলিঝুলি একটা বিবর্ণ তোষক ঝুলছে। কেবল ওটা দেখেই ছবির কেমন করে যেন মনে হয়—ওরা গরীব। খু-ব গরীব।

রায়দের বাঁধা পুরোহিত মায়াদির মামা এই ভট্‌চাযি্যি ঠাকুর। তাদের নিত্য-সেবা নারায়ণের পূজারী। তাছাড়া গ্রামের এ-বাড়ি, সে বাড়িও পূজো করে বেড়ায়। নৈবিদ্যির চালে তার ভাতের অভাব হয়নি এ পর্যন্ত, কিন্তু শুধু ঐ ভাতই—মুড়কি আর চিঁড়েও অবশ্য জোটে কোনও কোনও পূজোয়। কিন্তু হলে কি হবে? ছেলেমেয়ে একপাল। দিন-রাত হাউ মাউ, খাই খাই। এ সংসারের অভাব কোনও দিন যাবে না।

এ সব মায়াদির কথা। ছবির মার কাছে একদিন গল্প করে গেছে মায়াদি সত্যনারায়ণের প্রসাদ খেতে এসে।

মায়াদির মা-বাবা কেউ নেই। মামার বাড়িতে থাকতে হয়। দিন-রাত খাটে—রান্না করে, বাটনা বাটে, জল টানে, বাসন মাজে আর ছেলে রাখে। কিন্তু তবু হাসে। তাকে বা মণিদাকে ও-ঘাটে দেখলেই ওমনি মায়াদির ফর্সা মুখটা হাসিতে ভরে ওঠে। ওদের ঘাট থেকে লাল ফুল তুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়—কোনটা আসে, কোনটা আসে না।

অত সকালেই ওই পচা জলে নেমে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দু'এক দিন অধীরকার কথাও জিজ্ঞেস করেছে।

কিন্তু মায়াদি কাঁদে কেন? মামীমার কাছে মার খায় কেন?

সেইজন্যেই তো খিদে ভুলে ছুটে এসেছে সে দুপুর রোদ্দুরে, সব কথা জেনে নেবে বলে।

খান তিনেক টিনের ঘরের একখানায় একদল ছেলে-মেয়ে হুড়োহুড়ি করছে। পাশের ঘরটায় মায়াদির মামীমা ঘুমোচ্ছেন। তাঁর কাছে দুটো ছেলে-মেয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে আছে ছেঁড়া মাদুরে।

সবচেয়ে শেষের অন্ধকার ঘরখানা মায়াদির, সে কথা জানা আছে।

কাত হয়ে শুয়ে একটা ছোট ন্যাংটো ছেলেকে মেঝেয় ফেলে চাপড়াচ্ছে মায়াদি।

ভ্যাপসা গন্ধ বার হচ্ছে ঘর থেকে। ছোট জানলাটা আছে বটে কিন্তু আলো আসে না। ঘরটার একপাশে নৈবিদ্যির ভিজে চাল শুকিয়ে জমা করা থাকে, গাছ থেকে পাড়া ও পূজোয় পাওয়া নারকেল থাকে।

আর একপাশে আছে একট মস্ত কাঠের সিন্দুক, কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে তিন চারটে মুখ-বাঁধা বস্তা। সারা ঘরটায় ছেঁড়া তোষকের তুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। মাটিতে পাতা তোষকটা ছোটছেলের পেচ্ছাপের গন্ধে ভরা।

পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে ছবিকে দেখে উঠে বসে মায়া। দুজনে দুজনের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে খানিক। উঠে বসেও এতক্ষণ ধরে যে হাতখানা দিয়ে আধ-ঘুমন্ত ছেলেটাকে একটানা চাপড়ে চলেছিল, সেটা কখন একসময় বন্ধ হয়ে গেছে। সেই হাতখানা দিয়ে ছবির হাতখানা টেনে নিয়ে, মায়াই প্রথম কথা বলে। তার ঠোঁট কাঁপে: ছবু, যাবার সময় তুই দেখেছিস্ ?

: হ্যাঁ।

কি যেন প্রত্যাশা করে মায়া ছবির মুখের দিকে তাকায়, তারপর আবার বলে: কিছু বলেছে ? আমাকে বলবার জন্যে কিছু বলে দেয়নি তোকে ?

ছবি নিঃশব্দে মাথা নাড়ে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মায়াকে মাথা নিচু করতে দেখে ছবি বোঝে মায়াদির খুব কষ্ট হয়েছে তার কথা শুনে। কিন্তু সে কি করবে! মিথ্যে কথা তো আর বলতে পারবে না।

কাকাটা যেন কি! কষ্ট হতে থাকে তার সে মুখের দিকে তাকিয়ে। কিছু বলে গেল না কেন অধীরকা ?

একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত সে জিজ্ঞেস করে বসে: তুমি অধীকার জন্যে কেঁদেছ মায়াদি ? তোমার মামীমা তোমাকে মারে ?

মুখটা মুহূর্তের মধ্যে কেমন অন্যরকম হয়ে যায়। তীব্র গলায় মায়া বলে: কে বলেছে রে ?

: উমা আর বাসন্তীরা আজ পাঠশালায় হাসছিল তোমার মার খাওয়ার কথা নিয়ে। কেন মেরেছে মায়াদি ?

মায়াদি কেমন অদ্ভুত করে হাসবার চেষ্টা করে। ঠিক হাসি নয়, কান্না পেলে তাকে চেপে রাখতে গেলে যেমন মুখ হয় তেমনি মুখ হয়ে গেছে। সেই মুখ থেকে আস্তে আস্তে একটা কথা বেরিয়ে আসে কেবল: সে তুই বুঝবিনে ছবু।

বুঝবিনে। বড়দের কেবল ঐ এক কথা! কি এমন কথা যা ছবি বুঝবে না?

গম্ভীর মুখ নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ছবি একটু বসে থেকে উঠে আসতে যায়: মায়া তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ, এবার সে ছবির হাত ধরে বসিয়ে বলে: তুই যে এলি এখন—খেতে যাস্‌নি? মুখটা যে শুকিয়ে গেছে, খিদে পায়নি তোর?

: তুমি ডেকেছ যে?

: তাই বলে না খেয়ে ছুটেছিস? ইস্‌! দাঁড়া দেখি তোকে কি দিতে পারি। দাঁড়া একটু দুধ নিয়ে আসি, চিঁড়ে আর গুড় আছে এ ঘরে।

খেতে ভাল লাগে না ছবির। অন্যমনস্ক বিরক্ত হয়ে ঠাণ্ডা দুধে ভেজানো শক্ত চিঁড়ে মুখে পুরে চিবোয়। খাওয়া হোল। সব হোল, আসল কথাটার উত্তর পাওয়া গেল না।

মায়াদি তাকিয়ে তাকিয়ে তার খাওয়া দেখে আর ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে তাকায়। খাওয়া শেষ হলে তার হাত থেকে তাড়াতাড়ি খালি বাটি সরিয়ে রাখে ঘরের এককোণে। একটু ইতস্তত করে ছবিকে একহাতে নিজের কাছে সরিয়ে আনে। তার চুলের গোছা সরিয়ে দিতে দিতে আস্তে আস্তে বলে: প্রদীপকে জিজ্ঞেস করিস ছবু! ওকে হয়তো কিছু বলে গেছে!

ছবির দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়া দেখেও যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না, জেদের মতো করে বলে: 'করিস্‌ না তুই জিজ্ঞেস! আর শোন্‌—দরজার দিকে পা বাড়ানো ছবির হাতখানা যেন সে কিছুতেই ছাড়তে চায় না: অধীরদার কোনও খবর কিংবা চিঠিপত্তর এলেই আমাকে জানিয়ে যাবি, কেমন? যাবি তো ছবু?

মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে বেঁচে যায় ছবি। ঘরটার ভ্যাপসা গন্ধে আর ঠাণ্ডা দুধ চিঁড়ে খেয়ে তার পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠেছে। আর না! চলতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়ায় সে। মা হয়তো ভাত নিয়ে বসেই আছে।

কিন্তু মায়াদিও ভাল। ঠাণ্ডা দুধ! তা কি করবে? ওর মামীমা যা! এই নিয়েই হয়তো বকুনি দেবে।

আবার তেমনি করে বুক টিপ্‌ টিপ্‌ করা ভয় নিয়ে ছুটে আমবনটা

পার হয়। ফুটবল খেলার মাঠটার মধ্যে এই বাঁ বাঁ রোদ্দুরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে—কে! দূর থেকে তাকে খানিকটা চেনা লাগে, খানিকটা লাগে না। ইস্ —ওর সঙ্গে তো আড়ি কক্খনো ও নয়।

কিন্তু শ্যামলই! সত্যিই সে!

ছবির যেন বিশ্বাস হয় না। শ্যামলের ফর্সা ধবধবে মুখটা রোদে লাল হয়ে রয়েছে। কথা বলবার জন্যে ঠোঁট কাঁপছে কিন্তু আড়িটা যে ছবির দেওয়া। ছবি যদি কথা না বলে?

ছবিও ছুটে এসেছে। তারও বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে, তারও রোদে মুখ লাল কিন্তু শ্যামলের সেই লাল টকটকে মুখখানা দেখে অতটুকু মেয়ে ছবিরও বুঝতে দেরি লাগে না যে কখন থেকে ছেলেটা শুধু তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তার বুকের ভেতরটায় কেমন করতে থাকে।

সে আড়ি ভোলে, পুরনো রাগ ভোলে। তারও ঠোঁট কাঁপে, চোখ ছলছল করে। শ্যামলের হাত ধরে প্রথম কথা বলে সে: তোর সঙ্গে আমার আর আড়ি নেই।—আজ তার মনটা কেমন যেন হয়ে গেছে।

তারপর দুজন সেই আগুনের সমুদ্র পার হয়, কখনো দৌড়ে কখনো হেঁটে।

তাদের দুজনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে ছবির বন্ধুরা আবার হাসে মুখ টিপে। ছবির তা গায়েও লাগে না। সবাই জানে শ্যামলের সঙ্গে যত তার আড়ি, তত তার ভাব। হাসুকগে।

খাবার ছুটির পরে পড়া শুরু হয়ে গেছে। ছবি ভূগোল পড়া দেয়, শ্রুতিলিখন দিতে হয়। আর সারাক্ষণ মনটা তার ভার হয়ে থাকে। শ্যামলকে সে মায়াদির সব কথা বলেছে কিন্তু শ্যামল কি করে উত্তর দেবে? সে-ও তো ছোট।

বড়রা সব অদ্ভুত! সব যেন কেমন। কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না। সবাই তাকে বোকা ভাবে, পড়ার সাথী উমা, বাসন্তীরা পর্যন্ত। ভাবুকগে! একদিন সেও তো বড় হবে! তখন সব বুঝবে। সব।

ওদিকে ক্রমে বেলা পড়ে আসে। পাঠশালার ভাঙা লতা-পাতা গজানো জানলায় আর সিঁড়ির ধাপে ধাপে লুটিয়ে-পড়া রোদ্দুর আস্তে

আস্তে ধূসর হয়ে মিলিয়ে আসতে থাকে। ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে সারা-দিনের চকচকে রঙ। ছেলে-মেয়েরা সেই বাইরের দিকে তৃষিত চোখে তাকিয়ে থাকে। পাঠশালায় ঘড়ি নেই। ঘণ্টা, মিনিটের সময় ওরা গুনতে জানে না। কিন্তু বাইরের রোদের রঙ বদলানোকে ভালভাবে চেনে। রোজ একই সময়ে কখন আপনা থেকে বই, শ্লেট, পেন্সিল গোছাতে থাকে।

খানিক পরে সোজা হয়ে বসে কালী পণ্ডিত বেতখানাকে টেবিলের টানা ড্রয়ারে রেখে দেন। মস্ত লম্বা হাই তোলেন, নস্যি নেন একটিপ, বলেন : যা, বাড়ি যা সব।

ওমনি হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ভাঙা জানলা টপকে, ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ে কে আগে যেতে পারে তারই চেষ্টা চলে। দু'এক মিনিটের মধ্যেই পাঠশালাটা নিস্তব্ধ। তারপর সারারাত ধরে দেওয়ালের ভাঙা গর্তে বসে পা.রারা ডাকে আর পাখা ঝাপটায়।

চার



ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় পূর্ণশশী খেতে দিচ্ছেন ইস্কুল ফেরত পল্টু, প্রদীপকে—সুখদা আর কুলদাকে। এছাড়া সুখদার ছোট দুটো ছেলেও আছে। মুড়কি আর ক্ষীর হয়েছে আজ। সামনের ধামা থেকে মুড়কি তুলে দিচ্ছেন বাটিতে, হাতায় করে ক্ষীর।

ছবির চোখ চকচক করে। আজ দুপুরে ভাত খায়নি, সে কথা ভুলে গিয়েছিল। ক্ষীর আর মুড়কি যেন তার সেই ভুলে-থাকা খিদেটাকে মোচড় দিয়ে জাগিয়ে দেয়। বই-শ্লেট দরজার কাছে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা বাটি টেনে নিয়ে সেও এসে বসে: আমাকে ঠাকমা।

পূর্ণশশী তার বাটিতেও মুড়কি তুলে দেন, ক্ষীর দেন। খেতে খেতে আবার বাটিটা বাড়িয়ে ধরে পল্টু, প্রদীপও। আর দুটো মুড়কি চায় তারা, আর একটু ক্ষীর।

ছবিও বাটি বাড়ায়: সবাইকে দিচ্ছ, আমাকেও দাও ঠাকমা। পেট ভরেনি আমার।

: আর নেই, এই দ্যাখ—, খালি বাটিটা পূর্ণশশী কাত করে দেখান।

হঠাৎ কেমন মাথা গরম হয়ে যায় রাগে। তীক্ষ্ণ রিনরিনে গলায় ছবি চেঁচিয়ে ওঠে: সবাইকে দিলে দুবার করে, আমাকে দিলে একবার মাত্তর, তাও কতটুকুন। পল্টুদা, মণিদা, ওরা চাইলে তো নেই বল না!

: শোন কথা!—একটা মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থেকে পূর্ণশশীও চেঁচিয়ে ওঠেন: লেখা-পড়া শেখার ফল ফলছে দ্যাখ। মেয়ে এসেছে সোনার চাঁদ ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে! কিসে আর কিসে! ছেলেদের মতো তুই কি রোজগার করবি? হবি তো বাপের বুকের শেল—আর দু'দিন পরে তো বিয়ের চিন্তেয় বাপের গলা দিয়ে ভাত নামবে

না—, কথা শেষ না করেই উঠে গিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে আর একটু ক্ষীর এনে ছবির বাটিতে ঢেলে দেন পূর্ণশশী।

ক্ষীরমাখা হাতখানা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল এতক্ষণ। ঠাকুমা আর একটু ক্ষীর ঢেলে দিতেই মাথায় যেন ভূত চাপে মেয়েটার: খাব না আমি—, বলে রাগে টান মেরে বাটিটাকে একেবারে উঠোনের মধ্যে ফেলে দেয়!

অবাক! এত অবাক বুঝি পূর্ণশশী তাঁর জীবনে হননি। ছেলেরাও খাওয়া ভুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

: মেয়ে নয়তো, বিষমাঝালি—, চেঁচাতে থাকেন পূর্ণশশী: কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বাক্যে মারে পুড়ে পুড়ে........!

চেঁচামেচি শুনে কে এসেছে, কে আসেনি, ছবি তা তাকিয়েও দ্যাখে না। কেবল মা যখন এসে চুলের গোছা ধরে টেনে ওঠান, পিঠের ওপর দুম দাম কিল মারেন তখন বোঝে একটা মস্তবড় অন্যায় করে ফেলেছে সে হঠাৎ।

মা বলেন: খেতে হবে না তোর লক্ষীছাড়ী, হ্যাংলা মেয়ে। দুপুরে ভাত খাস্‌নি—এখন এসেছিস্ কেন মরতে।

মার গলা ভার, কথাগুলো কাঁপা কাঁপা।

শাশুড়িকেও বলেন মৃদু গলায়: ওকে ঘাড় ধরে উঠিয়ে দিলেই পারতেন মা। খেতেই দিলেন যদি তবে আর অত সব কথা বললেন কেন? ছেলে-মেয়ের তফাৎ অতটুকু মেয়ে কি বুঝবে!

ব্যথা করা পিঠটার কথা ভুলে গিয়ে ছবি শুধু বোঝে মা সব দেখেছে, সব শুনেছে। তার পিঠের ব্যথাটা যেন কমে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

পূর্ণশশী আগের চেয়েও অবাক হয়ে গেছেন যেন, বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজের কানকে এমনি করে বলেন: বাবা, কি বলেছি তোমার মেয়েকে যে অমন রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরেছে? অপরাধ যদি হয়ে থাকে, ক্ষমা কর বউমা—, সত্যি সত্যি হাত জোড় করে ঠাকুমা মার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে! ছবি মাথা নিচু করে ফিক্ করে হেসে ফেলে।

মৃদু গোলমাল, কথা কাটাকাটির মধ্যে বাবা, বড়কা এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার কাছে। মমতা এবার লজ্জিতমুখে ঘোমটা টেনে সরে গেলেন।

সুখদা কার কাছ থেকে যেন ব্যাপারটা শুনে নিয়েছেন ততক্ষণে, এবার

এসে ছাবর হাত ধরে কাছে টেনে বলেন : আয় ছবু। ভাঁড়ার ঘরে যত ক্ষীর আছে ঠাকুমার, সব খেয়ে ফেলিগে চল। দেবে না কি রে ?

ছবির পক্ষে প্রস্তাবটা ভাল কি মন্দ তা বোঝবারও সময় পাওয়া যায় না। মমতা এসে হঠাৎ পথ আগলে দাঁড়ান ছবির হাতখানা টেনে নিয়ে, গলা তাঁর গম্ভীর কিন্তু মৃদু। বলেন : না ঠাকুরপো। ওকে অমন করে ভুলিও না। একটু বুঝতে দাও।

সুখদা একবার তাকান বৌদির ঘোমটা-টানা মুখের দিকে। আপনা থেকেই তাঁর ধরা হাতখানা শিথিল হয়ে ছেড়ে যায়। তবু হাসবার চেষ্টা করে বলেন : তোমাদের যত কাণ্ড বউদি। ছেলেমানুষ! চেয়েছে, একটু দিলেই খুশি হয়, তা না……।

: ছেলেমানুষ !—মমতা রেগে ওঠেন : ছেলেমানুষ হলেও ও যে মেয়েমানুষ ! এই কথাটাই বোঝে না আর সব মেয়েদের মতো, এটাই যে আমার জ্বালা !

এত যে কাণ্ড, এতক্ষণ কুলদা কিন্তু একটা কথাও বলেন নি। যেমন বসেছিলেন রোয়াকে, তেমনি বসে ছোট ছোট চুমুকে চা খাচ্ছিলেন। এতক্ষণ পরে এপাশে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন : এটা আবার এখানে বসে ফোঁপায় কেন এঁ্যা ? তোরও পিঠে পড়েছে নাকি দু'চার ঘা ?

ছবি সব ভুলে সেদিকে তাকায়। প্রদীপ কাঁদছে !

পাশে গিয়ে দেখে ওর খাবারের বাটি তেমনি পড়ে আছে, বাটিতে ক্ষীর শুকিয়ে চট্‌চটে হয়ে গেছে। হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে সে ফোঁপাচ্ছে।

দু'হাতে নাড়া দিয়ে ছবি বলে : এ্যাই দাদা, এ্যাই। মা তো মেরেছে আমাকে, তুই কাঁদছিস কেন ? জানিস, একমুঠো চুল ছিঁড়ে গেছে মা'র হাতের মধ্যে।

কান্নাভরা গলায় প্রদীপ বলে : তোকে সবাই কেবল বকে, কথায় কথায় মা মারে। আমার কষ্ট হয় না বুঝি ? তুই কেন বাটিটা ফেলে দিলি ভাই ? নইলে তো মার খেতিস না !

ছবি পাশে হাঁটু মুড়ে বসে ফ্রকের কোণা দিয়ে ভাইয়ের চোখ মুছিয়ে দেয়। গম্ভীর তার মুখ, বলে : ঠাকমা ওই সব বলল—নইলে তো ফেলতাম না ? কিন্তু আমি তো কাঁদিনি মার খেয়েও, তুই কাঁদলি ? ওই ছাখ্ পণ্টুদা, মণ্টু হাসছে। বড়কা, বাবা সবাই। তুই কি রে দাদা !

মমতা চুপ করে রান্না ঘরে বসেছিলেন। সেখান থেকেই চোখ গেল ওদের দু'ভাই-বোনের দিকে। মেয়েটার খুশি হয়ে ওঠাও দেখলেন। কে বলবে যে একটু আগেই খিদের মুখে খাবার খেতে গিয়ে এই মেয়েটাই গঞ্জনা শুনেছে, মার খেয়েছে। শেষ বেলার পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে ওর মুখে, চুলে—আলোয় যেন স্নান করছে মেয়েটা। দেখে বুকের ভেতরটা এক অব্যক্ত ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে।' হঠাৎই চোখের কোণের জল মুছে ফেলে নিঃশব্দে মন দেন নিজের কাজে।

অনেক রাতে! কত রাত তা ছবি বলতে পারে না। যখন ঘুম ভেঙে গেলে অনেক দূর থেকে মাঝে মাঝে কেবল কুকুরের ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না, ঘরের কোণে লণ্ঠনটা নিবু নিবু হয়ে জ্বলতে থাকে, ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাস সারা ঘরে শব্দ হয়ে ঘুরে বেড়ায় তখন একটা ভয় ছবির বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা করে হাত-পা শক্ত করে দেয়। সে চোখ খুলতেও সাহস পায় না। গড়িয়ে গিয়ে মায়ের গায়ের কাছে ঘেঁসে শোয়, মার হাতখানা নিয়ে নিজের গায়ের ওপর রাখে, কানের মধ্যে আঙুল পুরে দেয় নিঃশ্বাসের ফিস্‌ফিস্ শব্দটা আটকাবার জন্যে।

ঠিক তেমনি রাতে আজও তার ঘুম ভাঙে! বোধহয় সে একটু নড়েছিল মার কাছে ঘেঁসে শোবার জন্যে, কে যেন পাশ থেকে ফিস্‌ফিস্ করে ডাকে, ছবু।

মা! মা ডাকছে! আজ আর ভয় নেই। আজ তাকানো যাবে। লণ্ঠনের একটুখানি আলো বাঁকা হয়ে মা'র মুখের ওপর পড়েছে। জোর করে বন্ধ রাখা চোখ খুলে ছবি দেখে মা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। একটা নিঃশ্বাস এখন আর শব্দ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না—ফিস্‌ফিস্ করে বলছে: ছবু, সোনা! তুই আমার একটামাত্র মেয়ে, তাও একটু ভালবাসতে দেয় না কেউ—।

আধ ঘুমের মধ্যে ছবি বুঝতে পারে মা তার পিঠে, গালে, চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

অভিমান কাকে বলে ছবি তা জানে না, ব্যথা লাগলেও সে বোধটা তার বেশিক্ষণ থাকে না। এখন মমতার আদরে তার ঘুম পায়। ভেঙে

যাওয়া ঘুমটাই আবার তার চোখে ভাল করে আসন পাতে। আরও নিবিড় করে মাকে জড়িয়ে ধরে, অনায়াসে মমতার গায়ের ওপর একখানা পা তুলে দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়ে। ভাবী শান্ত তার ঘুমনোর ভঙ্গিতে আর মগ্ন চৈতন্যের পাশে পাশে একটা কথা ভেসে ভেসে বেড়ায়—মা, আমার মা !—সেই মনে মনে বলা কথাটাই তাকে যেন একেবারে নিশ্চিন্ত করে দেয়।

কেবল মমতার চোখেই সহজে ঘুম আসতে চায় না।

পাঁচ



বিয়ে! বিন্তি পিসির নাকি বিয়ে হবে। দশবারের বার যে শেষবার ; বর নিজেই এসে দেখে পছন্দ করে গেছে।

বিয়ে হবে তাদের বাড়িতে এটা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। কলাগাছ পোঁতা হবে, ইস্কতিকার সানাই বাজাবে গাল ফুলিয়ে। আলো জ্বলবে। লোকজন, খাওয়া-দাওয়া। আর ভাল জামা-কাপড় পরে তারা ঘুরে বেড়াবে। উঃ কি যে মজা! এত মজা যে ভেবে শেষ করা যায় না।

কিন্তু আজ সকালে যে ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেছে ছবি, তারপর থেকে মনটাই খারাপ হয়ে গেছে তার।

সে দেখেছে ভাঁড়ার ঘরের সামনে দিয়ে বাবা পায়চারী করে বেড়াতে বেড়াতে চাপা গলায় বলছেন : টাকা দিতে পারবে? বল তো নাকচ করে দিই। এর চেয়ে ভাল আর কি আশা কর তুমি? আগেই বা বলে দিলে না কেন? কালো মুখ্যু মেয়ে, সে খেয়ালটাও রেখো।

ঠাকুমা পাতা বঁটিখানার ওপর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বসেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে এবার কথা বললে ছবি বুঝতে পারে ঠাকুমা কাঁদছিল এতক্ষণ : অমন করে বলিসনে কুলদা। কুচ্ছিৎ মেয়ে, মুখ্যু মেয়ে তাতো জানি। তাই বলে কি একেবারে তিন ছেলের বাপকে ধরে আনলি। কিছুই না হয় না থাকতো, বয়সটাও একটু কম যদি হোত।

ঠাকুমার কথা শেষ হবার আগে পেছন থেকে ঠাকুরদা বলে ওঠেন : ও নিয়ে কান্নাকাটি করলে কি ফল হবে কিছু? হবে? কথা যখন দেওয়া হয়েছে, পয়সাকড়ি যখন দিতে পারব না তখন এ পাত্র হাতছাড়া করা হবে না।

গোলমাল শুনে মাও এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠাকুমা এবার একেবারে হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠেন : তাহলে বিন্তিকে তোমরা ওই দোজবরের হাতেই দেবে?

: তারিখ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে, এখন তো বললে চলবে না—; গম্ভীর গলায় কথা কটা বলে ঠাকুরদা চলে গেলেন সেখান থেকে। বাবা চুপ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলেন।

মা একবার ঘোমটার ফাঁকে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন ভুরু কুঁচকে, তারপর এগিয়ে গিয়ে পাতা বঁটিখানা কাত করে দিয়ে বললেন: উঠে আসুন মা। কাঁদবেন না। বিস্তিটার কপাল!

ঠাকুমার তুই গাল বেয়ে জলের ধারা নামছে। সেদিকে তাকিয়ে ছবি একেবারে অবাক হয়ে যায়। ঠাকুমা তো বকে সবাইকে—তাকে, সেফুকে, মাকে—কাকীমা থেকে শুরু করে চাকর-বাকর সবাইকে। এখনও পিঠ কুঁজো করে সারা বাড়িময় কাজ করে বেড়ায়। সেই ঠাকুমাও আবার কাঁদে!

প্রদীপ বুঝিয়ে বলে: আহা, কাঁদবে না কেন—ঠিক মাঝখানটায় যে বসেছিল ও-ই তো বর।

: যাঃ,—কিছুতেই বিশ্বাস হয় না তার: ওমা! ও তো বিচ্ছিরি, কালো, মোটা, অনেক চুল পাকা! ও কক্ষনো পিশেমশাই হবে না আমাদের!

: চল মাকে জিজ্ঞেস করবি,—প্রদীপ প্রমাণ দিতে চায়: সেই জন্যেই তো কাঁদে ঠাকমা। বুঝিস্‌নে?

শেষে সেফুর কাছে আরও খবর জানা যায়, লোকটার আগের বউ মরে গেছে, তুটো ছোট ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের দেখাশোনা করার কেউ নেই। বিস্তি পিসিকে তাইতো বিয়ে করবে।

বর খারাপ কি ভাল তা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামানো যায় না। নিজেদের বাড়িতে একটা বিয়ে হবে, এটাই আসল কথা, মজার কথা!

কিন্তু বিস্তি পিসির কাণ্ডটা ছাখ একবার! এখনও ঠিক ঠাকুমার ঘরের বারান্দায় একগোছা পান নিয়ে সাজতে বসে, সারা বাড়ির লণ্ঠনগুলো পরিষ্কার করে তেল ভরে রাখে। যার বিয়ে হবে তাকে বুঝি এইসব করতে হয়? কেউ বিস্তি পিসিকে বলে দেয় না, বারণ করে না কেন? ছবি ভেবে ভেবে কিছুতেই কূল পায় না! আর নয়তো, কেউ বোধহয় পিসিকে বিয়ের কথাটাই বলেনি। তাই। সবাই যেন কেমন?

কিন্তু বিন্তি পিসির বিয়ের মজাটাই শেষ নয়! আরও একটা মজা আছে— বড় পিসিমা আসছে!

অনেক দূরে থাকে পিসিমা। কতদিন পরে আসছে? সে আঙুলে না গুণে বলা যায় না। সে যখন তিন বছরের তখন এসেছিল। আর আসেনি। এবার আবার আসছে। ঠাকুমাকে একটু খুশি দেখা যাচ্ছে খবরটা পাবার পর থেকে :

অনেক দূরে-থাকা পিসিমা! কতদূর সে জায়গা? ভাবতে গেলেই ছেলে-মেয়েদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইঞ্জিন, রেলগাড়ি, লাল-নীল-সবুজ নিশান।

অনেকে এর মধ্যে কোনও দিন গ্রামের বাইরেই যায়নি। গ্রামের স্টেশনটাও অনেকের দেখা নেই। মণিদার যদি বা থাকে, ছবির নেই। কেবল গল্প, কেবল শোনা কথার রোমন্থন।

: বড় পিসিমা কেমন দেখতে না?

বিন্তির চেয়ে ভাল, দেখতেই তো পাবি।

কেবল দেখতে ভাল নয়, বড়লোকও। অনেক নাকি টাকা আছে পিসেমশাইয়ের।

কিন্তু সেফু শুনেছে অন্য কথা। ছেলে নেই, মেয়ে নেই, কেউ নেই পিসিমার। পিসেমশাইও নাকি দেখতে পারে না তাকে।

যাঃ যাঃ। ছবি সে সব কথায় কানই দেয় না।

অনেক দূরে-থাকা, অনেক দিন পরে-আসা, সুন্দর দেখতে পিসিমাকে নিয়ে সে এক কল্পনার জগৎ তৈরি করেছে কদিন ধরে। সেখানে কারো কোনও কথা ঢুকতে দেয় না সে।

মুখ বার করে জায়গাটা দেখে নিয়ে আগে আগে আসা পাল্কীখানা থেকে সুকুমারী হঠাৎ নেমে পড়ে বোসপুকুরটার কাছে। আশা, হাসি-কান্না মেশানো অদ্ভুত এক ভাব হয়েছে তার মনে, আনন্দে চোখে প্রায় জল এসে গেছে।

: ওমা, জামগাছটা এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে দেখ! হরুদার দোকানটাও আছে? কী কাণ্ড!

ছোট মেয়ের মতো। হাসি হাসি মুখ নিয়ে এগোতে থাকে সে। ছেলে-মেয়েরা খবর পেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটতে ছুটতে এসেছিল। প্রদীপ আর পল্টু চিনতে পেরে দুটো হাত ধরে থাকে তার। ছোটরা যারা আন্দাজে বোঝে তারাও চেনা মানুষের মতো গা ঘেঁসে চলে! ছবিও ছিল সে দলে!

কুলির মাথায় দুটো তিনটে বড় বড় বাক্স আসছে। পেছনের পাল্কীটায় আসছেন পিসেমশাই।

চলতে চলতে সুকুমারী ওদের সবাইয়ের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে হাসে: কত বড় হয়ে গেছিসরে তোরা? মা কেমন আছে রে? বাবা? বড়দা? বৌদি?

তারপর হঠাৎ ছবির দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বলে: প্রদীপ! এটা তোর বোন নারে?

প্রদীপের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তার হাতখানা ধরেছে পিসিমা। ফর্সা মোটা মোটা আঙুল! গরম আর ঘামে ভেজা!

ছবির হাত সে হাতের মধ্যে কাঁপে। হাত ছাড়িয়ে হঠাৎ ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে তার।

বোসপুকুরের মেয়েদের ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে পিসিমা সবাইকে ডেকে ডেকে কথা বলছে: ও রাঙা ঠাকমা, দেখুন, চিনতে পারছেন? আমি সুকুমারী। ও খুড়ীমা, কেমন আছেন? বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন আপনি! ছেলেরা খোঁজ-খবর নেয় তো?

যাকে দেখে সুকুমারী, তার সঙ্গেই একবার ইচ্ছে করে কথা বলে নেয়। সবাই পেছন ফিরে দেখে, আলোচনা করে। সুকুমারী যেন ঘোষণা করতে করতে চলেছে তার আসার কথা—সবাই দেখুক, সবাই শুনুক।

পিসিমার খুব আনন্দ হচ্ছে এটা ছবি বুঝতে পারে। রাতজাগা ক্লান্ত চোখ, গাড়ির কাপড়-চোপড়, চুলগুলো উস্কোখুস্কো হয়ে উড়ছে, তবু পিসিমার আনন্দ। সব কিছু জিজ্ঞেস করছে, সব তাতে হেসে উঠছে। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে।

সে এমন মানুষ দেখেনি! এত যে কথা বলছে, হাসছে কিন্তু যেই সে হাত ছাড়িয়ে চলে যাবার মতলব করছে তখনই কেমন করে যেন বুঝে ফেলছে, ওমনি শক্ত করে তার হাত চেপে ধরছে ঘামে ভেজা হাতে।

শুধু নিজের বাড়ির ছেলে-মেয়েরাই নয়, পাড়া থেকেও চেনা-অচেনা একদল ছেলে-মেয়ে সুকুমারীর পেছন পেছন চলেছে। কে সে তা ওরা জানেও না, তবু চলেছে। যেন আনন্দটা ওদেরও।

বৈঠকখানার উঠোন পেরিয়ে, মণ্ডপের বারান্দা পর্যন্ত এসে পিসিমা হঠাৎ দাঁড়ায়। উপুড় হয়ে সিঁড়ির গোড়ায় প্রণাম করে ছবির হাত ছেড়ে দিয়ে। সিঁথির সামনের দিকটায় মাথা তোলবার পরও খানিকটা মাটি আর টুকরো টুকরো ঘাস লেগে থাকে! সিঁড়ির পাশের কল্কেগাছটার তলায় যে কটা ফুল পড়েছিল সব তুলে নেয় পিসি—যেন ছেলেমানুষ! তারপরই হঠাৎ সব ভুলে ছুট দেয় প্রায় মণ্ডপের মধ্যে দিয়ে!

সদর দরজাটার কাছে ঠাকুমা দাঁড়িয়েছিলেন, মা, কাকীমা, নতুন দিদিমা।

ঠাকুমা আজ মস্ত ঘোমটা টেনেছে নতুন বউয়ের মতো। ঘোমটার মধ্যে থেকে বলে: তুই একা এলি? জামাই?

সবাইকে প্রণাম করতে করতে পিসি বলে: আমার গ্রাম, আমার দেশ! একা আসব না তো কি সঙ্গে লোক নিয়ে দরজার কাছে পাল্কী থেকে নামব? জামাই তোমাদের শহুরে মানুষ, সে আসছে পাল্কী চড়ে।

সবায়ের পেছনে ছবি। কাজেই মার বলা কথাটা সে স্পষ্ট শুনতে পায়—পিসিমাকে মা বলে: হ্যাঁরে, এখন আর তেমন নেই তো? বেশ ভাব-সাব আছে?

: ভাব!—কথাটা বলে পিসিমা কেন চুপ করে গেল কে জানে? মার কথাটার কোন উত্তর দিল না। কেবল বাড়ির মধ্যে ঢুকে কী হাসি!

কাকীমার পেটের ওপর হাত বুলিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলে: আবার?

চিৎকার করে পিসি সস্তপিসিকে ডাকে: ওরে ও বিস্তি! বিয়ে হবে বলে কি ঘর থেকে বেরুবিনে পোড়ারমুখী?

পিসির সেই ঘরফাটানো হাসি তার রাতজাগা শুকনো চেহারায় যেন মানায় না। এতক্ষণ পরে ছবি ছুটে পালায়। সিঁড়ির ওপরকার টিনের ঘরখানার একপাশে ফেলে রাখা আবর্জনার মধ্যে বসে থাকে চুপ করে। ভাবতে চেষ্টা করে। কেমন এক অদ্ভুত, আশ্চর্য মানুষ এই

পিসিমা। ঠিক ধরা যাচ্ছে না, ঠিক ছোঁওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ছবির কেমন অস্বাভাবিক লাগছে সব কিছু। মনে হচ্ছে, অত জোরে ইচ্ছে করে কেউ হাসে না। কাউকে সে এমন দেখেনি আজ পর্যন্ত। সবই যেন অদ্ভুত, সবই নতুন। তার হাতখানাই বা অত জোরে চেপে ধরেছিল কেন পিসি?

প্রদীপ খুঁজতে খুঁজতে এসেছে। পেছন থেকে ঝাঁকুনি দেয় সে ছবিকে: এই, পালিয়ে এলি যে বড়? পিসিমা যে ডাকছে তোকে? কত জিনিস এনেছে ভাই. দেখবি চল: হাত ধরে টানতে টানতে প্রদীপ তাকে নিয়ে যায়।

ঠাকুমা বলছেন: তোর যত কাজ সুরু! কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধো, তা না। আগেই সব দিতে বসলি। জিনিসপত্র তো পালিয়ে যাচ্ছে না—।

মাও সেই কথা বললেন, কিন্তু পিসিমা কেবল হাসে।

অজস্র জিনিসপত্র সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে—পিসিমা বসে আছে আর দিচ্ছে সবাইকে। কে যেন পেছন থেকে বলে: জামাই আসছে—। ওমনি ঠাকুমা আবার ঘোমটাটা টেনে লম্বা করে। পড়ি কি মরি করে ছোটেন।

ছবি দেখে পিসির মুখ। হাসি হাসি মুখখানা পিসির কেমন হয়ে গেছে—কেমন অন্যমনস্ক হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে পিসি! তারপরই আবার যে কে সেই।

হাতভরা লজেন্স, একটা বড় পুতুল বাড়িয়ে ধরেছে পিসি তার দিকে। আর পিসির পাশে ওই যে রঙচঙে ছবি আঁকা বইগুলো পড়ে আছে, ওগুলো বুঝি ছবি পাবে না! সে হাত বাড়ায় না, এগিয়েও যায় না। মনতার আঁচলের কোণ চেপে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

: নিচ্ছিস নে যে? আর কি চাস তুই? কি নিবি?—অবাক গলায় সুকুমারী বলে: দিলে নিতে হয় রে।

ছবি আঙুল বাড়িয়ে বইগুলো দেখায়। বাতাসে পাতা উড়ে গিয়ে ভেতরকার ছবিগুলো তাকে আকর্ষণ করছে। কি আছে ওতে? গল্প? তার যে একটাও গল্পের বই নেই।

: ওমা, ওই বই নিবি তুই? ও যে পল্টু আর প্রদীপের জন্যে এনেছিলাম! পড়তে পারিস বুঝি? নে, তবে তুই-ই নে।

সব বইগুলোই পিসি ছবির হাতে তুলে দিয়েছে! শুধু লজেন্স আর পুতুল ভাল না, শুধু বইও ভাল না, সবগুলো একসঙ্গে পেয়ে ভাল লাগছে। সেগুলো দু'হাতে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে তাড়াতাড়ি ওপরে রাখতে যায় ছবি, তার টিনের বাক্সে। উমা, বাসন্তী, দুর্গা সবাইকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করছে তার—কারোর নেই এরকম।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবার মুখে বড় কাকার ঘর। তার দরজায় ছেলে-মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সেও পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখবার চেষ্টা করে।

সেফু ফিস্‌ফিস্ করে বলে : পিসেমশাই।

ঠাকুমা লম্বা ঘোমটা টেনে সামনে পাখা নিয়ে বসে আছেন। দাদু, বাবা, বড়কা সামনে বসে। সবচেয়ে ভাল ফুলকাটা থালার চারপাশে বাটি সাজানো। পিসেমশাই খাচ্ছেন। খুব গম্ভীর মুখ আর কেমন নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর!

পিসিমার সেই হাসি হাসি মুখখানার পাশে ওমনি একখানা মুখ কল্পনা করতে গিয়ে হঠাৎ ছবির কেমন কষ্ট হয়। সে পালায় সেখান থেকে।

পাঠশালার ছুটি নিয়ে ভাত খেতে এসে রান্নাঘরে অন্যদিনের মতো মাকে না পেয়ে আজ ওপরে উঠে এসেছে ছবি।

ঢোকবার আগেই বাইরে থেকে কানে আসে কান্না-ভেজা গলার স্বর। ঘরে চৌকির ওপর মা বসে আছে দরজার দিকে পেছন ফিরে আর পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কে? নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারা যায় না—সুকুমারী পিসিমা কাঁদছে! হাসি-খুশি পিসিমাও আবার কাঁদে, কাঁদতে জানে!

খুব চাপা গলায় মা বলেন কাঁধের ওপর হাত রেখে : কাঁদিসনে ভাই, চুপ কর। কি করবি? সবই কপাল!

ভেজা দুই চোখ পিসিমার। আঁচলে ঘষে ঘষে চোখের জল মুছে ফেলতে চায় আর বলে : কপাল কপাল কর তোমরা, হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া কি আমার কপালে ছিল না? শুধু শাড়ি, শুধু গয়নায়

যদি মেয়েমানুষের সাধ মিটতো, বৌদি? জান, এই দশবছর ও আমার পাশে শুয়ে ভেবেছে সেই মেয়েটাকে। হাড়জ্বালানী পোড়াকপালী একটা বিধবা নার্সকে।

মা বলে: সে কিরে? অন্য মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিল নাকি ওর?

: ছিল বিয়ের আগে। মেয়েটাকে ও বিয়ে করতে চেয়েছিল, বিধবা বলে মেয়েটাই নাকি রাজী হয়নি। এতদিন চিঠি-পত্র লেখালেখি চলত। সে চিঠি আমি লুকিয়ে পড়েছিও। ছিল দূরে দূরে, একরকম ছিল, আজ মাস কয়েক হোল আবার মেয়েটা ওখানকারই হাসপাতালে চাকরী নিয়ে এসেছে। আজকাল ও ফেরে অনেক রাতে। আগে বাড়িতে মদ খেত। এখন অনেক রাতে বাইরে থেকেই মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে যখন—আমি আর ঘরে ঢুকতে দিই নে কিন্তু আমার বুক ফেটে যায়।

ছবি বোঝে মাও কাঁদছে: ছিঃ ছিঃ, বানরের গলায় মুক্তোর মালা ঝুলিয়ে দিল সবাই মিলে। একটু দেখল না শুনল না?

পিসিমা বলে: মানুষটা কিন্তু ভাল, বৌদি; পাজী কি গোঁয়ার-টোয়ার নয়। কখনও কড়া কথা বলে না; না চাইতেই সব দেয়। কোনও অভাব রাখেনি, যা ইচ্ছে হয় তাই মেটায় কিন্তু তাতে কি? আসলেই যে ফাঁকী আমার! একটা ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত নেই আমার—কি দিয়ে ওকে বাঁধব বৌদি

মা গম্ভীর হয়ে বলে: ডাক্তার দেখিয়েছিলি?

: দেখিয়েছি। তারা বলে ছেলে-মেয়ের মুখ আমি নাকি কোনও দিন দেখব না!

: মিথ্যে কথা—মার গলার স্বরটা কেমন শক্ত হয়ে উঠেছে: চিরকাল সেই কথাই শুনে এলাম। অবিনাশ নিজেকে যেন একবার দেখায়। আমার তো মনে হয় দোষটা তোর নয়, ওর।

পিসিমা বুঝি আবার কাঁদছে, কান্না আটকানো গলায় বলছে: আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে হয় না, বৌদি। কি হবে বেঁচে থেকে?

: ছিঃ, ও কথা ভাবতে নেই, দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর মতো মেয়েকে একদিন ঠিক বুঝবে অবিনাশ।

বাইরের কড়া রোদে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে ছবি! বড়দের

যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা। কেবল ফিস্‌ফিস্, চোখের জল—কিছু বোঝা যায় না। সে ডাকে : মা!

মমতা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়িয়ে হাসেন লজ্জিত হয়ে : ওমা! আজ যে এত তাড়াতাড়ি এলি বড়?

: তাড়াতাড়ি কোথায়? রোদ্দুর ছাখ না তুমি।

সুকুমারী হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নেয়। এবার আর সে-হাত ছাড়িয়ে পালাতে ইচ্ছে করে না। ভাল লাগে চোখের জল মুছতে গিয়ে কপালের সিঁদুরে মাখামাখি হয়ে যাওয়া মুখখানার দিকে, জলে ভেজা বড় বড় চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে। কোলের মধ্যে আড় হয়ে সে পিসিকে দেখে।

সুকুমারী তার চুলের গোছা চোখের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে বলে : ওকে পাঠশালায় পড়াচ্ছো এখনও? যা বাড়ি!

নিস্তেজ ম্লান গলায় মা বলে : ঐ পাঠশালা পর্যন্তই। তাই কি আমাকে কম কথা শুনতে হয়. ন'দশ বছর বয়েস তো হোল! আরও তিনটে মেয়ে পড়ে তাই রেখেছি, ওরা ছাড়লে ওকেও ছাড়াতে হবে। তারপর ওর কপাল! পড়াশোনায় খারাপ না, মাঝে মাঝে কালী তো এসে বলে যায়। আমি ভাবি, ভাল হলেই বা কি? ওই পর্যন্তই। আর তো হবে না।

পিসি ছবির মাথার ওপর আলতোভাবে হাত বোলায় আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে কি যেন ভাবে খানিক। পিসির চোখ দুটো ঝকঝক করে। শেষে একসময় মাথা তুলে বলে : ওকে আমায় দেবে, বৌদি?

শুনে মমতা প্রথমটায় চমকে ওঠেন, ছবিকে নিজের কাছে টেনে নেন। নিজের গায়ের সঙ্গে যেন সাপটে রাখতে চান, বিবর্ণ ভীতু ভীতু গলায় বলেন : কি বলছিস, সুকু?

: হ্যাঁ, যদি একটা মেয়ে বলে তোমার আপত্তি না থাকে।

: কিন্তু অবিনাশ? তুই বললেই হবে কেন?—বাধা দেবার মতো অন্তত একটা অজুহাত পেয়ে মা বেঁচে গেছেন।

: সে ভার আমার। দিলে মন ঠিক করে দিতে হবে কিন্তু, অন্তত একটা পাস না করিয়ে ওকে এখানে পাঠাব না। ইচ্ছে করলেই কাছে পাবে না মেয়েকে।

: সে যে অনেক দিন রে। আর অতদূর!

মার মুখটা হঠাৎ যেন দুঃখে এঁকেবেঁকে যায়: ইচ্ছে করে তো লেখাপড়া শেখাতে, মনে তো কত ইচ্ছেই থাকে! তা তুই যদি পারিস। কিন্তু অতদিন—, আর কথা বলতে পারছে না মা, ভারী হয়ে গেছে স্বর।

পিসিমা কিন্তু আর একটা কথাও বলে না, যেন রায় দিয়ে বসে আছে। যা বলেছে তার আর নড়চড় হবে না। ঠিক সেদিনকার সকালে দেখা ঠাকুদ্দার মতো।

এতক্ষণ পরে অনেক দুর্বোধ্য কথা শোনার পর, এইবারকার কথাগুলোর মানে বুঝতে পেরেছে ছবি। সে মাকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে ফেলে ফুঁপিয়ে। আঁচলে মুখ লুকিয়ে সজোরে মাথা নেড়ে জানায়: আমি যাব না, মা। পাঠিয়ে দিলেও যাব না।

মা হাত ধরে খেতে নিয়ে গেলে ভাতের প্রথম দুটো একটা গ্রাস মুখে তোলে স্বাভাবিক ভাবে, তৃতীয় গ্রাসটা মুখে নিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকায় স্থির দৃষ্টিতে।

মা বলেন: খাও, পাঠশালায় যেতে হবে না?

মুখভরা ভাত নিয়েই ছবি হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে আবার: আমি যাব না, মা।

মমতার চোখও ছলছলে হয়ে উঠেছে। মেয়ের মাথায় বাঁ-হাতখানা রেখে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলতে থাকেন: এখনই তো যাচ্ছ না। কাঁদবার কি আছে? পিসিমার সঙ্গে যেতে পারলে তোমার ভাগ্যি জেনো। নইলে কপাল হবে পাথর চাপা! বিন্তির মতো তখন পান সাজবে, লণ্ঠন মুছবে আর সবায়ের গলগ্রহ হয়ে থাকবে। বল, হবে সে রকম?

সজোরে মাথা নেড়ে ছবি জানায়: না।

: এখানে ইস্কুল আছে, সেখানে তো তোমার পড়া হবে না। তোমার ভাইয়েরাই কেবল লেখাপড়া শিখবে। কিন্তু পিসিমার ওখানে ইস্কুলে তুমি পড়বে, পাস করবে। তারপর কলেজে যাবে। বড়কার মতো অধীরকার মতো লেখা-পড়া শিখবে।

ছবি খানিক ভাবে, তারপর মায়ের আঁচলে মুখ ঢেকে ধরা গলায় বলে: কিন্তু তোমার যে মন কেমন করবে? তুমি যে বল, আমি একমাত্র মেয়ে তোমার—?

কথা শেষ হবার আগেই মমতা হঠাৎ হেসে ফেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই দু'চোখে ফুটে ওঠে গভীর বিষণ্ণতা : বলিই তো। তুই তো একটাই আমার, তাই তো তোকে নিয়ে আমার কত ইচ্ছে। আমার ইচ্ছে যদি পূরণ হয় তবে কষ্ট চেপেও আমি থাকতে পারবো।

ছবির চোখ দিয়ে জল গড়ায়, বাঁ-হাতের তালুতে তা মুছে ফেলে শান্ত হয়ে আবার গ্রাস মুখে তুলে মাথা নেড়ে সে আবার বলে : আমি যাব, মা, পিসিমার সঙ্গে। আর কাঁদব না।

কাঁদব না বলতে গিয়েও আবার কাঁদে। মমতাও কাঁদেন। মেয়ের মুখে আসা চুল সরিয়ে দিতে গিয়ে মাথা নীচু করলে দু'ফোঁটা জল ঝরে পড়ে ছবির কপালের ওপর। তার মুখখানা তুলে ধরে হাসি-কান্না মিশ্রিত মুখে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন : তুই আমার বড় আশার জিনিসরে, ছবু—এঁটো মুখখানাই চেপে ধরেন বুকের মধ্যে।

কেউ নেই আশে-পাশে। ভারী নির্জন, জলে ধোওয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এই রান্নাঘরের বারান্দাটা !

ছয়



বিন্তি পিসির আজ বিয়ে। কে যেন ঠেলে ঠেলে ছবিকে তুলেছে: ওরে ওঠ্‌, ওঠ্‌, দধিমঙ্গল হবে, ঘাটে যাবিনে?

সে উঠে গ্যাখে উঠোনটা ভরা লোক। রায়বাড়ির দিদিমা এসেছে, এপাড়া, ওপাড়া থেকে আরও কারা এসেছে। ছেলে-মেয়েরা সব উঠে এসেছে, চার-পাঁচটা লণ্ঠনের আলো উঠোনটায় পড়েছে।

গোলমালে, মেয়েদের কথায় মাঝ্‌-রাত্তিরটাকে যেন আর রাত্তির বলেই মনে হচ্ছে না।

বিন্তি পিসির কপালে ঠক্‌ ঠক্‌ করে দুখানা কুলো ছোঁওয়ানো হোল: রায়বাড়ির দিদিমা আর অধীরকার মা—নতুন দিদিমা দুটো জল ভরা হাঁড়ি মাথায় করে উঠে দাঁড়াতেই ধ্বজাধারীর ছেলের কাঁসর বেজে উঠলো ট্যাং ট্যাং করে। মেয়েরা ঝাঁকে ঝাঁকে উলু দিতে দিতে চলেছে আর ছেলে-মেয়েরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হুড়মুড় করে তাদের পেছনে পেছনে। শাঁখ বাজছে ঘন ঘন, উলু পড়ছে, সবাইয়ের আগে ঢাকী ধ্বজাধারীর ছেলের একটানা কাঁসরের শব্দ—ট্যাং, ট্যাং, ট্যাং, ট্যাং।

সমস্ত দলটা গিয়ে থামলো পুকুর পাড়ে। হাঁড়ি ভরে জল নিয়ে দিদিমা উঠে দাঁড়াতেই আবার শাঁখ, আবার উলু।

কাকীমাও এসেছে। মার পাশে পাশে চলতে চলতে বলে: ও দিদি! ওই দেখুন! ফর্সা হয়ে এল যে, মেয়ে খাবে কখন?

মা বলে: ফর্সা আবার কই রে? এই গ্যাখ, গায়ের লোম দেখা যাচ্ছে না এখনও। আহা যে না বিয়ে, দোজবরে বর! তার আবার অত বাছবিচার!

ঘরের এক কোণে যেখানে সাজানো দুখানা কুলো পাশাপাশি, তারই পাশে হাঁড়ি দুটোকে রাখা হয়েছে। কে যেন মস্ত এক থালা ভর্তি ভাত এনেছে, মাছ ভাজা একগাদা, একবাটি দই।

বিন্তি পিসির হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে রায়বাড়ির দিদিমা রসিকতা করেন : খালো খা, সারাদিনের মধ্যে আর তো খেতে পাবিনে সেই চাঁদমুখ না দেখা পর্যন্ত।

কিন্তু সে রসিকতায় কেউ হাসে না, সবাই কেমন গম্ভীর হয়ে আছে। বিন্তি পিসি একবার চোখ তুলে তাকায় ঠাকুমার দিকে। ঠাকুমা কাছে সরে এসে পিঠের ওপর হাত রেখে মৃদু গলায় বলেন : খা-মা, যা পারিস দুটো মুখে দে।

পিসি প্রথম গ্রাসটা মুখে তুলতে গিয়ে বিষম খায়—কে যেন মৃদু কণ্ঠে বলে : আহা, আস্তে আস্তে খা মা—ষাট্, ষাট্!

ছবি সেই মুখখানাকে খুঁজে বার করে, অধীরকার মা নতুন দিদিমা। আস্তে আস্তে কথা বলেন সব সময়, কখনও হাসতে দেখা যায় না তাঁকে। ওঁর মেয়ে, কাকার বোন নতু পিসিমাও আছে। তার বিয়ে হয়েছে, মাথায় সিঁদুর আছে কিন্তু শ্বশুরবাড়ি কখনও যায় না। কেন—তা জানে না সে। নতুন দিদিমা তাকে ঘর থেকে বেশি বেরোতে দেন না, নিজেও মেশেন না বেশি কারুর সঙ্গে। হাসেন না, আর সব দিদিমাদের মতো গল্পও করেন না বসে বসে পা ছড়িয়ে।

পিসি মাছভাজা ভেঙে মুখে দেয়, দই দিয়ে মেখে ঠাকুমা জোর করে খাইয়ে দিলে খায় দু'এক গ্রাস, তারপর মুখ বুঁজে থাকে।

: খাবিনে? খা আর দুটো।

সুকুমারী পিসিমা এবার বিরক্ত হয়ে বলে : কেন জোর করছ বারে বারে মা, এখন কি খেতে পারে মানুষ?

এরপর ছেলে-মেয়েরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে পাতের ওপর। মাছভাজা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, দইমাখা ভাত খেয়ে হাত চাটে।

ছবি খায় না, এমনিতে সে এত ভালবাসে মাছ খেতে, ভাজা পেলে তো কথাই নেই। কিন্তু এখন বিন্তি পিসির ঐ শুকনো কালো মুখের দিকে তাকিয়ে, মাঝরাত্তিরের হঠাৎ-ভাঙা ঘুমে, ঠাকুমার ছলছলে চোখ আর রায়বাড়ির দিদিমাকে কেউ না হাসা সত্ত্বেও রসিকতা করতে

দেখে তার গায়ের মধ্যেটা কেমন করে! সে মুখ ফিরিয়ে থাকে!

সুকুমারী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বোঝার চেষ্টা করে বলে: ছবুটার বোধহয় ঘুম পাচ্ছে। শুবি? আয় এই বিছানায় শুয়ে থাক বিস্তির পাশে!

সে গিয়ে ধুপ করে শুয়ে পড়ে চোখ বুঁজে। বিস্তি পিসিমা হাতখানা আলগোছে দিয়ে আছে তার গায়ের ওপর এটা সে চোখ বুঁজেই টের পায়।

তারপর সকাল হয়। সকাল থেকে বেলা দুপুর। লোকজন, গোলমাল, চেঁচামেচি, ব্যস্ততা! সকালে খানিকক্ষণের জন্যে ইফ্‌তিকারের সানাই বেজেছিল। তখন ছবিও আর সব ছেলে-মেয়ের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মেয়েদের মতো একরাশ কোঁকড়া চুল ইফ্‌তিকারের কাঁধের ওপর ছড়িয়ে থাকে: পুরুষমানুষের আবার অতবড় চুল! খুব মজা লাগে দেখতে, সেই চুল দুলিয়ে, গাল ফুলিয়ে সে যখন সানাই বাজায়। ওর চোখদুটো তখন বড় বড় হয়ে ওঠে, মুখ হয়ে যায় লাল। ছেলে-মেয়েরা চারপাশে ভিড় জমিয়ে তাই দেখে।

ছবির আজ তাও ভাল লাগেনি। খানিকক্ষণ শুনে সে চলে এসেছে ঠাকুমার ঘরে, বিস্তি পিসিমার পাশে গিয়ে চুপ করে একদৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

একবারও কথা বলছে না পিসি, ঠাকুমা একবার এসে ভারী গলায় জিজ্ঞেস করেন: একটু ঘোল খাবি?

: না,—খুব আস্তে আস্তে মাথাটা নেড়ে জানায় পিসি।

ঠাকুমার আজ মুখটা অমন কেন? চোখদুটো কেবলই ছলছল করছে, মাঝে মাঝে হঠাৎ চোখ মুছে নিচ্ছেন আড়ালে দাঁড়িয়ে। সুকুমারী পিসিমার সুন্দর চোখদুটো লাল হয়ে রয়েছে—মাঝে মাঝে এসে ঘুরে দেখে আবার চলে যাচ্ছে। কেবল পিসি নিজে চুপ করে আছে, চোখও মুছছে না, কাঁদছেও না।

খুব জোর গলায় কে যেন হেঁকে ওঠে হঠাৎ: ওরে ধ্বজাধারী ঢোলে কাঠি দে, গায়ে হলুদ হবে যে।

ওমনি ধ্বজাধারীর ঢোল বেজে ওঠে বাইরের উঠোনে, তার ছেলের ট্যাং-টেঙে কাঁসরও।

গোলমাল হৈ-চৈ-এর মধ্যেও সে কখন শুয়ে থাকতে থাকতে গুটনো পাকানো বিছানাটার ওপরই ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুম ভাঙে মা'র ডাকে। মা মাথায় হাত দিয়ে ডাকছে: ও ছবু, ছবু, খাবিনে? সব ছেলে-মেয়েরা খেয়ে নিল, তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি কত? কত বেলা হয়েছে, চল খেয়ে নিবি।

চোখ কচ্‌লে উঠে বসে সে বলে: গায়ে হলুদ দেখবো যে আমি, কখন হবে?

: সে তো কখন হয়ে গেছে রে, তুই ঘুমোচ্ছিলি তখন? ঢোল বাজল সানাই বাজল!

: হয়ে গেছে?

এদিক-ওদিক তাকায় ছবি। ওই তো মেঝের ওপর চুপ করে বসে আছে পিসি! মুখে, কপালে, সামনের খানিকটা চুলে হলুদের ছোপ ছোপ দাগ লেগে আছে তখনও।

কখন উঠে গেল? কখন সব হয়ে গেল? পিসি যেন একটা যন্ত্র! যে যা করাচ্ছে তাই করছে। কেউ হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উঠছে, বসিয়ে দিচ্ছে বসছে।

ওই ঢেঁকিঘরের ঢেঁকিটা যেমন! পা দিয়ে উঠাও উঠবে, আবার নামিয়ে দাও নামবে—আবার........।

হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলে ছবি।

মা তাকে বারান্দার এককোণে পাতা পেতে বসিয়ে দেন, পাতের ওপর দু'তিন খানা ইলিশমাছ ভাজা দিয়ে বলে যান: খাও ভাল ক'রে, মাছ আছে দু'তিন রকম, আস্তে আস্তে খাও।

খেতে ভাল লাগছে না একটুও, অসময়ে ঘুমিয়েই হোক আর যে জন্যেই হোক।

রান্নাঘর থেকে ঠাকুমার কথা শোনা যাচ্ছে, মা'র গলা পাওয়া যাচ্ছে। এখনও রান্নাঘর থেকে বেরুতেই পারছে না কেউ। এখনও

থালা ভরা কোটা মাছ রয়েছে, দুটো উনুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। কাকীমা মাঝে মাঝে বাইরে এসে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যাচ্ছে, মুখখানা আগুনের আঁচে লাল, ধোঁয়া লেগে চোখদুটোও লাল।

কে কাঁদছে রে! মুখের গ্রাসটাকে তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে ছবি উৎকর্ণ হয়ে থাকে। বিয়ে বাড়ির দুপুর বেলার সমস্ত গোলমাল ছাপিয়ে হঠাৎ কার হাউমাউ করা কান্না একবার কেবল সারা বাড়িটায় ছড়িয়ে পড়েই মিলিয়ে গেছে। যেন কেউ হঠাৎ গলা টিপে চুপ করিয়ে দিয়েছে মানুষটাকে।

ঠাকুমা ছুটে এসেছে। এসেছে মা কাকীমা সবাই: কে কাঁদল রে অমন করে? শুভকাজ বাড়িতে, অমন অমঙ্গুলে কান্না কার?

কান্নাটা শোনা গিয়েছিল হরিনন্দনের ঘরের ওদিক থেকে কিন্তু তা থেমে গেছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে প্রদীপ এসে দাঁড়ায় দরজার কাছে: মা, অধীর-কাকার পাঁচ বছরের জেল হয়ে গেছে। চিঠি পেয়ে নতুন দিদিমা কাঁদছে।

খাওয়া রইল মাথায়, এঁটো হাতেই ছবি ছোটে। মমতা বলেন পেছন থেকে: ভাত ফেলে উঠে যাচ্ছ বড়, মারবো কিন্তু ছবু।

ততক্ষণে সে একেবারে হরিনন্দনের বারান্দায়। সেখানে বড় দালানে নতুন দিদিমা মুখের মধ্যে শক্ত করে কাপড় গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে কিন্তু শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে আর অস্ফুট একটা গোঙানীর মতো শব্দ বেরিয়ে আসছে কাপড়ের ফাঁক দিয়ে।

হরিদাদু অস্থির হয়ে পায়চারী করতে করতে কাঁপা কাঁপা গলায় বলছেন: হ্যাঁ, ওই, ওমনি করেই কাঁদবে। ওদের বাড়িতে বিয়ে, ওরা বলবে ইচ্ছে করে অকল্যাণ ডাকছো। খবরদার।

অনেকদিনের বিস্মৃতির পর আবার সেই কাটা ক্ষতে ছুরির খোঁচা খাওয়া ব্যথায় ছবি চমকে ওঠে আজ। এর মধ্যে কত নতুন নতুন ঘটনা ঘটে গেছে। আনন্দে, উত্তেজনায় কাকার কথাটা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। আজ আবার মনে পড়েছে।

তার হাত ধোওয়া হয়নি, মুখ ধোওয়া হয়নি, ভাত খাওয়া শেষ না করেই উঠে এসেছে কিন্তু কান্না আটকানো গেল না। সেও

কাঁদতে থাকে নিঃশব্দে এক কোণে, চুপি চুপি চোরের মতো দাঁড়িয়ে। আজ ভোর থেকেই কে জানে কেন মনটা কেমন ভার হয়েছিল, সে সব না-জানা দুঃখ চোখের জলের ফোঁটা হয়ে গাল বেয়ে নামতে থাকে। এক অনুচ্চারিত ভাষায় তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে থরথর করে।

মা কাকীমা এসে জোর করে নতুন দিদিমা আর লতু পিসিমাকে খেতে না নিয়ে গেলে কতক্ষণ সে কাঁদতো কে জানে। তাকেও নিয়ে গেল, মা'র মেখে দেওয়া দলা খেতে হোল বকুনি শুনতে শুনতে।

ওদিকে বেলা পড়ে আসে। বাইরে থেকে ছেলেরা বাড়ির মধ্যে আসছে, হুড়োহুড়ি করছে। খেয়ে উঠে মা, কাকীমা আবার ঢুকেছে রান্নাঘরে।

ক্রমে পড়ন্ত বেলার ছায়া ছায়া অন্ধকার নামে বাড়িতে। বাইরে উঠোনে ধ্বজাধারী ঢোলে খুব আস্তে আস্তে কাঠি বোলাচ্ছে ছেলেদের আব্দার রাখতে। ট্যাং ট্যাং করে দু'একবার কাঁসর বেজেই আবার থেমে যায়।

পিসিকে এবার দোতলায় ছবিদের ঘরে নিয়ে গিয়ে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে তার ওপর সাদা চাদর পেতে বসিয়ে রাখা হয়েছে। রাত্রে নাকি এই ঘরে আবার বরকেও আনা হবে।

অন্ধকার হয়ে গেছে বলে ঘরের কোণে একটা বড় লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, সাদা চাদরের ওপর তার ছায়াটা বাঁকা হয়ে পড়ে আছে। তার ওপর পিসি বসে, তার মুখখানা দেখাচ্ছে আরও শুকনো, আরও কালো।

নিচের উঠোনটা হঠাৎ আলোয় ভরে উঠেছে। ছুটে গিয়ে কার্নিশের ওপর ঝুঁকে পড়ে ছবি। বড় কাকা একটা হ্যাসাক আলো জ্বালিয়ে উঠোনের কাপড় শুকোবার লম্বা লোহার ডাণ্ডাটার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সারা বাড়িটা এখন আলোয় হাসছে, ভাঙা-চোরা দাঁত বার করা বাড়িটার অন্য রূপ এখন।

এত ভাল লাগে এই আলো জ্বললে। বাড়িতে বিয়ে, পৈতে থাকলে কিংবা দুর্গা পুজোর সময় কেবল এই আলো জ্বালানো হয়।

সমস্ত অন্ধকার কোথায় যে পালিয়ে যায়। তখন নাচতে ইচ্ছে করে, ছুটোছুটি করতে ইচ্ছে করে।

করছেও তাই ছেলে-মেয়েরা। সেফুর গলা উঠেছে সবায়ের ওপরে। ছবিরও ইচ্ছে করে যেতে, কিন্তু বড় পিসিমা থাকতে বলে গেছে যে! •

আজ কত আলো! মস্ত থালার মতো চাঁদও উঠেছে, সাদা ধবধবে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে সারা ছাদময়! দূরের গাছ-পালা-গুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আজ একটুও ভয় করছে না ছাদে থাকতে। অন্যদিন হলে একা একা এ ছাদে ছবি আসতেই পারবে না—একশো টাকা দিলেও না!

ঘর থেকে বিন্তি পিসিমা ডাকে ক্ষীণস্বরে : ছবু।

সে গিয়ে পাশে বসে গায়ে হাত দিয়ে চমকে ওঠে : তোমার গা কি গরম ছোটপিসি? জ্বর হয়েছে তোমার? ঠাকমাকে বলে আসবো?

পিসি তাকে উঠতে দেয় না, বলে : সবাই জানে রে, তুই বসে থাক।

তার একটা হাতের ওপর হাত রেখে পিসি চুপ করে বসে থাকে।

সুকুমারী এসে ঢুকতেই ছবি ছুটি পায়, সে ছুট দেয় নিচে। পাড়ার একটা মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছে সুকুমারী, বলে : দে মা, যেমন-তেমন করে সাজিয়ে দে। চুল-টুল বেশি আঁচড়াস নে, জ্বরও হয়েছে হতভাগীটার। যা না করলে নয় তাই করে দে। দেরি হলে বাবা আবার রাগ করবেন।

উঠোন ভরা আলোয় এ-বাড়ির, ও-বাড়ির একদল ছেলে মিলে হুল্লোড় করে লুকোচুরি খেলছে, কে যেন খুব জোরে ধমকে তাদের হুল্লোড় থামিয়ে দিল। সবাই ছুট দিয়েছে বৈঠকখানার দিকে।

সেফু বড়দের একটা রঙীন শাড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে কলা বউ-এর মতো পরেছে দেখে ছবিরও এতক্ষণে ভাল জামা-কাপড় পরার কথা মনে পড়ে। মমতাকে সে টেনে আনে কাজ থেকে। মা বলে : পরবি তো, সে বাঁদরটাকেও ডেকে আন। সারাদিনের মধ্যে টিকি দেখলাম না।

মণিদাকে ডাকতে বৈঠকখানায় যেতে হবে। তা হোক! আজ আর একটুও ভয় করছে না সদর দরজাটা পেরিয়ে ওই রাস্তাটুকু যেতে। আলো যে সবদিকে—গোলমাল, চেঁচামেচি! ভয় কিসের!

হঠাৎ গোলাঘরের পাশটা থেকে কে যেন ডাকে : ছবি!

সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, বুকের ভেতরটা হঠাৎ প্রথমটায় ধড়ফড় করে উঠেছিল তার! কিন্তু ধ্যেৎ! ও যে মায়াদি!

: অন্ধকারের মধ্যে ওদিকে কোথায় যাচ্ছ মায়াদি?

: যাচ্ছি কি রে, এলাম তো বিন্তিকে দেখতে। ঘাটের পথ দিয়ে এসেছি মামীমাকে না জানিয়ে।

হঠাৎ হাত-পা ঠাণ্ডা-করা, কান্না-পাওয়া সেই কথাটা মনে পড়ে যায়। কি বলবে সে এবার মায়াদিকে? কিছু খবর এলেই মায়াদি তাকে জানাতে বলেছিল যে! সে মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে।

: ছবি!—একবার ডেকে মায়াদি অপেক্ষা করে থাকে একটুখানি সময় : কোনো খবর আসেনি, না রে?

: এসেছে।—তেমনি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কান্নাভরা গলায় ছবি বলে : পাচ বছরের জেল দিয়ে দিয়েছে ওরা।

ভাল করে মুখটা দেখা যায় না তবু অতটুকু মেয়ে ছবিরও কেমন করে যেন মনে হয়, কাঁদছে মায়াদি। নইলে একটাও কথা বলছে না কেন? হঠাৎ পিছন ফিরল কেন তবে?

: বিন্তি পিসিকে দেখবে না মায়াদি? চলে যাচ্ছ?

: না রে—আজ আর যাব না.........। সেই অন্ধকারের মধ্যেই চুপি চুপি আসা ছায়াটা আবার মিলিয়ে যায়—কেউ দেখে না, কেউ জানতেও পারে না!

জামা পরে নিচেও নামতে পারেনি, এর মধ্যেই সারা বাড়িটায় সবাই হুলুস্থুল করে চেঁচিয়ে ওঠে—বর এসেছে, বর এসেছে! পাড়ার মেয়ে-বউরা শাঁখ বাজায়, উলু পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে আর তার সঙ্গে ধ্বজাধারীর ঢোল, ইফতিকারের সানাই বেজে চলেছে একটানা।

বিকেল থেকে পিসির জ্বর। এখন আর মাথা সোজা করে বসতে পারছে না—পিঠের নিচে একটা বালিস দেওয়া। কি করে যে বিয়ে হবে? ছবি ভেবে কুল পায় না।

কিন্তু বিয়ে হয়ে যায়।

ছাদনাতলায় বর এসে বসলে খানিকক্ষণ পরে মেয়ের খোঁজ পড়ে। ঠাকুমা আজ সারাদিন উপোষ করে আছেন, এখন একখানা গরদের কাপড় পরে বসে আছেন বরের সামনের আসনে।

বড়কা, বাবা, নন্দ কাকা আর রায়দের ছোটছেলে এসেছে পিসিকে পিঁড়িতে বসিয়ে তুলে নিয়ে যেতে।

: ওঠ্‌ বিন্তি, বড় পিসিমা আস্তে আস্তে বলে : শক্ত করে বড়দার হাত ধরে থাকিস, তাহলে আর মাথা ঘুরবে না।

বিন্তি পিসির ছলছলে চোখে কেমন অসহায়তার ছাপ। সে করুণ চোখে তাকায় ঠাকুমার মুখের দিকে, মমতার মুখের দিকে, তারপর কাজললতা ধরা হাতখানা দিয়ে মেঝেটা যন আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। হঠাৎ বুকের ভেতরটা কেমন করতে থাকে ছবির, যেমন করতে থাকে পুজোয় বলি দেবার জন্যে অনিচ্ছুক পাঠাটাকে যখন সবাই মিলে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যায়—কিছুতেই যেতে চায় না জন্তুটা, যত দড়ি ধরে টানাটানি কর, তত সে করুণ চোখে তাকায়, কেঁদে কেঁদে ডাকে!

শেষ পর্যন্ত পিসি ওঠে। তাকে সাতপাক ঘোরানো হয়। বরের দিকে তাকায় দুই লাল লাল চোখ তুলে। ছেলে-মেয়েরা অনেকে খুসিতে হাততালি দিয়ে হাসে, মেয়েরা ঝুঁকে পড়ে সেদিকে। পিসি কিন্তু একবারও চোখদুটো সরায় না।

বর্ষিয়সী কে যেন ভিড়ের মধ্যে ফিস্‌-ফিস্‌ করেন : আজকাল আর মেয়েদের লজ্জা-টজ্জা নেই দিদি। দিব্যি প্যাট্‌ প্যাট্‌ করে দেখে নিল।

কথাটা শুনে ছবিও ভাবে—কি দেখলো পিসি অমন করে? দেখতে তো বিচ্ছিরি (বলতে নেই) পিশেমশাই! কালো, মোটা, মাথার চুলগুলো সোজা সোজা।

সুকুমারী পেছন থেকে মেয়েকে দু'হাতে জাপটে ধরে বসে আছে, সেফুকে বলে ফিস্‌ফিস্ করে : শিগ্‌গির তোর জ্যেঠিমাকে ডাক সেফু, একখানা পাখা আন্।

জোরে জোরে মাথায় হাওয়া করে সেফু। পিসির মাথাটা ঝুলে পড়েছে সুকুমারী পিসিমার কাঁধের ওপর। সরে যাওয়া ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চন্দন জেবড়ে যাওয়া কালো শুকনো মুখ আর বোঁজা চোখদুটো দেখা যাচ্ছে।

মমতার আঁচল টেনে ধরে ভিড়ের বাইরে এনে ছবি বলে : পিসি মরে যাচ্ছে, তবু বিয়ে দেবে? দেখছো না কেমন করে রয়েছে পিসি?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে মমতা হাসার চেষ্টা করেন : বোকা নাকি তুই? জ্বর হয়েছে, সারাদিন উপোষ! তাই ঝিমিয়ে পড়েছে অমন। কিছু হয়নি।

—দূর! ভাল না, একটুও ভাল না বিয়ে! বিচ্ছিরি! দেখতে চাইনে আমি……।—ছবি ছুটে চলে যায় কাকীমার ঘরে। পাড়ার বউ-মেয়েদের গোটা দুই তিন ঘুমন্ত ছেলে-মেয়েদের পাশে সেও মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে কাকীমার বিছানায়।

ঢোল বাজে, সানাই বাজে, হারাণ ঠাকুরের উচ্চকণ্ঠের মন্ত্রপড়া কানে যায়। কেমন কান্না পায় তার!

সাত



খুব কেঁদেছে ছবি। কেঁদে কেঁদে চোখদুটোকে ফুলিয়ে ফেলেছে বিন্তি পিসির চলে যাবার সময়। ঠাকুমা, বড় পিসিমার কান্না দেখে সত্যি সত্যি যে সব ছেলে-মেয়েরা কেঁদেছে কিংবা ইচ্ছে করে জামা দিয়ে, হাতের তেলো দিয়ে ঘষে ঘষে চোখ লাল করেছে, নাক টেনেছে বারে বারে। তাদের সবাইয়ের হার হয়েছে ছবির কাছে।

আসলে পিসির চলে যাওয়া দেখে নিজের যাবার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সে অত বেশি কেঁদেছে। তাকেও যে যেতে হবে এই কথাটা এতদিন মনে পড়েনি, আজ মনে পড়ে।

কিন্তু কাঁদলেই তো আর যাওয়া বন্ধ হয় না। আজ সকাল থেকে মমতা যে বারে বারে চোখ মুছছেন, তবু তো যাওয়া বন্ধ হচ্ছে না! তবু তো একবারও বলছেন না: না ছবু, থাকগে, তোর গিয়ে কাজ নেই।

বাবা, ঠাকুমা কেউ প্রথমে রাজী হয়নি মা'র কথায়। সুকুমারী পিসিমা বলেছে কিছুদিন পরে পাঠিয়ে দেবে, তবে মত দিয়েছে। দাদু তো কিছুতেই মত দেয়নি, তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবে বলাতেও না। পিসিমার ওপর রাগ করে আছে কাল থেকে।

তবু পিসিমা নিয়ে যাবেই তাকে। সে তো জানে, মুখে বললেও সহজে তাকে আসতে দেবে না। কাছে রেখে লেখা-পড়া শেখাবে।

বাবা মুখ ভার করে এক এক বার ঘুরে যাচ্ছেন। সেফু, মণ্টু, পণ্টুদা, সবাইয়ের মুখ ভার। সবায়ের কষ্ট হচ্ছে কেবল মণিদাটা কী হিংসুক? সে শক্ত হয়ে বসে আছে সকাল থেকে, কথা বলছে না

তার সঙ্গে একবারও। কেবল এক এক বার ক্ষেপে গিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া করে আসছে : কেন আমি বুঝি যেতে পারতাম না বড়পিসির সঙ্গে! পণ্টু যেতে পারত না, সেফু পারত না? তুমি ওমনি ছবুকে পাঠাচ্ছ, জানিই তো, ছবুই তো তোমার বেশি··· , ঝগড়া করতে করতে আবার কেঁদেও ফেলছে।

তখন বেশ মজা লাগছিল। বাঁধা-ছাদা চলছে। টিফিনক্যারিয়ারে খাবারও ভরে দেওয়া হোল। দুখানা বড় পাল্কি বৈঠকখানার উঠোনে এনে রাখা হয়েছে, বেহারারা তামাক খাচ্ছে। একটা যাওয়ার ব্যস্ততা। কে যাবে? না—ছবি যাবে।

সবাইয়ের কাছে আজ সে আদর পাচ্ছে। কেউ তাকে বকেনি একবারও।

কিন্তু খালি ঘরখানায় যখন আর কেউ নেই, জামা পরিয়ে মা তার চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন, নিচে থেকে বড় কাকার ভারি গলা শোনা যাচ্ছে, তখন ছবির আর ভাল লাগে না। সে এবার মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। নিঃশব্দে কেঁদে কেঁদে মমতার চোখ তো ফুলেই আছে, মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে এবার তিনি শব্দ করে কাঁদেন।

খানিকক্ষণ পরে মা-ই নিজেকে সামলে নেন। নিজের চোখ মোছেন, তার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে কান্নাজড়ানো গলায় বলেন : ভাল হয়ে থেকো কেমন? লেখা-পড়া কোরো মন দিয়ে!

হাত ধরে তাকে নিচে আনেন। সেখানে সুকুমারী পিসিমা কাঁদছে, ঠাকুমা, কাকীমা, সেফু, ছোটরা অনেকে—কেবল মণিদা নেই।

বৈঠকখানার উঠোনে এসে দেখে লতু পিসিমা আর নতুন দিদিমা এসেছে, আরও অনেকে এসেছে ছবিদের যাওয়া দেখতে।

: আর দেরি নয়, ওঠ পাল্কিতে—, কে যেন পেছন থেকে তাড়া দেয়!

মা বলেন : দাদুকে আর বাবাকে প্রণাম করে এসো ছবু। পণ্ডিতমশাইকে এই টাকা দুটো দিয়ে প্রণাম কর। আগে পণ্ডিতমশাইকে।

কালী পণ্ডিত কেমন করে যেন খবর পেয়ে এসেছেন—ছবির মাথার ওপর হাতখানা রেখে তিনি মমতার মুখের দিকে তাকান কিন্তু ঘোমটাটানা মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায় না—কেবল লক্ষ্য করলে ফোলা ফোলা চোখদুটো হয়তো নজরে পড়ে।

বাবা তার পিঠের ওপর হাত রেখে তাকে একেবারে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করেন, কিন্তু সোজাসুজি তার দিকে তাকাচ্ছেন না, মুখটা ফিরিয়ে রেখেছেন।

পিশেমশাই-এর পাল্কিখানা আগে চলে গেল—সেদিকে দু'এক জন এগিয়ে যায়। কিন্তু এ পাল্কিখানাকে কেউ যেন ছাড়তে চায় না। পিসিমা ভেতরে বসে মুখ বার করে আছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিকেও হাত ধরে ভেতরে বসিয়ে দিতে যাবে হঠাৎ দূর থেকে কে যেন ডাকে : ছবু!

ছুটতে ছুটতে প্রদীপ এসেছে। প্যাণ্টের পকেট থেকে সে কাঁপা হাতে একমুঠো কি যেন বার করে তার হাতে দেয়। কি! একমুঠো বেতফল! বলে : খিড়কির ঘাটের গাছগুলোয় হয়েছিল, এখনও পাকেনি ভাল করে, তবু নিয়ে এলাম।

মণিদার চোখ লাল, ঠোঁট কাঁপছে। সে কি শুধু রোদ্দুরের জন্যে না ছুটে আসার জন্যে! এতক্ষণে ছবি স্পষ্ট করে বুঝতে পারে, হিংসে নয়। মণিদার খুব কষ্ট হয়েছে, তাই অমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে সারাটা দিন। চুপি চুপি কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে।

প্রদীপের হাতখানা ধরে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না। মমতার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে : আমি খানিকটা পর্যন্ত মণিদার সঙ্গে হেঁটে যাই মা? তারপরে পাল্কিতে উঠবো?

শ্যামলও এসেছে। দুর্গা, উমা, বাসন্তী সবাই। ছবির শুকনো চোখ আবার জলে ভরে ওঠে।

বাবা শুনতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলেন : চলুক না, আমিও তো যাচ্ছি বোসপুকুর পর্যন্ত। প্রদীপও ফিরে আসবে আমার সঙ্গে।

তবে ছেলে-মেয়েরা সবাই যাবে। সেফুও হঠাৎ চলতে শুরু করে।

কিন্তু কতটুকুই বা পথ! আস্তে হাঁটলেও ফুরিয়ে যায়। প্রদীপ ছবির হাত শক্ত করে চেপে ধরে কেঁদে ফেলে। শ্যামল তার আর

একটা হাত ধরে রেখেছে। পল্টু পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে; মন্টু, সেফু ছলছলে চোখ বারে বারে মুছছে। দুর্গা, উমা, বাসন্তীদের বাড়ি থেকে বেরুনো বারণ—তবু ওরা এসেছে এতদূর। কেমন করে যাবে ছবি! কিন্তু তবু যেতে হয়। পাল্কিওয়ালাদের তাড়ায় ভেতরেও ঢুকতে হয়। মুখ বার করে ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ছবি হাত নাড়ে, চোখ দিয়ে জল পড়ে, চীৎকার করে অনাবশ্যক জোরে: মণিদা, সেফু! মণিদা! শ্যামল, দুগ্‌গা—আ!

ছবু—উ··· !—প্রদীপ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে হাত নাড়ে, চোখের জলে তার সামনের সব কিছু ঝাপসা হয়ে যায়।

এবার ছেলে-মেয়েরা সবাই মিলে হাত নাড়ে আর চেঁচায়: ছবি—! ছবি—ই—ই!

পাল্কির বেহারারা পথের কষ্ট কমাবার জন্যে একসঙ্গে একটানা একটা সুরে চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। দূর থেকে ভেসে আসা শিশুকণ্ঠের শব্দ তাদের সেই মিলিত সুরে ডুবে যায়।

দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ করে ছবি প্রাণপণে তাকিয়ে থাকে। তবু একটু একটু করে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে মণিদারা। এবার আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু খানিক ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্টতা।

আট •



সারা রাস্তা ফুলে ফুলে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে ছবি, অঝোরে। চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে গেছে। কী এক ব্যথায় তার বুকের ভেতরটা গুমরে উঠছে তা সে নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না।

মা'র জন্যে কি তার বেশি কষ্ট হচ্ছে? ঠিক বুঝতে পারে না। তবে কি বাবা? তবে কি মণিদা? তবে কি? তবে কে?

এই তো কদিন আগেও বাড়িতে পল্টু, সেফুদের সঙ্গে বসে কত গল্প করেছে সে—গাড়ি চড়বে সে, ইস্টিমার চড়বে, শহরে যাবে—কত মজা! ওরা তাকে হিংসে করেছে—হিংসে করেছে পাঠশালার বন্ধুরা।

আজ সে আনন্দ কোথায় গেল? তার ইচ্ছে করে পাল্কি থেকে লাফ দিয়ে সে ছুটে পালায়। ওদের সবাইকে ডেকে বলে, তোরা যা ভাই! চাইনে আমি যেতে, চাইনে মজা!

সুকুমারী পিসিমাও কাঁদছে কিন্তু সে কান্না তার মতো অত উদ্দাম নয়। তার যেন ছন্দ আছে, তার মাত্রা আছে।

পিসিমার বড় বড় সুন্দর চোখদুটো লাল হয়েছে, পাকা করমচার রঙের মতো লাল। মাঝে মাঝে আঁচলে চোখ মুছে ফেললেই আবার জল গড়িয়ে পড়ছে।

ছবিরও ইচ্ছে করছে অমন করে থেমে থেমে কাঁদতে, অমন স্থির হয়ে থাকতে। কিন্তু সে পারছে কই? তার বুকের মধ্যে কি যেন একটা কেবলই ওপর দিকে ঠেলে ঠেলে উঠে রাশ রাশ জল দিয়ে তার গাল মুখ ভাসিয়ে দিচ্ছে।

পাল্কিটা হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে মাটিতে নামলো—বেহারারা একটু বিশ্রাম নেবে।

চোখ মুছে ফেলে পরম আগ্রহে ছবি পায়ে চলা সরু রাস্তাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এই পথ দিয়েই তো সোজা হেঁটে গেলে

সে গ্রামে পৌঁছতে পারে! ওই যে স্টেশন থেকে একদল লোক চলেছে গাঁয়ের দিকে। ওরা তাদেরই গাঁয়ের ওপর দিয়ে যাবে—হয়তো বৈঠকখানার ওপর দিয়ে, কিংবা বড়পুকুরের পাড় দিয়ে! হয়তো বাবার সঙ্গে দেখা হবে ওদের—মণিদার সঙ্গেও! কিন্তু কেউ ওরা জানতে পারবে না যে ছবিকে ওরা দেখে গেছে।

আচ্ছা মা কি করছে এখন? নিশ্চয়ই তার কথা মনে করে কাঁদছে। মণিদা? মণিদাও! কেবল বাবার কান্নাটা কেউ বুঝতে পারছে না। বাবাদের মতো বড়রাতো আর জোরে জোরে কাঁদে না;

সকালবেলা রোজ খিড়কিপুকুরে মায়াদি আসবে, রোজ মণিদা যাবে মুখ ধুতে—ডাহুকটা ডাকবে, চ্যালামাছগুলো ঘুরে বেড়াবে, ভাঁটি ফুল ফুটবে—ছবি থাকবে না।

ভোরবেলায় সূর্য উঠবে—ছবি থাকবে না।

পাঠশালায় রোজ উমা, বাসন্তী, দুর্গা আসবে—শ্যামল কদিন মন খারাপ করে ঘুরে বেড়াবে—ছবি থাকবে না।

কোথাও থাকবে না ছবি—কোথ্থাও না!

পাল্কির গায়ে রাস্তার পাশ থেকে ছোটো একটা বুনো গাছ ঝুঁকে পড়েছে। বেহারারা পাল্কিটা আবার কাঁধে তুলে নেবার আগেই সে এবার গাছটা মুঠো করে প্রাণপণে চেপে ধরে আর কাঁদে, কোনো শব্দ হয় না। কেবল অব্যক্ত ভাষায় তার কাঁপা কাঁপা ঠোঁট দুখানা যেন বারে বারে বলে, যাব না, আমি যাব না।

সুকুমারী তার হাতের মুঠোটা আল্গা করে দিতে দিতে ভারী গলায় বলে: ছবি! ওটা ছেড়ে দে। হাত কেটে যাবে।

পাল্কিটা চলতে শুরু করলে আপনা থেকেই হাতের মুঠোটা খুলে যায় টান লেগে কিন্তু সবুজ পাতাগুলোর রস তার হাতে লেগে থাকে তখনও—কেমন বুনো বুনো গন্ধ রসের!

এইবার তারা গাঁয়ের সীমানা পার হয়ে স্টেশনের বাঁধানো রাস্তাটায় পড়েছে। দূরে লম্বা লম্বা থামের মাথায় সরু তার দেখেই ছবি বুঝতে পারে। মোটা সাদা পাথরের গায়ে ইংরেজী অক্ষরের হিসেব—ওগুলো মাইলের চিহ্ন। বড়কার কাছে একদিন গল্প শুনেছে সে।

কান্নাভরা ঝাপসা চোখে সেগুলো যত দেখে তত তার বুকের

ভেতরটা আকুলি-বিকুলি করে, হাত দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে ওই নাম না জানা বুনো গাছের বুনো গন্ধটা তার সারা মুখে মাখামাখি হয়ে যায়।

: ছবি!—গাঢ় গভীর গলায় কে যেন তাকে ডাকছে। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়া চেতনায় সে ডাকটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কে ডাকছে! মা?

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সুকুমারী বলে: ছবি! সোনা! লক্ষ্মী! আর কাঁদিসনে! দেখতো আমি যে কতদিন পরে এসেছিলাম, আর কোনো দিন হয়তো আসতে পাব না, আমি কি অত কেঁদেছি?

অস্থিরতাটা একটু কমে। সে সুকুমারীর বুকে মাথা রেখে চুপ করে থাকে। জল এবার দু'গাল বেয়ে গড়ায়, মাঝে মাঝে তার মুখের মধ্যেও দু'এক ফোঁটা জল ঢুকে যায়—কেমন নোনা তার স্বাদ!

সুকুমারী বলে: এ-বাড়িতে যা কোনো দিন হয়নি তোকে দিয়ে তাই আমি কত খুশি! তোকে অনেক লেখা-পড়া শেখাব।

নিস্তব্ধ হয়েছিল, হঠাৎ এবার ফুঁসে ওঠে ছবি: আমার মা? আমি অতদিন থাকবো নাকি? লেখা-পড়া চাইনে। মাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না!

এতক্ষণ ছিল অনির্দেশ্য একটা ব্যথা, এবার সেটা কেমন আশংকার মতো ছবির হাত-পা ঠাণ্ডা করে দেয়। আতঙ্কিত ফ্যাকাসে মুখে সে কাঁদতেও ভুলে যায়।

পিসিমা তার মাথাটা বুকের মধ্যে আরও নিবিড় করে চেপে ধরেছে ছবি তা বুঝতে পারে। তার বুকের মধ্যে শির শির করে কিন্তু মাথা তুলতে পারে না। তার ভেজা মুখখানায় কোমল হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সুকুমারী বলে: মা'র কাছ থেকে নিয়ে এসেছি বলে তোর খুব দুঃখ তা আমি জানি ছবু। তাই বলে আমাকে কি তুই ভালবাসবিনে?

তার শক্ত করে ঘুরিয়ে রাখা মুখখানা জোর করে তুলে ধরে লাল ভেজা ভেজা চোখে সুকুমারী যেন মিনতি করতে থাকে: আমাকে তুই মা বলে ভাবিস ছবি! আমার কেউ নেই—ছেলে-মেয়ে কেউ না! তুই আমার মেয়ের মতো হয়ে থাকবি—পারবিনে ছবি?—তার দু' চোখের গড়ানো জল এবার ছবির কপালে পড়ে, চুলে ঝরে পড়ে!

এতো লোক দেখানো নয়! তাহলে কি কাঁদে মানুষ? পিসি কি বলতে চায় তাকে! একজনের মেয়ে হয়ে কি আর একজনের মেয়ে হওয়া যায়?

একটু অপেক্ষা করে সুকুমারী আবার বলে: পারবিনে ছবি?

কি পারতে হবে ভাল করে তা বোঝেও না, অন্যমনস্কের মতো মাথা নেড়ে ছবি জানায়, হ্যাঁ—সে পারবে।

তার কপালে চুমু খায় পিসি, তার চোখের ওপর চুমু খায় যেমন করে কাকীমা চুমু খায় তার একবছরের খোকাকে! লজ্জায় আর নতুন অনুভূতিতে ছবি আড়ষ্ট হয়ে থাকে।

মা-তো আদর করে কিন্তু মা-তো চুমু খায় না। কোনও দিন তাকে চুমু খায়নি। মা কারোর সামনে আদর পর্যন্ত করতে লজ্জা পায়।

ছবি কেমন বিহ্বল হয়ে যায়। সমস্ত শরীর তার ক্লান্ত হয়ে গেছে কান্নায় আর ভাবনায়। সে কাঁদতেও পারছে না, ভাবতেও পারছে না আর।

সুকুমারী তার গুটিয়ে থাকা পা দুখানা আর একটু সামনে ছড়িয়ে দেয়—মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মেয়েটার আড়ষ্ট মুঠো করে থাকা হাত এবার শিথিল হয়ে পড়ে পাশে! তার ক্লান্ত চেতনায় নাড়া দিয়ে কে যেন কি বলছে, কে যেন গুন গুন করে কি বলছে—ছবি তার কিছু বুঝছে, কিছু বুঝছে না!

তার বোঁজা চোখের সামনে কখনও এসে দাঁড়াচ্ছে মা—, কিন্তু তুমিই তো আমাকে দিয়ে দিয়েছ পিসিমাকে! চলে যাচ্ছি বেশ হয়েছে!—নিঃশব্দ কান্নায় ঠোঁট তার ফুলে উঠছে।

—মণিদা! মণিদা ভাই, কাঁদিসনে! আবার আমি আসবো দেখিস!

—অধীরকা! আমিও তোমার মতো কত দূরে চলে যাচ্ছি দেখেছ?

মাথাটা বারে বারে ঝুঁকে পড়ছে, হাতখানা কখন একসময় ঝুলে পড়েছে পাল্কির বাইরে—সুকুমারী ঠিক করে দেয় সযত্নে।

তারপর একটা হৈ চৈ করা বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে ছবির স্বপ্নটা ভেঙে যায়। কে যেন কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে তার ঘুম

ভাঙাচ্ছে : এ্যাই ছবি, ওঠ্‌, ওঠ্‌; ছাখ ছাখ, ঘুমোচ্ছে কেমন করে!

বড়কার মুখটা ঝুঁকে পড়েছে তার মাথার ওপর। সবাইয়ের আগে স্টেশনে হেঁটে এসেছে বড়কা। শক্ত করে ছবি বড়কার হাত ধরে থাকে, গাড়িতে ওঠা পর্যন্ত।

গদি দেওয়া বেঞ্চ, গাড়ির ছাদে কি যেন একটা চাকার মতো জিনিস লাগানো আছে। বড়কা বলে, ওটা পাখা। গাড়ি চললেই ওটা ঘুরবে, তখন আর গরম লাগবে না একটুও।

পিশেমশাই কুলিদের দিয়ে মাল তোলাচ্ছেন। পিসিমা বিছানা পেতে রাখছে বেঞ্চে—গদির ওপরেও আবার বিছানা!

অন্ধকার হয়ে এলেও স্টেশনটায় অনেকগুলো আলো জ্বলছে—সব দেখা যাচ্ছে তাতে। দুটো তিনটে নীল-জামা পরা কুলি এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে।

সামনের খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরের বারান্দায় তিন চারজন মেয়ে-মানুষ কতকগুলো পোটলা সামনে নিয়ে বসে আছে বোকার মতো। আর একজন পুরুষমানুষ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বারে বারে কি যেন বলছে কালো কোট পরা লোকটাকে। কে যেন কার নাম ধরে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে। যারা বসে আছে তারা কি যাবে না?

বড়কা বলে : না, ওরা বিনে টিকিটের যাত্রী। ধরে রেখে দিয়েছে।

ছবির কষ্ট হয় ওদের জন্যে, বড়কা বললে ছাড়বে না? পিশেমশাই বললেও না?

টং টং করে কি যেন বেজে উঠল। পিশেমশাই এবার গাড়িতে উঠে পড়েছেন—গাড়ি থেকে কুলিদের পয়সা দিচ্ছেন, পাল্কির বেহারাদের পয়সা দিচ্ছেন। মোটা একটা ব্যাগ! পিশেমশাইয়ের অনেক টাকা! তাহলে ওই লোকগুলোকেও তো কটা টাকা দিতে পারেন—? ওই যারা বিনা টিকিটের যাত্রী!

একটা কালো প্যান্ট পরা লোক মুখের বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে বাঁ হাতে একটা সবুজ নিশান দেখাচ্ছে! এই কথাটা সে কতবার শুনেছে—সবুজ নিশান দেখালে গাড়ী ছাড়ে।

এবার তবে ছাড়বে। ছবির হাত-পা হঠাৎ ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে যায়। সবখানি শক্তি দিয়ে সে প্রাণপণে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে, তবু মনে হয় কি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে, কি যেন সে দেখতে পাচ্ছে না!

এখুনি সে চলে যাবে কোথায়—কত দূরে!

সে পাগলের মতো চীৎকার করে: বড়্কা, শিগগির, শিগগির তুমি এখানে এসো।

সুখদা জানলার ঠিক নিচেই দাঁড়িয়েছিলেন। একটু হাসবার চেষ্টা করে বলেন: আমি তো এখানেই আছি রে। অত ঝুঁকিসনে।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। সুখদা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকেন। পিসিমা, পিশেমশাই সবাই আর এক জানলা দিয়ে মুখ বার করে আছে—পিসিমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কিন্তু ছবি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে আছে। চোখ দুটো ভিজে ভিজে আসছে—তবু চোখ দিয়ে জল পড়ছে না।

সুখদা এবার হাত তুলে ছবির মুখখানা ছুঁয়ে দিয়ে বলেন: কেঁদো না ছবি। গিয়েই সবাইকে চিঠি দিও—কেমন?

ছবি মাথা নাড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগেই গাড়ির গতি বেড়েছে—বড়কার চেহারা আড়াল পড়ে গেছে। এবার ছবির দুগাল বেয়ে যত জল গড়াক না, বড়কা তো আর দেখতে পায়নি!

তারপর গাড়ি চলার তালে তালে কালো অন্ধকার থেকে কত অসংখ্য জোনাকী জ্বলেছে দুপাশের বনে-জঙ্গলে। জ্বলেছে আর নিভেছে—কাছে এগিয়ে এসে আবার দূরে পালিয়ে গেছে। কত ছোটো ছোটো আলোর ফুলকির মতো গাঁ-গুলো, ছোটো-খাটো দুটো একটা স্টেশন শট্ শট্ করে পার হয়ে চলে গেছে। একমনে চোখ পেতে থেকেছে ছবি সেই অন্ধকারে, আর কান পেতে শুনেছে একটা শব্দ। যেন নিঃশব্দ কুসুমপুর গ্রামখানা তখনও পেছন পেছন ছুটে আসছে, বলছে—ছবি আয়, ছবি আয়!

ওই জোনাকী পোকাগুলোতো তাদেরই গাঁয়ের জঙ্গলে থাকে, ওই যে মাঝে মাঝে টিম্ টিমে আলো, সে তো গাঁয়ের আলো।

গাড়ির ঢাকনা দেওয়া আলোটার চারপাশে কতকগুলো পোকা মাথা

ঠুকে ঠুকে মরছে—ফ্যাকাসে আলোর খানিকটা এসে পড়েছে ছবির মুখে। ওর জানলার ওপর রাখা মাথাটা মাঝে মাঝে ধাক্কা খাচ্ছে। জলের দাগ তখনও গালের উপর শুকিয়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে ওকে ধরে শুইয়ে দিয়ে সুকুমারী ওর মাথার কাছে বসে থাকে—রাত হয়েছে, তার নিজের শোবার কথাটা মনেই পড়ে না।

ছবির শ্রীহীন রুক্ষ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে সে ভাবে মমতার কথা।

শহরের মেয়ে বউ হয়ে এসেছে। সে বউ দেখতে ভেঙে পড়েছিল গ্রামের লোক। শুধু বউ নয়—বেশ বেশি বয়সের বউ। গ্রামে অত বয়সের বড় বউ তখনও আসেনি। সবাই আশা করেছিল শহুরে মেয়ের দু চোখে বোধহয় থাকবে অন্য এক দৃষ্টি—সে চোখের দিকে তাকানো যাবে না। তার কথায় থাকবে ছুরির ধার—হাসিতে ব্যঙ্গ—চলায় বিরক্তি। সে সইতে পারবে না এ সংসারের উদয়াস্ত পরিশ্রমকে—বইতে পারবে না বউ হয়ে থাকার যন্ত্রণাকে!

কিন্তু কোথায়? ভারি শান্ত—ভারি ভীরু একটা মেয়ে! সে চোখ তুলে তাকাতে জানে না—তার কথার স্বর ভয়ের খাদে ডুবে যায়—তার চলা কাঠবেড়ালির পায়ের শব্দকেও হার মানায়!

কতটুকু তখন সুকুমারী! ছবির মতোই বয়স তার তখন। সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়েছিল সে। এই কি তার শহর থেকে আসা বৌদি! কাউকে চমকানো গেল না— নতুন কিছু দেখাতে পারল না; উল্টে সব কিছুকে মেনে নিল মাথা পেতে। যা পেল তাতেই খুশি—যা পেল না তাতেও।

গান জানতেন মমতা, সেতার বাজাতে জানতেন। সে সব এনেও-ছিলেন সঙ্গে করে। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনের একদিনের আপত্তিতে সেই যে চুপ করে গেল নতুন বউয়ের গলার স্বর, আর কেউ শোনেনি এ বাড়িতে। আর কোনও দিন বাপের বাড়ি থেকে আসা হার-মোনিয়ামটার ডালাও খোলেনি সে; সেতারটায় ধুলো পড়েছে—ভেঙেছে-চুরেছে। তারপর সেটা কোন্‌দিন বুঝি নিজেই ফেলে দিয়েছে জঞ্জালের সঙ্গে।

সুকুমারী ভাল করে বোঝাতে পারত না। তবু অবাক বিস্ময়ে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত: তোমার রাগ হয় না বৌদি?

শান্ত চোখ তুলে বড় ভাতের হাঁড়ি নামাতে নামাতে জিজ্ঞেস করতেন মমতা : কিসের রাগ ভাই ?

: এই ধর……; ঢোক গিলে সে বলত, তুমি-তো শহুরে মেয়ে, তোমাদের কত সুখ ছিল—আমাদের এ বাড়িতে কত কষ্ট, কত কাজ—তোমাদের কষ্ট হবে না ? একটু গান পর্যন্ত গাইতে দেয় না বাবা।

: হ্যাঁ, ওটা একটা কষ্ট বটে—তাও প্রথম প্রথম হোত। এখন তো আর হয় না ভাই। শহুরে হলেই কি সবাই সুখী হয় ? মানুষ যা চায় সব সময় তা পায় না—আমার এই সুখ—, বলে হয়তো ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিভে যাওয়া কাঠগুলোকে আবার দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন মমতা, নয়তো বাটনা বাটতে বসতেন, নয়তো মাছে নুন-হলুদ মাখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। সুকুমারী স্পষ্ট করে আর মুখটা দেখতে পেত না। সে জানতো মমতার মা-বাবা কেউ নেই, ভাইদের কাছে আশ্রয় পাওয়া মেয়ে, বিয়ে হয়ে গিয়ে নিজের সংসার পেয়ে খুশি হয়েছে বলেই দুঃখটাকে জয় করেছে। এর বেশি কোনও দিন সে ভাবতে পারেনি—ভাববার ক্ষমতা ছিল না বলেই।

তারপরে কত কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে সংসারে। পৃথিবীতেও ! তার জীবনেও !

তারপর নিজের কথা ভাবতেই দিন চলে গেছে। —গ্রাম্য মেয়ের সামান্য কামনা থাকে—একটা বিয়ে।—তাই হয়তো সবায়ের মতো তারও চাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বেশি সে কিছু চেয়েছিল—। সে কথা সুকুমারী জানতেন আর জানতেন বলেই বোধহয় তাকে বেশি ভালবাসতেন। কিন্তু সেও তো স্বপ্ন—না-বোঝা স্বপ্ন !

যা সত্যি তাই কেবল সার্থক হোল না ! সুকুমারী সুখী হোল না ! এখন আর সে ছেলেমানুষের মতো কাউকে সুখের কথা জিজ্ঞেস করে না—তাকিয়ে দেখে বুঝতে চেষ্টা করে।

এবার দেখে এসেছে বৌদির চুলগুলোর মধ্যে দুটো একটা পাকা চুল। বৌদি বুড়ো হয়ে গেছে। নিঃশব্দে থেকে থেকে একদিন কেমন করে যেন বুড়ো হয়ে গেছে।

অথচ কি যেন বলবার ছিল তার—কি যেন সাধ ছিল—আশা

ছিল। সে কথা কাউকে বলতে পারে নি—সে কথা কেউ শুনতে চায়নি।

একদিন সুন্দর ছিল যে মেয়েটা, ষোলবছরের একটা নিটোল স্বাস্থ্যের যৌবন আজ প্রায় প্রৌঢ়া হয়ে এসেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাসগুলো বুকের মধ্যে জমিয়ে রেখে রেখে আরও বেশি গম্ভীর, আরও বেশি দুঃখসহা হয়ে উঠেছেন মমতাময়ী। বিয়ের আগের জীবনে তিনি কি চেয়েছিলেন তাও যেমন কেউ জানেনি—এ জীবনে তাঁর কি পাওয়া হোল না তাও কেউ জানে না। তিনটে ছেলে-মেয়ে মরে গিয়ে নিজেকে সাতটা ছেলে মেয়ে মরে যাওয়া শাশুড়ির চেয়েও বেশি করুণ করে রেখেছেন সারাক্ষণ।

কিন্তু তবু বোঝা যায়। আসলে মমতা যে সুখী হননি সেটা এবারই স্পষ্ট করে বুঝে এসেছে সুকুমারী। যদিও ছত্রিশ বছরের বড় বউয়ের মুখে এখন আর সে কথাটা মানায় না। তবু আজই, এতদিন পরেই বোধহয় এই নিঃশব্দে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া প্রাণটা এত স্পষ্ট করে বলে ফেলেছে ছবিকে তার হাতে তুলে দিতে দিতে : ছবি, সত্যিই আমার মনের ছবি ভাই। ওকে তোর হাতেই তুলে দিলাম।

ছবি বৌদির সেই অসুখী মনের প্রতীক! ওর চোখ-মুখের বন্য ভাবটা বুনো গাছের কথা মনে করায়। কি যেন একটা আকাঙ্ক্ষা আছে ওর—সেই লুকনো জ্বালাটা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কী চাই ওর? কী?

ছবির মুখের দিকে ভাল করে আবার তাকায় সুকুমারী। মেয়েটার বিষণ্ণ মুখখানায় সারাদিনের কান্নার ছাপটা যেন গাঢ় হয়ে লেগে আছে, চওড়া কপালটা বিরক্তিতে কুচকে আছে। হয়তো স্বপ্ন দেখছে—মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে তাই।

ওকে সব দেবে সুকুমারী! স্বামীর কাছ থেকে ভালবাসার বদলে আর যা কিছু পেয়েছে সে—টাকা-পয়সা, জামা-কাপড় গয়না! যা চায় ছবি—যা আছে সুকুমারীর। তাহলেও কি বুনো মেয়েটা শান্ত হবে না!

একবার ঘুমের মধ্যেই মস্ত বড় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ছবি। সুকুমারী একখানা হাত আলগোছে ওর গায়ের ওপর রাখতে ঘুমের ঘোরে সেই হাতখানাকে কি মনে করে আঁকড়ে ধরেছে মেয়েটা।

নয়

খুব ঘুমিয়েছে ছবি। সুকুমারী পিসিমা তাকে ডেকে তুলে খাবার খাইয়েছে। এখন তারা বসে আছে ইষ্টিমারের অপেক্ষায়। আজ সারাটা দিন নাকি ইষ্টিমারে কাটিয়ে কাল সকালে তবে তারা পৌঁছবে শহরে

এতক্ষণ গাড়িতে এসেছে ছবি। তাদের গ্রামের মাটি আর রেল-গাড়ি গড়িয়ে আসা মাটিতে কেমন একটা যোগ আছে। এ মাটিতে কান পাতলে এখনও যেন শোনা যাবে সেই ডাকগুলো, ছবি—ই! ছবি—ই!

হেঁটে গেলে! কত--ক-অ-ত মাইল হেঁটে গেলে তবে পৌঁছনো যাবে!

কিন্তু জলে কোনও উপায় নেই। ওই যে ইষ্টিমারটা তার বিরাট সাদা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে দেখে ছবির যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মস্ত বড় নদীটা—কতদূর পর্যন্ত তার জল, কূল দেখা যায় না। কোথায় যে চলে যাবে তারা! মাটি থাকবে না—মাটির গন্ধ থাকবে না।

সিঁড়ি দিয়েছে ইষ্টিমারের। পিসিমা শক্ত করে ছবির হাত ধরে রেখেছে, তার না চলে উপায় নেই। ভিড়, ঠেলাঠেলি। তার মধ্যে দিয়ে অনিচ্ছুক পা দুটো টেনে টেনে সে চলেছে সবাইয়ের সঙ্গে।

কান্নার চেয়েও বেশি করে একটা আগ্রহ মেশানো কৌতূহলের ভাব তার চোখের জলকে বারে বারে চোখেই শুকিয়ে দিচ্ছে।

কাঠের সিঁড়ি, দড়ির রেলিং। পেছন থেকে অনবরত ধাক্কা খেতে খেতে মানুষগুলো যেন আপনা-আপনি উঠে যাচ্ছে।

সিঁড়ির ওপরেই সারি সারি মানুষ মালপত্র নিয়ে বসে আছে। এরই মধ্যে অনেকে বিছানা পর্যন্ত পেতে ফেলেছে। গোলমাল, হৈ-চৈ। কিন্তু ছবিদের ওখানে দাঁড়াতে নেই। ওটাকে বলে ডেক।

তারা থাকবে কেবিনে। যারা বেশি টাকা দিতে পারে না—তারাই ডেকে থাকে। পিসেমশাইয়ের অনেক টাকা—মণিদা বলেছিল।

কে যেন ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। চমকে উঠে ছবির মনে হয় এ যেন তারই বুকফাটা কান্না!

কে কাঁদছে রে! ওই যে ঐ কোণে একটা ছোট মেয়ে, সেফুর মতো সে। খালি গায়ে তার ডুরে শাড়ি পরা। মাথার লাল লাল জটা-করা চুলের মধ্যে মোটা করে সিঁদুর দেওয়া। কপালের মস্ত বড় ফোঁটাটা বেঁকে-চুরে গিয়ে সারা কপাল মাখামাখি হয়ে গেছে।

বিয়ে হওয়া মেয়ে। ছবি ওরকম কুসুমপুরেও দেখেছে। কাঁদছে কেন? বোধহয় মাকে ছেড়ে এসেছে, বোধহয় ওরও কুসুমপুরের মতো একটা গ্রাম আছে, মণিদা আছে, বন্ধুরা আছে—তাই কাঁদছে! ওর পাশে বড়কার মতো বড় একটা কালো লোক বসে আছে চুপ করে। সে একটা কথাও বলছে না—মেয়েটাকেও থামাচ্ছে না, কেমন বোকার মতো লোকজনদের দিকে তাকিয়ে আছে হাঁ করে।

সুকুমারী বলে : চল্ ছবি, অমন করে দাঁড়ালি কেন?

খুব সুন্দর ঘর। ট্রেনে তবু আরও লোক ছিল—এ ঘরটা নাকি তাদেরই কেবল। এখানেও পাখা আছে—আলো আছে। কাপড় রাখবার ব্র্যাকেট আছে, আয়না আছে। দরজার বাইরে খানিকটা খোলা জায়গা—সেখানে নীল লুঙ্গি পরা একটা লোক দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, এবার সে পিসেমশাইকে একটা সেলাম করল।

স্টিমারটা হঠাৎ ভীষণ মোটা সুরে শব্দ করে উঠতেই ছবি চমকে সুকুমারীকে জড়িয়ে ধরে। সুকুমারী বলে : ভয় কিরে? ওটা জাহাজের বাঁশি। একটু পরেই ছাড়বে কিনা তাই।

খুব ব্যস্ততা আর গোলমাল বেড়েছে বাইরে। ইস্টিমারটা হঠাৎ একটু একটু কাঁপতে শুরু করেছে, আর সেই সঙ্গে কাঁপছে ঘরের সব কিছু।

আরও একবার বাঁশি বাজালো জাহাজটা—তার শব্দটা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। থেমে গিয়েও যেন গমগম করে চলে যাচ্ছে বহু দূরে। কত দূর? শব্দটা কি কুসুমপুরে যাচ্ছে? মা এখন কি করছে? হয়তো ডালে কাঁটা দিচ্ছে। শব্দটা শুনে কাঁটা রেখে আঁচল দিয়ে

চোখ মুছছে। হয়তো বাটনা বাটছে—শব্দটা শুনে বাটনা বাটা বন্ধ করে চুপ করে ভাবছে।

একটু একটু করে পাড় থেকে আলাদা হয়ে ইস্টিমারটা বেশি জলে গিয়ে পড়েছে। ছবির চোখ ছাপিয়ে আবার জল পড়ে, তবু জোর করে সে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কটা কাক উড়ে এসে বসেছে ইস্টিমারের রেলিংয়ের গায়ে। আবার উড়ে যাচ্ছে। ওদের বেশ মজা! যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারে! এখন কোথায় যাবে? কুসুমপুরে যেতেও তো পারে!

পিসিমা ডাকছে। তাড়াতাড়ি ফ্রকের কোণটা দিয়ে চোখ মুছে ফেলে সে।

সুকুমারী তার চুলে তেল মাখিয়ে পাশের ঘরের দরজাটা খুলে ভেতরে নিয়ে যায়। সেখানে একটা লোহার গোল জিনিস টিপে দিতেই জল পড়ে।

পিসিমাদের বাড়িতেও নাকি এমনি কল আছে, টিপলেই জল। আলো আছে, আপনা থেকে ঘোরা পাখা আছে।

স্নান করিয়ে দেয় পিসিমা তাকে নিজের হাতে। ছবির ভারি লজ্জা করে জামা খুলতে। পিসিমা তাকে সাবান মাখাতে চায়।

কুসুমপুরে সে কখনও সাবান মাখত না। মাথায় খাবলা করে তেল মেখে বড় পুকুরটায় ডুব দিয়ে সে পাঠশালায় চলে যেত।

কেবল কোনও দিন, ছুটির দিন, মা হয়তো সবাইকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে অনেকগুলো কাপড়-জামা কাচতে গেছে ঘাটে, হাট থেকে কিনে আনা গোল বলের মতো সাবান ঘষছে জামা-কাপড়ে, তখনও সেও যেত পেছন পেছন। মা জোর করে সেই কাপড় কাচা সাবান দিয়েই ঘষে দিত তার গা-হাত-পা আর বলত: এত বড় মেয়ে হয়েছিস, নিজের গা-হাত-পা নিজে পরিষ্কার রাখতে পারিস নে?

কিন্তু পিসিমার সাবানের কী মিষ্টি গন্ধ! অনেক টাকা দাম বোধ হয়! পিসেমশাইয়ের অনেক টাকা আছে, তবু পিসিমার নাকি শান্তি নেই। টাকা থাকলেও নাকি শান্তি হয় না—মা বলছিল একদিন।

দুপুরে ছবি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দিগন্তবিস্তৃত জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর পিসিমা আর পিসেমশাইকে ঘুমোতে দেখে সে সোজা আসে ডেকে! সেই ডুরে শাড়ি পরা, ডুকরে কাঁদা মেয়েটাকে সে খুঁজে বার করতে চায় কিন্তু যতদূর তাকায় লোকগুলোর মধ্যে কোথাও সে নেই। বেশি দূর যেতে তার ভয় করে। যদি পথ হারিয়ে ফেলে সে, যদি আর না ফিরতে পারে?

ডানদিকে একটা কেবিনের মতো ঘর। অনেক মানুষ সেখানে—সবাই মেয়েমানুষ। তারা কেউ মাটিতে বিছানা পেতেছে—কেউ বেঞ্চে। কেউ শুয়ে আছে, কেউ বসে আছে, ছোট ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে একজন ঝিনুকে করে।

ওর মধ্যে থেকে কখন হঠাৎ একটা মেয়ে বেরিয়ে এসেছে—রোগা, কালো কিন্তু সুন্দর একটা ফ্রক পরা, চুলে তার লাল ফিতে বাঁধা, পায়ে মোজার সঙ্গে জুতো, মাথায় কোঁকড়া চুল কিন্তু তার মতো অত বড় নয়। ছবি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

মেয়েটা কিন্তু নিজেই এসে ভাব করে তার সঙ্গে। হাত ধরে টানতে টানতে তাকে ঘরে নিয়ে যায়: মা, ভাখ ওর কত বড় চুল আর আমার চুল বড় হলেই তুমি কেবল কেটে দাও।

মেয়েটার মা-ও মেয়েটার মতো কালো। কালো পাড় সাদা একটা শাড়ি পরনে, মাথায় কিন্তু সিঁদুর নেই। খুব গম্ভীর মুখ, ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন কেবল মেয়ের কথা শুনে।

মিনু ওর নাম। ছবিরা যে শহরে যাচ্ছে ওরাও সেখানে থাকে, ভাই-বোন ইস্কুলে পড়ে। বাবা নেই—মা হাসপাতালে চাকরি করে!

মেয়েমানুষ আবার চাকরি করে! ছবি এই প্রথম শুনল।

ওদিকের রেলিং-এর কাছ ঘেঁষে অনেকক্ষণ থেকে হাফ প্যান্ট পরা একটা ছেলে কী একটা বই পড়ছে মনোযোগ দিয়ে, মিনু সেখানেও টানতে টানতে নিয়ে যায় ছবিকে: দেখেছ ভাই—বইয়ের পোকা আমার দাদাটা। দিনরাত বই পড়ে পড়েই তো চোখটা খারাপ করেছে।

ভাইয়ের চুলের মুঠি চেপে ধরে আলগোছে টান দেয় মিনু : এ্যাই দাদা, ছাখ্ না—আমার বন্ধু !

ছবিকে বন্ধু করে নিয়েছে এই ফ্রক পরা, ফিতে বাঁধা শহরের মেয়েটা! খুব আনন্দ হয়। খুব ভাল ওরা। মিনুর ইস্কুলে তাকেও ভর্তি করে দিতে বলবে পিসিমাকে।

ছেলেটা একবার তাদের দিকে তাকায়। চোখ থেকে চশমাটা খুলে শার্টের কোণ দিয়ে মুছতে মুছতে লজ্জিত মুখে একটু হাসে।

মণিদার মতো দেখতে। না—মণিদা ওর চেয়ে ফর্সা। ওইটুকু ছেলে চশমা পরেছে!

মিনুর টানাটানিতে বইখানা শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে সে পাশে রেখে দেয়—কি যেন একটা বলতে গিয়ে তার ঠোঁট দুখানা কাঁপে, কিন্তু কিছুই না বলে আবার সে অন্যমনস্ক হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে! কেবল মিনুই অনর্গল কথা বলে।

ক্রমে মিনুর কথা বলাও কখন আপনা থেকেই থেমে যেয়ে তিনজনেই চুপ করে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। গোটাকয়েক গাঙচিল তীক্ষ্ণ চীৎকার করে করে জলের ওপর দিয়ে উড়ছে, ইষ্টিমারের চলাটা আস্তে আস্তে কমে আসছে। সামনের গাছপালা দেওয়া চড়ার দিকে ওর গতি। কোনও স্টেশন এসে গেছে।

ইষ্টিমারটা নোঙর করা হয়। লোকজন ওঠানামার ব্যস্ততা, জিনিসপত্র কেনা-বেচা দাম-দস্তুর চলে। গোটাকয়েক ন্যাংটো ছেলে জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে কি বলছে ওদের তিনজনকে। দুজন ঘোমটা দেওয়া বউ ইষ্টিমার থেকে নেমে মালপত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছে—বোধহয় সঙ্গের লোকের অপেক্ষায়। তারপর আবার কখন চলতে শুরু করেছে জাহাজটা!

কখন যেন একসময় মিনুর দাদা অসীমও কথা বলে ফেলেছে। ছবির দিকে তাকিয়ে সে বলে : একটা জিনিস দেখবে?

ছবি আর মিনু দুজনেই একসঙ্গে মাথা নাড়ে। পিসিমার কথা ভেবে একটু একটু ভয় করে ছবির তবু সে ফিরে যায় না।

প্রথমে অসীম ওদের ইষ্টিমারটার যন্ত্রপাতির ঘরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। অবাক বিস্ময়ে তিনজনে সেই বিরাট যন্ত্রগুলোর চলা দেখে,

শব্দ শোনে! মিনু দু-একবার কথা বলতে যায় বটে, কিন্তু সে কথা কারুর কান পর্যন্ত পৌছয়ই না। ছবি এত শব্দ কখনো শোনেনি, এমন অদ্ভুত যন্ত্রপাতি কখনো দেখেনি। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে তার কেবলই তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কি ' অসীম তাদের আরও অদ্ভুত জায়গায় নিয়ে যায়। সেটাকে সে বলে, বয়লার ঘর।

সেখানে ইস্টিমারের পেটের মধ্যে অন্ধকারে দাউ দাউ করা আগুন জ্বলছে আর অন্ধকারের মতো কালো একটা লোক অনবরত মস্ত বড় কোদালে করে গাদা থেকে কয়লা দিচ্ছে। আগুনের ফুলকিগুলো মাঝে মাঝে ছিট্‌কে ছিট্‌কে এধার-ওধার পড়ছে! লোকটার সারা গা দিয়ে কালো জলের মতো ঘাম নামছে। ছবি হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

অসীম একটু হাসে : দেখেছ তো, এ না হলে ইস্টিমারটাই অচল হয়ে যেত। কী রকম কাজটা বলতো? আমিও বড় হলে এ কাজ করব।

: করবি!—মিনু হঠাৎ বলে ওঠে : তুই যেন কি দাদা! তুই যে বলিস তুই টেগরার মতো হবি? আর মা বলেছে, বড় মামা তোকে পুলিশের চাকরি দেবে। এটা বুঝি তার চেয়ে ভাল কাজ?

: থাম্ থাম্,—অসীম যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছে হঠাৎ : পুলিশের চাকরি করতে আমার বয়ে গেছে।

এসে আর পুরনো জায়গাটা পায় না তারা—দুজন লোক বসে রয়েছে সেখানে, আবার একটা নতুন জায়গা বেছে নিয়ে বসে।

পকেট থেকে একটা ছবিওয়ালা টুকরো কাটা কাগজ বার করে দেখায় তাদের অসীম : টেগ্‌রা!

: এইটুকু ছেলে জান কি রকম রিভলবার চালাত? কী সাহস! বেঁচে থাকতে ধরতে পারে নি পুলিশ!

একটা অস্পষ্ট বিবর্ণ ছবি। স্পষ্ট করে তার মুখ, চোখ কিছুই বোঝা যায় না, তবু তিনজনেই তার ওপর ঝুঁকে পড়ে একমনে দেখতে থাকে! বইয়ের পাতা থেকে কেটে নেওয়া ছবি।

দেখা শেষ হলে অসীম সেটাকে সযত্নে আবার তার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখে।

ওদিকে আস্তে আস্তে দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে যায়—গাঙ্‌-চিলগুলোর চীৎকার কেমন করুণ, তীক্ষ্ণ আর একটানা হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে জলের ওপর, আবার থামছে ইষ্টিমারটা, আবার দাঁড়াবে। সেই লোকটা কয়লা বন্ধ করেছে বুঝি! সারা শরীরে, সারা মুখে কালো কয়লার গুঁড়ো মাখা পেশীবহুল হাতখানা একবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছবির—সে অমন কখনও দেখেনি।

খুঁজতে খুঁজতে অবিনাশ আসছেন। দেখে ছবির মুখ শুকিয়ে ওঠে। কতক্ষণ চলে এসেছে সে, নিশ্চয়ই পিসিমা তাকে ভীষণ বকবে। পিসেমশাই হয়তো ওদের সামনেই তার কান ধরে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু সেরকম কিছুই করেন না অবিনাশ, কেবল গম্ভীর গলায় বলেন: তোমার পিসিমা ডাকছেন ছবি।

ইচ্ছে নেই তবু যেতে হয়! তার তো কুসুমপুর ছেড়েও আসবার ইচ্ছে ছিল না, তবুতো আসতে হয়েছে। এখন থেকে আর অনেক কিছুই নিজের ইচ্ছেয় করা যাবে না, এটা কেমন করে হঠাৎ যেন তার মনে হয় পিসেমশাইয়ের সঙ্গে চলে যেতে যেতে।

পেছন থেকে মিন্টু ফিসফিস করে বলে দিয়েছে: কুমুদিনী হাই-তে ভর্তি হবে কিন্তু ভাই। বলে দিলাম! আবার এসো…।

অসীম কথা বলে নি—কেবল তাকিয়ে থেকেছে।

পিসিমা মৃদু বকুনি দেয়। আর তাকে একা বেরুতে দেয় না—চোখে চোখে রাখে। তাকে নাকি খুঁজে বার করতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লেগেছে।

নিজেদের কেবিনের রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে বাকি সময়টুকু কাটায় ছবি একা একা।

তারপর রাত হয়—রাত বাড়ে। সুকুমারী ছবিকে খেতে দেয়, ছোট মেয়ের মতো বিছানায় শুইয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। মাঝরাতে আধ্-ঘুম, আধ্-জাগা অবস্থায় কখন বুঝি ইষ্টিমার ছেড়ে গাড়িতে উঠেছে সে কথা সে নিজেও জানে না। কিন্তু

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আবার কেঁদেছে, স্বপ্নের মধ্যে বিড় বিড় করে বকেছে; মাঝে মাঝে বুকের কাছে থম্‌কে থাকা কান্নাটা কখন একসময় শব্দ হয়ে বেরিয়েছে। আর সুকুমারী তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে সারারাত জেগে কাটিয়ে এখন ডাকছেন: ছবি ওঠ, ওঠ, আমরা এসে গেছি।

: এসে গেছি,—উঠে বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে শহরটাকে দেখতে চায়। সারা স্টেশনটায় গোটাকয়েক কুলি ছুটোছুটি করছে, চা-খাবারওয়ালারা চেঁচিয়ে খাবার বিক্রির জন্যে দৌড়চ্ছে। সকাল হয়ে গেছে তবু অত বড় প্ল্যাট্‌ফরমের সব আলোগুলো জ্বলছে, সব পাখাগুলো ঘুরছে। কেমন ধূলো ধূলো বিষণ্ণ সকাল! কেমন যেন! কুসুমপুরের সকাল তো এমন হোত না।

ছবি এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুশি হয় না একটুও। মিনুদের খোঁজে ব্যগ্র চোখে। মিনুরাও নেমেছে গাড়ি থেকে, ছুটে এসে তার হাত ধরে নাড়া দিয়ে আবার দৌড়ে মা'র পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সে। অসীম আসে না, দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসে একটু, তারপর মা'র পেছন পেছন কুলি সঙ্গে নিয়ে চলে যায়।

বাইরে গিয়ে পিসেমশাই তাদের জন্যে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করছেন। ঘোড়ার পায়ের কেমন তাল হয়! টক্‌টক্ ঠক্‌ঠক্ টকর, টক্‌টক্ ঠক্‌ঠক্ টকর।

গাড়ির জানলা দিয়ে ছবি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বাইরে। শহরটাকে তীক্ষ্ণচোখে দেখে। শহর!

দশ

মন ভাল নেই ছবির। আজ কদিনেও হোল না। বিস্ময়টা কাটতে কয়েক ঘণ্টা মাত্র লেগেছে—সুইচ টিপে আলো জ্বালানো এখন আর অদ্ভুত লাগে না। কল টিপলেই জল পড়বে এটা সে জেনে ফেলেছে, কেমন করে পাখা ঘোরাতে হয় সেটাও আর কাউকে দেখিয়ে দিতে হয় না।

এখন তবে কি আছে? কিছু নেই! কিছু না! লাল মাটির ধুলো ধুলো বিষণ্ণ একটা শহর! ছবিকে তাও হতাশ করেছে! এখন সে লুকিয়ে এখানে-ওখানে চুপি চুপি কেঁদে বেড়াচ্ছে।

বাইরের ঘরে বড় বড় তিনটে আলমারী-ভরা খেলনা, পুতুল। সেগুলো দেখতে দেখতে সে কাঁচে চোখের জল মুছে মুছে দাগ করে দিয়েছে। কখন! সে নিজেও জানে না।

পেছন দিকের বাগানটায় কটা জবা ফুলের গাছ আছে, একটা কামিনী ফুল, আর কটা গন্ধরাজ গাছ একসঙ্গে খানিকটা জায়গা ছায়া করে রেখেছে। সেখানে বসেও বেশ কাঁদা যায়।

কিন্তু তার পছন্দ রান্নাঘরের পাশের জামরুল গাছটার তলা। তার মোটা গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে কত কথা ভাবা যায়, আকাশটা দেখা যায় যতদূর তাকাও। মাঝে মাঝে কাকে কাঁচা জামরুল ঠুকরে গায়ে মাথায় ফেলে।

এখানে এসে পিসিমাও যেন কেমন হয়ে গেছে। সেই উদাস-উদাস ছাড়া-ছাড়া ভাব আর নেই। এখন পিসিমা চাকরদের সঙ্গে ঝগড়া করছে, নিজের হাতে রান্না করছে, জোরে জোরে হাঁটছে, জোরে জোরে কথা বলছে আর চোখ রেখেছে ছবির দিকে। একরাশ খেলনা-পুতুল বার করে দিয়ে বলেছে: কোথাও যেও না ছবি, এখানে বসে খেলা কর। আরও এনে দেব।

যেন পিসিমা জানে না যে এসব ছবির ভাল লাগে না।

কী যে ভাল লাগে ছবি তা নিজেও জানে না। কান্না পায়। কেবল কান্না পায়।

একটা সঙ্গী নেই, সাথী নেই! ছবি কি পিসিমার ওই খেলনা আর পুতুল নিয়ে দিন কাটাবে? পিসিমার দেওয়া একরাশ জামা-কাপড়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে মরবে! কিছু চায় না সে এ সব। তাকে আবার ফিরিয়ে দিক গাঁয়ে। সেখানে দাদু, ঠাকুমা। বকুক গে—! কিন্তু এখানে থাকলে সে যে মরেই যাবে তা কি কেউ বোঝে না?

পিসি বলেছে: 'সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস ছবি। তোকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। নতুন নতুন ফ্রক করে দেব। কাঁদিস নে।

—কাঁদিস নে, বললেই যেন কান্না থামানো যায়! মার কাছে লাইনটানা কাগজে বড় বড় অক্ষরে চিঠি লিখতে গিয়ে, মণিদার কাছে লিখতে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে সে—কালি আর চোখের জলে মিশিয়ে একাকার করে দিয়ে।

চোখের জল তার এখন গাল বেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে—মাথা নিচু করে সেগুলোকে একবার সে গুণবার চেষ্টা করে। পিসিমা ঘুমুচ্ছে বলেই সে এসে বসতে পেরেছে এখানে—নইলে তার কোথাও যাবার যো নেই।

পাশের বাড়িটায় কয়েকবার সে ছোট মেয়ের গলা শুনেছে, কিন্তু পিসিমা বলেছে ওদের সঙ্গে নাকি মিশতে নেই।

কেন মিশতে নেই ছবি তা জানে না। কেবল ইচ্ছে করছে ওদের সে একবার দেখে, কথা বলে।

হাওয়া দিচ্ছে বেশ। কোন্‌মুখো হাওয়াটা সে ইচ্ছে করলেই বলে দিতে পারে। একমুঠো ধুলো বাতাসে ছড়িয়ে দিলেই বোঝা যায়। তাদের পাঠশালার সবাই জানত এটা। শিরশির করে জামরুল গাছের পাতাগুলো নড়ছে। ঝর-ঝর, থর-থর করে নারকেল গাছটার পাতা কাঁপছে। এই নিঝুম দুপুরটায় ছবি ভাত খেয়ে পাঠশালায় ফিরে যেত। কখনও হাঁটত, কখনও হাঁটতে গিয়ে থেমে যেত একসময়। পা দিয়ে ধুলো ছিটিয়ে ছিটিয়ে অন্ধকার করে দিত। হাঁটতে হাঁটতে ফিস্‌ফিস্ করে নিজের মনেই ছড়া বলত।

সত্যি সত্যিই কে যেন ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে তার পেছনে

দাঁড়িয়ে। পেছন ফিরে তাকিয়ে সে অবাক। দুটো মেয়ে! চেহারা দেখে ছবি পর্যন্ত বলে দিতে পারে যে ওরা দুই বোন। ছোট মেয়েটার খালি গা, একটা ছেঁড়া ইজের পরনে। সারা গায়ে ধুলো, চুলে পর্যন্ত যেন ধুলো লেগে আছে। যেন ধুলো নিয়ে খেলা করতে করতে এইমাত্র উঠে এসেছে।

বড় মেয়েটা ছবির চেয়ে খানিকটা বড়। তার গায়ে একটা জামা আছে—জামাটার বুকের দিকটা আঁটো, মেয়েটাকে বিশ্রী দেখাচ্ছে তাতে, কিন্তু সেইটুকুই কেবল আস্ত আছে। নিচের অংশটুকু ঝুল-ঝুল করে হাঁটুর ওপর ঝুলছে।

ময়লা ছেঁড়া ছেঁড়া জামা-কাপড়, ধুলো মাখা হাত-পা কিন্তু কী সুন্দর ওরা! ধুলো-বালি মাখা খানিকটা সৌন্দর্য যেন ছবির সামনে মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে।

মিনুকে দেখেছিল সে। সে তো পরিষ্কার। তার পরনে ছিল সিল্কের জামা, চুল ছিল আঁচড়ানো, পা দুটো ঢাকা ছিল জুতো-মোজায়। তখন মনে হয়েছিল হঠাৎ—এই বুঝি সৌন্দর্য! সুন্দর কাকে বলে স্পষ্ট ধারণা হয়নি বলেই মিনুকে সুন্দর লেগেছিল।

জটা-করা লাল লাল চুল, পা ভরা ধুলো, নোংরা নোংরা মেয়ে দুটো, কিন্তু হাঁ করে ওদের দেখতে ইচ্ছে করে। এরকম ইচ্ছে আগে কোনও দিন করেনি তো। তার মতো দুটো মেয়ে কিন্তু চোখ দুটো তার মতো নয়। অত বড় চোখ কারুর হয়? অত কালো? অতো সুন্দর! অত ছোট কপাল, অত ফর্সা! ওরা কি ধুলো মেখে ফর্সা হয়েছে? নাকি ওদের গায়ে রক্ত নেই!

বড় মেয়েটা এসে তার হাত ধরে: তুমি কাঁদছো কেন ভাই?

কাঁদছে নাকি? সত্যিই তার চোখে জল! কিন্তু সেটা এখনকার নয়—আগের। ছবি তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে হাসার চেষ্টা করে। লজ্জিতের হাসি, দুটি নতুন মানুষকে অভ্যর্থনা করার হাসিও।

ছোট মেয়েটা গাছের চারপাশে খুঁজে খুঁজে গোটাকয়েক কাকে ঠোকরানো জামরুল পেয়েছে, তার একটা সে ছেঁড়া প্যান্টের এক কোণে মুছে একটা তার দিদিকে দেয়, একটা পরমানন্দে নিজে চিবোতে চিবোতে ছবিকে বলে: খাবে ভাই? এ গাছের জামরুল যা মিষ্টি!

কাকে ঠোকরানো! একটু ঘেন্না করে ছবির, তবু হাসিমুখে সে হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বড় মেয়েটা ধমকায় ছোট বোনকে : ওকে এই জামরুল দিচ্ছিস পিলু! ও কেন পড়ে থাকা জিনিস খেতে যাবে—ওদের বুঝি গাছ না! হ্যাঁ ভাই—তোমাকে বুঝি আমাদের বাড়ি যেতে বারণ করেছেন উনি! উনি—কে হন তোমার?

গম্ভীর হয়ে ছবি বলে : আমার পিসিমা।

পিসিমা! প্রথম প্রথম আমরাও তো পিসিমা বলতাম—সেই যখন প্রথম এসেছিলাম তখন, নারে পিলু? তখন তো আমরা আসতাম—জামরুল খেতাম, ঘরে যেতাম। কিন্তু এখন যাই না···এখন আর জামরুল খেতে দেয় না। আমাদের দেখতে পারে না আর—নারে পিলু?—অনর্থক মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মেয়েটা কথা বলে, জোর করে টেনে টেনে।

: কেন? এখন যেতে দেয় না কেন?—ছবি হঠাৎ বোকার মতো প্রশ্ন করে!

: এখন? এমনি! শুধু শুধু, এমনিই, কে জানে—বলবার ধরন দেখে বেশ বোঝা যায় মেয়েটা কিছু একটা গোপন করছে, কিছু একটা বলতে চাইছে না। তারপরই হঠাৎ চকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ায় কেমন ভয় পাওয়া ভাব নিয়ে : পিলু, চল—বকে যদি!

ছবিও উঠে দাঁড়ায়, পেছন থেকে বলে : দাঁড়াও, আমিও যাব। তোমাদের বাড়ি যাব আমি!

মেয়েটা ঠিক অবাক হয় না, একটা বোকা ভাব তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে : তুমি যাবে? আমাদের বাড়ি? তোমার পিসিমা বকবে না? আমরাও আগে পিসিমা বলতাম—সেই যখন প্রথম এসেছিলাম! তুমি আমাদের বাড়ি দেখবে? হি হি—' হাত ধরে টানতে টানতে সে যেন কিছু একটা মজার জিনিস দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে ছবিকে।

এই নাকি বাড়ি! টিনের চাল দেওয়া ছোট দু'খানা ঘর। উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মেয়েটা বলে : বল তো মা কে? হি হি—।

এই বুঝি ওদের মা! ঢল ঢলে হাতে দু'গাছা শাখা খুলে খুলে পড়ছে, মাথার সামনের দিকের চুল উঠে গেছে অনেকখানি, আর মেয়েদুটোর

মতো বড় বড় চোখ কিন্তু চোখ কোটরে ঢুকে গেলে কি এত খারাপ দেখায় মানুষকে !

কাঁথা সেলাই করছে, হাতের কাছে একরাশ জমা করা কাপড় দিয়ে।

সেই মা একবার কেবল চোখ তুলে তাকায়। খ্যাসখেসে গলায় জিজ্ঞেস করে: ও বাড়িতে এসেছ বুঝি ? অবিনাশবাবু কে হন তোমার ?

মানুষের গলায় স্বর কি এত নির্জীব হয় ! এত প্রাণহীন ? আর কিছু জানাবার নেই, আর কিছু বলবার নেই, আবার ডুব দেয় নিস্তব্ধতায়—আবার চোখ কুঁচকে সেলাই করে।

ঘরটার এক কোণে একটা বিছানা গোটানো রয়েছে, কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে দুটো মুখ বাঁধা বস্তা। আর সারা ঘরটার এ কোণে, ও কোণে নোংরা ময়লা ধুলো আর জঞ্জাল। সারা বাড়িময় টুকরো টুকরো তুলো উড়ে বেড়াচ্ছে কোথা থেকে কে জানে। সারা উঠোনময় ধুলো, বাতাসে উড়ছে।

ছাব বেশ বুঝতে পারে ওরা গরীব। পিসিমার মতো ওদের আলমারী ভরা কাপড় নেই, খাট নেই, পুতুল নেই। নেই বলেই আরও বেশি করে সেটা যেন দেখানোর চেষ্টা আছে ওদের—আরও বেশি করে গরীব হয়ে থাকা—গরীব আর নোংরা !

সেই মা আবার চোখ তোলে। বড় বড় কালো গর্তে ঢোকা চোখ ছবির মুখের ওপর ফেলে চাপা চাপা গলায় জানতে চায়: তোমাকে এনেছে কেন পিসিমা—কাছে রাখবে বলে ?

ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ে ছবি। কিসের ভয় তা সে নিজেও জানে না। তবু ভয় !

হঠাৎ শিরা ওঠা ফাটা হাতে ছবির মুখখানা তুলে ধরে ওদের মা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি যেন দেখতে চায়। কাকে যেন শুনিয়ে শুনিয়ে বলে: কি আছে এ মেয়ের ! আমার পিলুটাকে নিল না—খেত-পরত, বেঁচে যেত। ও নাকি বিষের বড়ি ! আর এ—, হঠাৎ মুখখানা ছেড়ে দেয়: এ মেয়ে বন-ধুঁতরো। আমার মেয়েরা চোর ! চোর তো বেশ—আঁটকুঁড়ি ! তুই ! তোর খাবে কে অত ? নেয়নি আমার পিলুটাকে···! সঙ্গে করে এনেছে মেয়ে ! ভাল মেয়ে !

সেই কর্কশ কথা বলা মুখখানার দিকে তাকিয়ে, তীব্র স্বরের ইনিয়ে

বিনিয়ে বলা কথাগুলো শুনতে শুনতে ছবির হঠাৎ হাউমাই-করা কান্না পায়। কিন্তু শক্ত হয়ে সে চোখের জল আটকে রাখে। সারা মুখ লাল হয়ে যায়, কান দুটো লাল টকটকে হয়ে যায়, এক অদ্ভুত আতঙ্কে তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে। বড় মেয়েটাকে দেখে যেমন প্রথমে পাগল বলে মনে হয়েছিল ওদের মাকেও তাই মনে হয়।

কেবল ছোট মেয়েটাই আশ্চর্য শান্ত। সে ছবির হাত ধরে টেনে ওঠায়, বলে: চল, মা বড্ড বকে সবাইকে। নিলুদিকে তো দিনরাত—আমাকে একটু কম।

ছবি যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। সে পেছন ফিরে চলে যাবার সময় সেই মা হঠাৎ ভাল করে চোখ তুলে তাকায়, ক্লান্ত গলায় বলে: ওকে ঠাকুরঘর থেকে দুখানা বাতাসা এনে দে, নিলু।

না, ছবি বাতাসা খেতে চায় না। নিলু ছুটে গিয়ে জোর করে তার হাতে গুঁজে দিলে সেগুলো তার হাতের চাপে গুঁড়ো হয়ে যায়। সে শুকনো বিবর্ণ মুখে প্রায় ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় শোনে, নিলু বলছে পিলুকে: দেখিস আর আসবে না ও। মা-টা যেন কেমন নারে, পিলু? কাউকেই ভালবাসে না। যদি ও পিসিমাকে বলে দেয়?

না, ছবি বলতে চায় না নিলুর মায়ের কথা, কাউকে বলবে না সে। নিলু আর পিলু লজ্জা পেয়েছে সেই জন্যেই ছবি বলবে না কাউকে। কিন্তু আর যাবে না ওদের বাড়ি।

ও বাড়ি থেকে দুবার সে পিসিমার ডাক শুনতে পেয়েছিল, নিলুর মায়ের তীক্ষ্ণ কর্কশ কথাগুলোর চেয়েও বেশি আতঙ্কিত করেছিল সেই ডাকটা।

দরজার কাছে তাকে থমকে দাঁড়াতে দেখে সুকুমারী বলে: বারণ করেছি তবু গিয়েছ ওদের বাড়ি? আর যেও না,—তারপর একখানা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলে: তোর মা'র চিঠি, ছবি। প্রদীপও লিখেছে।

মা'র চিঠি! ছবি চিঠিখানা সুকুমারীর হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে বাইরের ঘরের একেবারে কোণের আলমারীর পাশে গিয়ে বসে।

মা'র চিঠি! হেসে, কেঁদে, কী করবে সে ভেবে পায় না। চিঠিটা পড়তে তার খানিকটা সময় লাগবে। কিন্তু পড়তে সে চায় না। বারে বারে চোখের সামনে তুলে ধরে সে। নাকের সামনে নিয়ে গন্ধ নেয়। মা'র রান্না করা হলুদমাখা হাতের গন্ধ পাচ্ছে সে, গ্রামের গন্ধ পাচ্ছে! কী

শিখেছে মা! ছবি সোনা আমার।—সে ডাকে এখান থেকেই সাড়া দেয় সে—মা! মা! আমার মা!

নিলুদের মা আছে, তার বসে যাওয়া বড় বড় চোখের স্থির কুটিল দৃষ্টিটা ভাসে। ইষ্টিমারে দেখা মিনুর মায়ের মার্জিত চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু তার মা! তার মা'র মতো কেউ নয়।

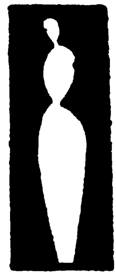
কিন্তু মা'র চেহারাটা যে কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ভাবতে গেলে। ভাবতে পারছে না কেন সে! উচ্ছ্বসিত কান্নায় এবার ছবি ভেঙে পড়ে। তিনটে মা'র চেহারাই কেমন করে যেন এক হয়ে গেছে। মমতার চেহারাটা আলাদা করে ভাবতে পারে না এটাই তার কাছে যন্ত্রণা হয়ে ওঠে।

পিসিমা আসছে। আলমারীর পাশ দিয়ে তার ফর্সা ফর্সা পা দুখানা দেখা যাচ্ছে। ছবি কান্নাটাকে একেবারে গিলে ফেলে।

সুকুমারী ডাকে: ছবি, খাবে এস।

তাকে একটু কাঁদতেও কি দেবে না পিসিমা!

এগার



পিসেমশাইকে দেখে তার ভয় আজও গেল না। ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে থাকে মানুষটার কাছ থেকে। এত গম্ভীর হয় মানুষ! আর এত কাজ থাকে তার! সারাটা দিন বাইরে বাইরেই কাজ। সেই সকালে উঠে বেরিয়ে যান আর কত রাতে যে ফিরে আসেন ছবি তা এতদিন জানতোই না। জেনেছে কাল।

অনেক রাতে হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল দরজায় ঘা দেবার শব্দে। পিসিমা জোরে চেপে ধরেছে দরজাটা ভেতর থেকে, আঁচলটা লুটোচ্ছে মাটিতে, বুকের কাপড় খসে গেছে।

ওপাশ থেকে কে যেন কি বলছে, জড়ানো জড়ানো স্বরে।

পিসিমা বলছে: না, খুলবো না। এতদিন যা করেছ করেছ—আর নয়, এখন একটা মেয়ে আছে আমার কাছে এটা মনে রেখ। এত রাতে কেলেঙ্কারী কোরো না।

তবু সেই জড়ানো গলার মিনতি শোনা গেল বারকয়েক। দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দটা যত জোর হোল তত জোরে পিসিমা চেপে ধরল দরজা। তারপর কে যেন মানুষটাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল, সেই জড়ানো গলার স্বর আস্তে আস্তে দূরে চলে গেল। তখনও পিসিমা তেমনি দাঁড়িয়ে।

তারপর হঠাৎ আলো জ্বালা ঘরের দিকে পিসিমার চোখ গেল, চোখ গেল ছবির দিকে। সুকুমারী ছুটে এসে আলো নেভালো। ছবিকে দু হাতে টেনে তুলে ধরে নিজের বিছানায় নিয়ে গিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে কটা কথাও বলেছিল: তুই আমার আড়াল হয়ে থাক, ছবি। আমাকে একটু ভালবাসিস।

ভয়ে, আতঙ্কে শক্ত হয়ে গিয়েও, সেই জড়ানো গলার স্বরটা পিসেমশাই-এর বলে চিনতে পারার পরেও সে কিছু জিজ্ঞেস করেনি পিসিমাকে—একটা কথাও বলেনি।

কিন্তু এই প্রথম তার কেমন মায়া হয়েছিল, ভালবাসতে ইচ্ছে করেছিল পিসিমাকে—মাকে ভালবাসার মন নিয়ে। কিন্তু কেমন করে তা বোঝান যায় ছবি তা জানেনি। তাই মাঝরাতের হঠাৎ-জাগা চোখে ভয়ের ঘোরটাই কেবল তার চোখের ঘুম কাড়েনি, কি একটা উপলব্ধিও যেন তার হয়েছিল। মনে হয়েছিল, কোথায় যেন একটা মস্ত ফাঁক আছে পিসিমা-পিসেমশাই-এর মধ্যে। কেউ শান্তি পাচ্ছে না। কারুর সুখ নেই। কিন্তু সে কষ্টটা কিসের—কিসের!

অনেকদিন পরে নিলু তাকে বলেছিল : তোর পিসেমশাই মদ খায় ছবি—জানিস?

মদ খাওয়াটা খুব খারাপ এটা ছবি জানে কিন্তু পিসেমশাই-এর ওপর কিছুতেই রাগ করতে পারেনি সেদিন। কেমন করে যেন তার মনে হয়েছিল পিসেমশাই ইচ্ছে করে খায় না মদ। তবু কেন খায়!

কিন্তু সে সব পরের কথা। সেদিন রাতে অত কথা ছবি ভাবতে পারেনি।

রাতের অত কাণ্ড, সকালে উঠে কিন্তু তার কিছু বোঝা যায়নি। পিসিমা উঠে সংসারের কাজ করছে, পিসেমশাই চা খেতে খেতে কি লিখছেন খাতায়। কোথাও কিছু হয়নি। রাত্রের সব কিছু যেন দুঃস্বপ্ন!

আজ ছবির ইস্কুলে ভর্তি হবার দিন। পিসেমশাই সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন শুনে অসহায় মুখে সে পিসিমার দিকে তাকায়। সুকুমারী বোঝে ব্যবস্থাটা ছবির পছন্দ হয়নি; মাথায় হাত বুলিয়ে বলে : যাও লক্ষ্মী মেয়ে। আমার যে সময় নেই সঙ্গে যাবার।

আসলে ছবি সাহস পাচ্ছে না। এই ধুলো ধুলো বিষণ্ণ শহরটাকে তার যেমন পছন্দ হচ্ছে না, তেমনি কোনও কিছুই না। ইস্কুলের কথা ভাবতেও তার ভয়; কেমন হবে সেটা কে জানে!

ঘোড়ার গাড়িতে উঠে একপাশে সে কুঁকড়ে বসে থাকে আর একটা নাম না জানা ভয় তার সারা শরীর শক্ত করে দেয়।

চমকে ওঠে যখন পিসেমশাই একখানা হাত মাথার ওপর রেখে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেন : ভয় করছে, ছবি?

এই প্রথম কথা পিসেমশায়ের সঙ্গে তার। ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, রাগ নেই তো। অদ্ভুত শান্ত দুটো চোখ মমতা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

: ভয় কি ?—পিসেমশাই বলেন : ওরা যা যা জিজ্ঞেস করবে ঠিক মতো বলতে পারলেই হোল। ইস্কুলে ভর্তি হবার আগে ওরকম ভয় সবারই থাকে।—পিসেমশায়ের সেই শান্ত চোখ আর বলা কথাগুলো ছবিকে হঠাৎ খুশি করে তোলে।

ইস্কুলে ঢুকে সে একেবারে অবাক। এটা নাকি আবার ইস্কুল!- এত বড় বাড়ি, এত বড় বাগান। কত রকমের ফুল ফুটেছে। কী বিরাট মাঠ!

এইখানে পড়তে পাবে সে? কিন্তু যদি ওকে না নেয়? যদি বলে : গাঁ থেকে আসা ছবি এখানে পড়তে পাবে না—কালী পণ্ডিতের পাঠশালায় ফিরে যাক!

আনন্দের সঙ্গে এক অনির্দেশ্য আশংকাও ছেয়ে থাকে মনটাকে। বিরাট লম্বা ঘরখানায় ঢুকে আরও সে হতভম্ব হয়ে যায়। মস্তবড় টেবিলটার ওপাশে ফর্সা, সুন্দর একজন মেয়েমানুষ। তিনি তার নাম জিজ্ঞেস করেন তারপর আর একজনকে ডেকে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেন।

ছবি এবার পিসেমশায়ের মুখের দিকে অসহায়ের মতো তাকায়। অবিনাশ বলেন : যাও ওঁর সঙ্গে, ভয় কি?

না, ভয় নেই। মিনুর মুখে এই সব মেয়েমানুষ মাস্টারমশাই-দের কথা সে শুনেছে। কেউ ফুলদি, কেউ সেজদি—ছোড়দি। কেউ ভাল, কেউ খারাপ। কেউ বকে, কেউ বকে না।

এই দিদিমণি কি ফুলদি? যাই হোন্, মুখখানা ভারি সুন্দর, হাসি হাসি। তিনি একটা খালি ঘরে নিয়ে গিয়ে ছবিকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেন। ভূগোলের প্রশ্ন সে বলতে পারে, বাংলা বানানও লিখতে পারে, ইংরাজী কয়েকটা শব্দের মানেও তার জানা।

সব বলার পরেও তার ভয় যায় না, ভর্তি হয়ে গেছে শুনেও তার বিশ্বাস হতে চায় না।

হেডমিস্ট্রেস অমলা নন্দী বলেন : যাও তো সুধা, ওকে ওর ক্লাসটা একবার দেখিয়ে নিয়ে এস।

ওই তো মিনু! দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে উঠতে যাবে, মিনু দূর থেকে ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে তাকে ইশারা করে। ওরকম করতে সে কাউকে দেখেনি এতদিন কিন্তু মজা লাগে বেশ।

ক্লাস ভর্তি মেয়ে। ফ্রক পরা তার মতো মেয়ে আছে, শাড়ি পরা বড় মেয়েও আছে। অতবড় মেয়েরাও পড়ে!

কি যেন লিখছে সবাই।

তাদের পাঠশালায় কোনও দিন শ্রুতিলিখন আর অংক ছাড়া কিছু লিখতো না তারা—তাও স্লেটে। এখানে খাতায় কালি দিয়ে লিখতে হবে। তার হাতের লেখা যা খারাপ! যদি বকুনি খায়! তা হোক। মিনু আছে এখানে।

ইস্কুল থেকে হাসি মুখে সে গাড়িতে ওঠে।. কিন্তু পিসেমশাই এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন তাকে—এ তো বাড়ির রাস্তা নয়। দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে গেছে, ঘোড়ার খুরের শব্দে গমগম্ করছে সংকীর্ণ জায়গাটুকু। শব্দ উঠছে, ঠক্ ঠক্ ঠকর—ঠক্ ঠক্ ঠকর।

একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থেমেছে। বাড়িটা টালির, সামনে ছোট্ট বাগান। গেট দিয়ে পিসেমশায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও ঢুকতে হয়। একটা কুকুর ছুটে এসে পিসেমশায়ের পায়ের কাছে লুটোপুটি খায়, ঘেউ ঘেউ করে। সে শব্দে সামনের দরজাটা খুলে যে এসে সামনে দাঁড়ায় তাকে ছবির ভারি চেনা চেনা লাগে—তবু চিনতে পারে না। ঠিক এই মুখখানাই কোথায় দেখেছে সে! কোথায়?

ফর্সা রঙ কিন্তু রোগা। কালো পাড়, সাদা শাড়ি পরনে। বিষণ্ণ একখানা মুখ।

এ মুখ বিন্তি পিসির মতো, তেমনি হাসি। কিন্তু বিন্তি পিসি নয়।

এগিয়ে এসে ছবির হাত ধরে মুখখানাকে তুলে ধরে আস্তে আস্তে বলে: এই বুঝি?

বেশ বোঝা যায় এ বাড়িতে পিসেমশাই আরও এসেছেন, নইলে ঘরের মধ্যে পাতা বিছানাটায় কেউ অমন করে শুয়ে পড়ে!

ছবিকে সংকুচিত হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেয়েটা তাকে আদর করে চেয়ারে বসায়।

কে উনি!—চেনে না সে, তবু ভারি ভাল লাগে। কখন একসময়

উঠে গিয়ে মেয়েটা তুটো গ্লাস হাতে করে এসেছে—আদর করে ছবিকে সরবৎটুকু খাইয়ে আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেয়।

পিসেমশায়ের কাছে নিয়ে গেলে মৃদুগলায় তিনি বলেন : খাব না।

: কেন? অত রাগ করছ কেন?

: রাগ? রাগ করতে পারলে তো বেঁচে যেতাম, সরমা। টাকাগুলো ফেরত পাঠিয়ে অমন অপমান করলে তবু রাগ করতে পারলাম কই।

: তবে?

: হিংসে হয়। তোমার মতো ওমনি শান্ত করে রাখতে পারিনে কেন মনটাকে।

: পারবে, চেষ্টা করলেই পারবে। তোমার অমন সুন্দরী বউ, একটা মেয়ে পেয়েছ, আর ছটফট্ করে বেড়ালে চলবে কেন?

: সুন্দরী বউ!—পিসেমশাই হঠাৎ উঠে বসেছেন : জান, কাল ও আমাকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি।

: হয়তো ছাঁই-পাস আবার গিলেছ তাই।

: গিলেছিই তো। এবার জাহান্নামে যাব। তোমার কাছে এলে তুমি কেবল উপদেশ দেবে, ওর কাছে গেলে চুপ করে থেকে ও আমার ভয় বাড়িয়ে দেবে। আমি তবে কোথায় যাব?

: আমার কাছে তুমি কি চাও বলতো?

: কি চাই? কি চাই—, পিসেমশাই যেন দিশেহারার মতো পথ হারিয়ে ফেলেছেন।

: যা চাই তা তুমি আমাকে দেবে, সরমা?

: ছিঃ ছিঃ—, মেয়েটা যেন কেঁপে উঠছে : এই জন্যেই যেদিন ওরা আমাকে এখানে বদলি করেছিল আমার বুক কেঁপে উঠেছিল, আমি আসতে চাইনি। কারুর সংসার আমি ভাঙতে চাইনি। আমার বুড়ো মা, ছোটো ভাই-বোন ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ। বিধবা আমি সে কথা মনে করে আমাকে তুমি ক্ষমা কর। আমাকে ভুলে যাও।

: শুধু ক্ষমা? এবার থেকে তোমাকে ঘেন্না কোরবো, সরমা। কিন্তু শুচিতার বড়াই কোরোনা তুমি। নার্সদের আবার শুচিতা...!

এতক্ষণে ছবির সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে, অদ্ভুত সব কথা! পিসেমশাই এত কথা বলতে পারেন তবে! ওই মেয়েটা বিধবা—নার্স!

কথা বলতে বলতে সরমা বুঝি কেঁদেছিল। এবার সে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সরে দাঁড়ায় একপাশে, কাঁপা গলায় বলে : বেশ, যা ইচ্ছে তোমার বলে যাও আজ, কিন্তু আর এসো না—। আমার ছেলে বড় হয়েছে—তার কাছে আমি আর মিথ্যে কথা বানিয়ে বলতে পারবো না। তুমি কি বুঝবে? তুমি...! তোমাকে দেখলে আমার···। কিন্তু আর এসো না।—সারা শরীর ফুলে ফুলে উঠছে তার কান্নায়। চোখে আঁচল দিয়ে সে ছুটে পাশের ঘরে চলে যায়।

পিসেমশাই খুব চটে গেছেন মুখ দেখে বোঝা যায়। আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে জুতো পরে বেরিয়ে এসে তার হাত ধরে গাড়িতে ওঠেন। হাতখানা ঠাণ্ডা, কাঁপছে অল্প অল্প।

ছবি একবার পেছন ফিরে তাকায়। মনে হয় কার যেন বুক চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে, মনে হয় কে যেন একবার ডাকলো পেছন থেকে। এখনই বুঝি কেউ এসে তাদের যেতে বারণ করবে, এখুনি তার হাত ধরে নিয়ে যাবে ঘরে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেবে। কিন্তু কেউ আসে না। সব ছবির ভুল—কল্পনা। কেউ আসে না। কেবল কুকুরটা গেট পর্যন্ত এসে সমানে লেজ নাড়ে আর ঘেউ ঘেউ করে। ঘোড়ার খুরের টরে টক্ ঠক্-ঠকাস্ ঠকর-ঠকর শব্দগুলোর সঙ্গে বহুক্ষণ পর্যন্ত তার ডাকটাই শোনা যায়।

দরজার সামনে গাড়ি থামার শব্দ পেয়ে পিসিমা এগিয়ে এসেছে—মনে হোল এতক্ষণ দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার দিকে তাকিয়ে।

স্নান করে লাল পাড় শাড়ি পরেছে, কপালে মস্তবড় একটা সিঁদুরের ফোঁটা জ্বলজ্বল করছে, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে রয়েছে সারামুখে। কে বেশি সুন্দর! হঠাৎ যেন সে মুখখানা থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়া যায় না—হঠাৎ মনে হয় দেখে আসা মেয়েটার সঙ্গে এ মুখের কোথায় খুব মিল আছে, কোথায় যেন নেই! সে মুখখানা ভারি বিষণ্ণ—যেন হাসতে পর্যন্ত ভয় পায়। এ মুখখানা গম্ভীর কিন্তু অহংকারী! হঠাৎ ছবির মনে হয় পিসিমা তার নাম শুনতে পেলে রেগে যাবে—কেন মনে হয় তা সে জানে না।

সেই গম্ভীর মুখখানা নিয়েই পিসিমা বাতাস দিচ্ছে পিসেমশাইকে আর তিনি কেমন করুণ চোখে তাকিয়ে আছেন। কি যেন বলছেন পিসেমশাই, সেই গম্ভীর মুখখানায় একটু হাসি ফুটল।

খেতে বসেও পিসেমশাই অন্যমনস্ক, পিসিমা কিন্তু খুশি : সত্যি? মাথার দিব্যি দিয়েছ কিন্তু? রাখবে তো?

: রাখব, রাখব। কিন্তু একবারে যে পারব না—একটু একটু করে ছাড়বো, কি বল?—পিসেমশাই হাসবার চেষ্টা করছেন কথা বলতে গিয়ে, পিসিমাও হাসিমুখে মাথা নাড়ছে।

কিন্তু সেই মেয়েটার চোখের জল মনে পড়ছে ছবির, তার ছুটে চলে যাওয়া মনে পড়ছে। একজন কাঁদলে আর একজনকে কি হাসতে হয়? পিসিমাকে এই প্রথম এত খুশি দেখাচ্ছে!

এখন কি সে সব কথা বলে দেবে? পিসেমশাই তো বারণ করে দেয়নি তাকে।

কিন্তু না! সে বলবে না। পিসিমাকে না! কোনও দিন কাউকে বলবে না সে!

সুকুমারী ছবির মুখের দিকে তাকায় : হ্যাঁরে—তোর কি হোল? ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিস—একটু হাসবি নে? একটু খুশি হবি নে?

চেষ্টা করলে কি হাসা যায়! তার যে হাসি পাচ্ছে না—খুশি আসছে না। কিন্তু হাসলে এমন সুন্দর দেখায় পিসিমাকে এই প্রথম দেখলো ছবি। ও হাসিটা সুখের হাসি। হাসুক পিসিমা! ছবি কোনও দিন সরমা পিসির কথা বলে দেবে না—কোনও দিন না।



বার

মন বসছে। মন ফিরছে।

সুকুমারী ছবির খুশি খুশি মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হবে না খুশি হবে ভেবে পায় না। এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাচ্ছে পুরোন কথা!

সে হয়তো চেয়েছিলও তাই কিন্তু তাই বলে এমন করে ভুলবে! নিষ্ঠুর স্বভাব! এমনি করে যখন ভুলে যেতে পারে নিজের মায়ের কথা তখন সুকুমারীর-ই বা ভরসা কোথায়! চোখের সামনে থেকে সরে গেলে তাকেও ওমনি করে ভুলে যাবে।

ছবির চোখে-মুখে চঞ্চলতা। ন'টা না বাজতেই সে ভাতের তাড়া দেয়। বারে বারে পথের দিকে তাকায় ঝিয়ের আশায়, বারে বারে চুল আঁচড়ায়, বইগুলোকে গোছায়। সে জানে না সুকুমারীর নিঃশব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার কথা। কেন মনটা খারাপ লাগে সুকুমারী নিজেও বুঝি তা জানে না।

ভীরু ভীরু মেয়েটা ক'মাস আগেও কেঁদে কেঁদে বেড়াত এ ঘরে ও ঘরে। মাঝে মাঝে পাশে এসে বসত চুপি চুপি, কি দেখতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার আপনা থেকেই উঠে চলে যেত। রাতে একা শুতে ভয় পাবে বলে তাকে কাছে নিয়ে শুতে চাইলে প্রথমে আপত্তি করত, বালিস আঁকড়ে ঘুমোনর ভান করতো। মাঝরাতে হঠাৎ দেখতো কে যেন গুটিশুটি হয়ে শুয়ে আছে পাশে। রাত আরও গভীর হলে, ঘুম আরও গভীর হলে সেই মেয়েটাই নিজের অজ্ঞাতে কখন তাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরত। সেই মেয়েটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না এখন।

তবু সুকুমারী মাঝে মাঝে পরীক্ষা করতে চায় ছবিকে: মাকে চিঠি লিখেছিস? হ্যাঁরে? সেই কবে চিঠি দিয়েছে বউদি—উত্তর দিলিনে?

ছবি তার বই-তে মলাট দিচ্ছে নিবিষ্ট হয়ে পিসেমশায়ের এনে দেওয়া লাল নীল কাগজে। মুখ নীচু করে সে মাথা নাড়ে।

খুশি হবে কি না সুকুমারী বুঝতে পারে না : এমন করে ভুলে যাচ্ছিস তুই? আর তো বলিসও নে কারুর কথা? তোরা সব কাদার তাল—।

পিসিমা কি মনে করাতে এসেছিল, না কি বকে গেল তাকে! ভুলে যাচ্ছে! ছবি নাকি ভুলে যাচ্ছে!

একটা মুহূর্ত ছবির বই ধরা হাতখানা আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তার নীচু করা মুখখানা কালো হয়ে ওঠে, কয়েক ফোঁটা জল বই-এর খস্‌খসে পাতার ওপর পড়ে মিলিয়ে যায়। কে জানে সে কথা! সবাই জানুক ছবি ভুলে গেছে কিন্তু সে তো জানে সত্যি কথাটা।

আরও বেশি করে সে মাকে ভাবে, ভাবে বাবাকে, মণিদাকে, সবাইকে—সব্বাইকে।

মা মিলে গেছে আর সব চেহাবার মাদের সঙ্গে, বাবার চেহারা ভাবতে গেলেই রোজ দশটায় ছেঁড়া ছাতা হাতে তালি মারা ধুতি পরা নিলুদের বাবার চেহারাটাই কেবল ভেসে ওঠে। মণিদাকে ভাবতে গেলে মিনুর দাদার কথা মনে পড়ে। তার গাঁ মিলে গেছে শহরের সঙ্গে—এই লাল ধুলোর দুঃখ দুঃখ মুখ করা শহরটার সঙ্গে। সব একাকার। ছবি আর কাউকে আলাদা করে ভাবতে পারে না! দুর্গা, উমা, বাসন্তীকে ভাবতে গেলে স্কুলের মেয়েদের মুখ দেখে সে, সেফুকে ভাবতে গেলে ও বাড়ির পিলুর কথা মনে হয়।

চোখের জল রগড়ে সারা মুখময় মাখিয়ে ফেলতে ফেলতে নিজের মনে বিড় বিড় করে : আমি তো ভুলতে চাইনি, আমি চাইনে ভুলতে।

তার কান্নাভেজা মুখখানা তুলে ধরে সে যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে সবায়ের কাছে—যেন সবাই এসে দাঁড়ালো এইমাত্র।

কিন্তু সে কটা মাত্র মুহূর্তের ব্যাপার। বাইরে স্কুলের ঝিয়ের তারস্বর চেঁচানি তাকে সজাগ করে তোলে। সে খুশি হয়ে উঠে।

খুশি হয়ে ওঠে সব মেয়েদের সঙ্গে বই খাতা নিয়ে যেতে যেতে। খুশি হয়ে ওঠে চটিতে ধুলো ছিটিয়ে আর মেয়েদের সঙ্গে হো হো হি হি করে হাসতে। ভাঙা পাহাড়ের মাঝখানকার সরু পথটা তাদের

সে হাসিতে ঝন ঝন করে বাজতে থাকে। পাহাড়ের গা থেকে বুনো ফুলগাছের লতান ডাল ধরে টেনে দেয় কেউ, কেউ ফুল ছেঁড়ে, বড় মেয়েরা চেয়ে নিয়ে খোঁপায় পরে, আবার সেটা কখন হয়তো পড়ে যায় সে খেয়ালও কেউ করে না। চেঁচিয়ে কথা বলে। সামান্য কথা, সামান্য ব্যাপার কিন্তু কথার চেয়ে হাসি বেশি, হাসির চেয়ে হুল্লোড় বেশি। সব ওই রাস্তাটুকু।

তারপর ঢোক ইস্কুলের মস্তবড় কাঠের গেটের হাঁ-করা মুখের মধ্যে দিয়ে। সবাই চুপ। একটা কথা নেই, হাসি নেই। কেবল মেয়েদের চটির খস্‌খস্‌ শব্দ, জুতোর খট্‌মট শব্দ। কে যেন জোর করে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে সবায়ের। সে কে!

কে আবার? জানে না যেন! হেড্‌মিস্‌ট্রেস অমলাদি যে নিজে দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়, মেয়েদের লাইন করা হলে তবে যাবেন।

লাইনে দাঁড়িয়ে এ ওর গায়ে ধাক্কা দেয়, কানের কাছে মুখ নিয়ে কে কাকে কি যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতে যায়। কে শব্দ করছে! হিস্‌—স্‌—স! অমলাদি নিজে ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রেখে বোঝাতে চাইছেন—চুপ কর মেয়েরা। চুপ কর।

তারপর ক্লাসে ঢোক। দরজা পর্যন্ত সবাই শান্ত, সবাই ভাল। তারপর —হুড়মুড়, দুপদাপ্‌, খট-খট। তারপর আবার চুপ। উঠে দাঁড়িয়েছে সবাই। হাসি হাসি মুখটা দরজা ছেড়ে এসে চেয়ারে বসেছে—সুধাদি।

অত চুপ নয়, অত ভয় নয়! ও যে সুধাদি, ভাল দিদি।

আজ ছবি পাহাড়ের গা থেকে ঝুঁকে পড়া ডালের ফুলটা দেবে সুধাদিকে। অনেক মেয়ে দেয়—সে কোনও দিন দেয়নি।

কাঁপা কাঁপা হাতে ফুলটা নিয়ে সে টেবিলে রাখে। নাম' ডাকতে ডাকতে সুধাদি একবার আঙুল দিয়ে নাড়ে, হাসিমুখে বলে: ফুল! তোর মতোই বুনো, না রে ছবি?

আরও একদিন সুধাদি তাকে ওই কথা বলেছিল। কেন যে তাকে বুনো বলে সে জানে না। একদিন একা পেলে সে জিজ্ঞেস করবে। ফুলটা না দিলেই হোত। বুনো! দিয়ে এখন লজ্জা করছে।

মিনু বলে: কি বললেন রে তোকে আস্তে আস্তে?

ছবি উত্তর দেয় না—চুপ করে থাকে।

টিফিনের সময় দপ্তরীর ঘরের পাশে জল খেতে যায় সে আর মিনু দুজনেই। সেখানে বাদাম গাছতলায় সুধাদি বসে বসে বই পড়ছে। তাদের দেখে মাথা তুলে একটু হাসে দিদি: কি রে, কি চাস? টিফিন খাস্‌নি?

সুধাদি একটা ইংরিজী বই পড়ছেন। অনেক লেখা-পড়া শিখলে ওরকম বই পড়া যায়! ছবিও একদিন পড়বে কিন্তু আজ তার অন্য চিন্তা। হঠাৎ বলে: আমাকে বুনো বললেন কেন তখন?

ভাবে, সুধাদি হয়তো বিরক্ত হবেন তার প্রশ্ন শুনে কিন্তু আশ্চর্য, হাসছেন!

শব্দ করে হেসে উঠে সুধাদি বলে: ওমা, কখন কি বলেছি সেই কথাটাই তুমি মনে করে রেখেছ মেয়ে? বুনো বললাম কেন? তুমি যে বুনোদের মতোই সরল, ছবি—এখনও গ্রামের গন্ধ গা থেকে মেলায়নি। অন্য সব মেয়েদের মতো তো হতে পারনি এখনও। শহুরে ভাষায় তাকেই বলে বুনো।—গায়ে হাত বুলিয়ে একটু আদর করেও দেয় সুধাদি।

এ কথায় মনটা খারাপ হয় কিন্তু রাগ হয় না। রাগ হয় অন্য ব্যাপারে। এখনও অনেক মেয়ে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। মটোরে আসা জজসাহেবের মেয়ে, শহরের সবচেয়ে বড় উকিল প্রতুলবাবুর মেয়ে আর তাদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ানো মেয়েরা তাকে নিয়ে রসিকতা করে। নতুন নতুন মিথ্যে কথা বানিয়ে বললে—ছবি তা বিশ্বাস করতেই নিজেরা হেসে গড়াগড়ি খায়: কী বোকা ভাই মেয়েটা! কী বোকা!

কিন্তু ওরাই তো আর সব নয়। আরও মেয়েরা আছে যারা ওরকম নয়। মিনু আছে, মল্লিকা আছে, নিভা, শান্তা, বেবি আছে—ওরা ছবির বন্ধু।

জজসাহেবের মেয়ে ঠাট্টা করলে তার সঙ্গে ঘোরা মেয়েরাও ইচ্ছে করে করে হাসে। কিন্তু সে মটোরে উঠে ধুলো উড়িয়ে চলে যায় যখন তখন তো তার পেছন পেছন ঘুরে বেড়ানো মেয়েদের নেয় না? যেতে তো হয় সেই ঝি-য়ের সঙ্গে, নয়তো বাড়ির চাকরের সঙ্গে একা একা গোমড়ামুখে।

আর ছবিদের দলটা তখন ভারি। সারা রাস্তা তারা গল্প করতে করতে হাঁটে। মাঠের খেলায় তারা থাকে এক, দোলনায় চড়বার সময় তারা এক।

জজসাহেবের মেয়েকে অমলাদি খুব ভালবাসেন—সব বড়লোকের মেয়েদেরই ভালবাসেন। সরকারী কলেজের সাহেব প্রিন্সিপালের বাঙালি বউ-এর মেয়েকে, ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়েকে—সবাইকে। ওদের কারুর শরীর খারাপ হলে অমলাদি ব্যস্ত হয়ে পড়েন, নিজে কোলে করে দোতলার ঘরে শুইয়ে দিয়ে আসেন। স্কুল ছুটি হয়ে গেলে ওরা মটোরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকেন। ওদের টিফিন খাবার ব্যবস্থা তাঁর ঘরে। ছবি দেখেছে, বড় বড় ক্লাসের মেয়েরা এ কথা নিয়ে হাসাহাসি করে। একদিন ফিস্ ফিস্ করে কে যেন বলছিল: এমন বড়লোকের পা চাটা ভাই অমলাদি।

কিন্তু ছবিদের ভালবাসে সুধাদি। বুনো বললে সুধাদির কথায় তাই একটুও রাগ হয় না কিন্তু ওই মেয়েগুলোর কথা সহ্য করা যায় না কিছুতেই।

সে বুনো থাকবে না। তার সেই ঘাড় বাঁকানো ভাবটা ফিরে আসে। আর বুনো থাকবে না সে!

ছুটির পরে বাড়ি ফিরবার পথে বিস্কুটের দোকানের সামনের ছোট কাঠের গোলটার ওপর হঠাৎ আজ দেখা হয়ে যায় নিলু আর পিলুর সঙ্গে। এ কদিনও দুএকবার দেখা হয়েছে কিন্তু ছেঁড়া ছেঁড়া দেখা।

কথা হয়নি—হয় ওরা সাহস করেনি নয়তো তারই সাহস হয়নি পিসিমার জন্যে।

ঠিক সেদিনকার দুপুরের মতো ছেঁড়া জামা গায়ে—ঝুল ঝুল করা ছেঁড়া! খালি পায়ে এক পা ধুলো, খোলা লাল লাল একরাশ চুল, হাতে দুটো করে রঙ-ওঠা রবারের চুড়ি। ওরা দুবোনে গোলের একপাশে ভয়ে ভয়ে সরে দাঁড়িয়ে মেয়েদের পথ করে দিয়ে আগ্রহভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে দলটার দিকে। পথ না করে দিলে এখুনি যেন মেয়েরা বকে উঠবে ওদের। একজনের হাতে ছোট

একটা তামার ঘটি, আর একজনের হাতে শালপাতায় জড়ান কি যেন।

মেয়েরা যেতে যেতে ওদের দিকে কেউ তাকায়, কেউ তাকায় না। কেবল ছবি চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় পাশ ঘেঁসে। মেয়ে দুটো যেন চমকে ওঠে। রঙ-বেরঙের ফর্সা জামা-কাপড় পরা, বই-খাতা হাতে করা মেয়েদের মধ্যে থেকে কেউ এসে ওদের পাশে দাঁড়াবে এটা যেন কল্পনাই করেনি। ভারি খুশি মুখে ছবির দিকে তাকিয়ে নিলু বলে : তুমিও কুমুদিনীতে পড় না? জান রোজ তোমাকে আমরা দেখি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে—ঝি-য়ের সঙ্গে যাও যখন।

: তোমরা পড় না?—ছবি জানতে চায়! ঠোঁট উল্টে বড় মেয়েটা বলে : কি করে পড়বো বল? আমি কিছুদিন পেরাইমারীতে পড়েছিলাম—পিলুটার তাও হোল না। বাবা বলে আমাদের বই কিনে বাড়িতে পড়াবে। মা বলে, কি হবে পড়ে? তার চেয়ে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দে। মুহুরীর মেয়ের আবার অত শখ কেন?

: মুহুরী কি?

: বা রে, জান না? উকিলের মুহুরী যে আমার বাবা—। আমাদের তো কতদিন চালই থাকে না। খিদে পেলে মা বলে, মর সব! পিলুটাকে তো দিয়ে দিতে চেয়েছিল—নেয়নি তোমার পিসিমা। সেইজন্যে তো মা'র অত রাগ দেখলে না? আমার ছোটো ভাইটার কবে থেকে অসুখ—এখন আর ডাক্তার আসে না। এখন ঠাকুর বাড়ির চন্নামেত্ত খায় ভাই আনতে গিয়েছিলাম আখড়ায়। মা বলে ওতেই ভাল হবে! বাবা বলে, ও মরবে—। —হাতের ঘটিটা দেখিয়ে ছবির কৌতূহল নিবৃত্ত করে মেয়েটা।

পিলু বলে : তুমি সেদিন খুব রাগ করেছ না? দিদি আর আমি তারপর ভাব করতে কতবার তোমাদের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছি—যদি বকে তোমার পিসিমা। তুমি যাবে আর একদিন? আর মা কিছু বলবে না।

ছবি বলে : যাব।

নিলু জানতে চায় : আচ্ছা ভাই, ইস্কুল থেকে ফিরে তুমি কি খাবে?

পিসিমা ছবিকে গরম গরম লুচি ভেজে দেয় শুনে নিলু একবার

জিভ দিয়ে, শুকনো ঠোঁট চেটে নেয়, পাশে পাশে চলা ছোটো বোনটা ছবির মুখের দিকে লোভীর মতো তাকায়। নিলু তখনও নিজের মনে গুন গুন করে বলে চলে: আগে যেতাম ও-বাড়ি—অনেকদিন আগে। তখন মাঝে মাঝে তোমার পিসিমা আমাদের লুচি দিত—খাবার দিত। কিন্তু এখন দেখতে পারে না। গেলেই বকে—। কিন্তু আমি তো—। —অনির্দিষ্টভাবে ছেঁড়া ছেঁড়া খাপছাড়া কথাগুলোর মাঝখানেই হঠাৎ সেদিনকার মতোই চুপ করে যায় সে। কি একটা কথা সে বলতে চায় না আজও।

ছোটো বোনটা হঠাৎ একসময় ম্লান গলায় বলে: আমার একটাও পুতুল নেই জান! একটা চারপয়সা দামের কাঁচের পুতুল ছিল তাও ভেঙে গেছে।—কেন হঠাৎ ও কথা বলে কে জানে কিন্তু ছবির চোখ ছলছল করে। তার তো অনেক পুতুল আছে—সে খেলেও না। মেয়েটার ছেঁড়া ঝুলি ঝুলি জামাটা দেখে মনে পড়ে, তার এর মধ্যেই কতগুলো জামা জমে গেছে। সেখান থেকে তো কিছু ওদের দিতে পারে—ওদের যে কিছু নেই! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে যেন তার মনে হয়, না, দেওয়া যায় না। ও সব জিনিষ তার দেবার জো নেই। ভাল না লাগলেও রেখে দিতে হয়—ইচ্ছে না থাকলেও থাকতে হয়! পিলুর বড় বড় করুণ চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে মনে হয়: পিসিমা কেন নিল না ওকে! তার চেয়ে কত—কত সুন্দর, আর কত শান্ত মেয়েটা! ওকে পিসিমা যদি নিত তবে তো তাকে আসতে হোত না—মন কেমন করা কান্নায় মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা উথলে উঠতো না।

অন্যমনস্ক হয়ে কখন ওদের বাড়িতেই সে ঢুকেছে বুঝতে পারে নি। তাকিয়ে দেখে ঠিক তেমনি তুলো ওড়া, ধুলো ওড়া ছেঁড়া লেপ-তোষক ছড়ান ঘর। সেদিনকার চেয়েও বেশি। তার মধ্যে সেদিনকার দেখা মা স্থির হয়ে বসে আছে একটা হাড় জিরজিরে ছেলে কোলে করে। ছেলেটার চোখ দুটোও নিলুর আর পিলুর মতোই বড়—দেখতে সুন্দর ছিল বোঝা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে ওকে কেমন ভয় করে ওঠে ছবির হঠাৎ। চোখের তারা মাঝে মাঝে স্থির হয়ে যাচ্ছে বড় বড় নিঃশ্বাসের বেগে। বুকের পাঁজরা ওঠা-নামা করছে ঘন ঘন।

সেন্টুর ছোটো ভাই যখন মারা যায় তখন সে ওমনি চোখের দৃষ্টি দেখেছিল তার—ওমনি বারে বারে তার ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছিল। নিলু পিলুরা কি কিছু বুঝতে পারছে না—বুঝতে পারছে না ওদের মা! ঝুঁকে পড়ে ছোটো ঘটি থেকে কয়েক ফোঁটা জল ঝিনুকে করে তার মুখের মধ্যে দিলে ছেলেটা আকুল আগ্রহে তা গিলে ফেলে। তার গলার মধ্যে থেকে কেমন একটা শব্দ উঠছে। আতংকে, আশংকায় ছবি একেবারে অবাক হয়ে নিলুর মায়ের নির্বিকার মুখের দিকে তাকায়। কই, কাঁদছেন না তো একটুও। বরং ছবিকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছেন, কাছে সরে গেলে ভাঙা ভাঙা মিনমিনে গলায় বলেন: বোস। সেদিন কি বলতে কি বলেছি—কিছু মনে কোরো না তুমি। তার শাস্তি হচ্ছে দেখ—, ছেলের দিকে আঙুল তুলে দেখান, কিছু বোলো না মা তোমার পিসিকে। রাগ করে হয়তো উঠিয়ে দেবে শেষে—আজ এক বছরের ভাড়া বাকী! উঠিয়ে দিলে তো কিছু করবার নেই আমার। বলবে না তো?

সেই স্থির নিষ্ঠুর দৃষ্টি এখন করুণ হয়ে তাকিয়ে আছে ছবির মুখের দিকে। কোলের ওপর খাবি খাওয়া ছেলেকে নিয়ে দুঃখ নেই—ভয় নেই। ভয় উঠিয়ে দেবার।

হঠাৎ কেমন কান্না পায়। কোন্ কথার উত্তরে মাথা নাড়ে, না বুঝেই সে অনির্দিষ্টভাবে এদিক-ওদিক মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে আসে।

সে তো সেদিনকার কথা কিছুই বলেনি পিসিমাকে। গরীব বলেই কি পিসিমা ঘেন্না করে ওদের? ওরা ছেঁড়া জামা পরে থাকে—ধুলো মেখে থাকে বলে? কিন্তু সে তো ওদের দোষ নয়। ওদের বাবা যে উকিলের মুহুরী। মুহুরী হলে লোকে যে গরীব হয়—ছবি তা এই প্রথম দেখলো।

খুব নিঃশব্দে বাড়ি ঢোকে। রান্নাঘরে পিসিমা খাবার করছে।

সুকুমারী বলে: এত দেরি করলি কেনরে ছবি? আজ না শনিবার?

বই নিয়েই পিসিমার পাশ ঘেঁসে বসে পড়েছে তৎক্ষণে। ঘিয়ের গন্ধটা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে—নিলু, পিলুরাও কি পাচ্ছে?

ভাবতে গিয়ে তার চোখে জল আসে। গরম গরম ভেজে রাখা লুচিগুলো দেখে তার আর অন্যদিনের মতো আনন্দ হয় না একটুও।

কানের মধ্যে বাজছে ছোটো ছেলেটার বড় বড় নিঃশ্বাস নেবার শব্দটা—যা কানে গেলে বুকের মধ্যেটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

দুএকবার পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে ছবি। সুকুমারী বলে: বই-পত্তর শুদ্ধুই রান্নাঘরে বসলে। হাত-মুখ ধুয়ে এসো—ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে সব।

তবু ওঠে না। তার ঠোঁট কাঁপে, শেষে একসময় বলে: নিলু, পিলুদের এ বাড়িতে ঢুকতে দাও না কেন পিসিমা?

সুকুমারী স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে এক মুহূর্ত, তারপর গম্ভীর গলায় বলে: তুমি বুঝি আবার গিয়েছিলে ওদের বাড়ি? সে কথাও শোনা হয়ে গেছে তোমার? জানিস কেন ঢুকতে দিই নে? লোক ওরা ভাল নয়। বড় মেয়েটা কোথায় চলে গেছে কার না কার সঙ্গে। ওই নিলু মেয়েটা যেমন লোভী, তেমনি চোর। দু'তিনবার আমার কাপড়, মাথা'র তেল চুরি করেছে। পাউডার, সাবান যে কত চুরি করেছে তার তো ঠিক নেই। তবু কিছু বলিনি—অভাবে স্বভাব নষ্ট! চেয়ে নিলেই তো পাবিস! তারপর আবার ছুঁড়ির যা কাণ্ড—ওই হরনাথের মেসে.......হঠাৎ কথা থামিয়ে, প্র· মকে ওঠে সুকুমারী: থাক, অত কথায় তোমার দরকার নেই। ছোটো মেয়েরা হবে নিষ্পাপ, নির্মল। তোমাকেও আমি তেমনি দেখতে চাই, ছবি।

ছবি হঠাৎ পিসিমার হাত ধরে মিনতি করে: কিন্তু পিলু, ও তো কোনও দোষ করেনি। ওকে একটু আসতে দিও, খেলতে দিও আমার সঙ্গে।

সুকুমারীরও গলা কেমন করুণ হয়ে ওঠে: খেলো কিন্তু ঘর-টরে নিও না ওদের। ভাল পুতুল-টুতুলও বাইরে নিও না। ওই ছোটো মেয়েটাকে আমিই কি কম ভালোবাসতাম! অমন সুন্দর দেখতে কিন্তু ধুলো-কাদায় কি যে হয়ে থাকে। দিতে তো চেয়েছিল কিন্তু সাহস হোল না—কে জানে যদি....।

পিসিমার সব কথা ছবির কানেও যায় না। পিসিমা খেলতে বলে দিয়েছে, তা হোলেই হোল। পিলুকে নিয়ে প্রথমে খেলা শুরু করলে নিলুও আসবে। একদিন দুদিন হয়তো বকবে পিসিমা—তারপর আর কিছু বলবে না।

নিলু নাকি চোর! ধ্যেৎ, ওসব বাজে কথা। ছবির যে বন্ধু হবে সে চোর হবে না।

ছবিকে হঠাৎ অবাক করে দেবার ভঙ্গিতে সুকুমারী বলে: খেয়ে চট্‌ করে চুল-টুল ভালো করে আঁচড়ে নাও গে ছবি। আজ এক জায়গায় যেতে হবে।

: কোথায় পিসিমা? কোথায়?

: বায়োস্কোপে। দেখেছিস কোনও দিন—বায়োস্কোপ আজ যাচ্ছ, আর ন'মাসে, ছ'মাসে যাবে।' ছোটদের দেখতে নেই ওসব জিনিস—।

কেন দেখতে নেই কে জানে! তা জানবার দরকার নেই কিন্তু আজ তো যাবে। ছবি হঠাৎ টান টান হয়ে ওঠে খুশিতে। সে কখনও দেখেনি বায়োস্কোপ।

একবার তাদের গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরের গঞ্জে এসেছিল বায়োস্কোপ—তাঁবু খাটিয়ে তারা দেখিয়েছিল ছবি। সে যেতে পায়নি। মণিদা দেখে এসে গল্প করেছিল, কাপড়ের গায়ে লোকে হাঁটে, চলে, কথা বলে মারা-মারি করে।

মিনুর কাছে গল্প শুনেছে—এখানে তাঁবুতে হয় না। মস্তবড় বাড়িতে পর্দার গায়ে হয়, গদি আঁটা চেয়ারে বসে সে ছবি দেখতে হয়।

দেখে এসে অনেক রাত পর্যন্ত কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না ছবির চোখে। সে একেবারে মুগ্ধ অভিভূত হয়ে গেছে। তার মনের গোপন কোণে একটা আশা তৈরী হচ্ছিল এতদিন ধরে, সুধাদিকে দেখার পর থেকে। সে ওমনি একজন দিদিমণি হবে। কিন্তু আজকের সন্ধেবেলাটা তার সব চিন্তাকে উল্টেপাল্টে দিয়েছে।

ওইরকম হওয়া যায় না? ওইরকম! ওই মেয়েটার মতো! যার কথায় মেয়েরা শব্দ করে কাঁদছিল—পিসেমশাই পর্যন্ত রুমাল দিয়ে চোখ মুছছিলেন মুখ ফিরিয়ে। অন্ধকারের মধ্যেও সবাইকে সে তীক্ষ্ণ চোখে দেখেছে—সে নিজে কাঁদেনি কিন্তু অনেকগুলো ফোঁপানির শব্দ, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলার শব্দের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থেকে মনটা কেমন উদাস হয়ে গেছে তারও।

ওইরকম ক্ষমতা চাই! স্বপ্নের মধ্যেও সে বিড় বিড় করে, ওইরকম হতে চাই আমি!

কিন্তু স্বপ্ন সত্যি হয় না। আচমকা ঘুম ভাঙা ছবি হঠাৎ অনুভব করে পিসিমা বিছানায় নেই। দরজাটা খোলা। কে যেন কাঁদছে—তীক্ষ্ণ, তীব্র চীৎকারে রাতের নিস্তব্ধতাকে চিরে চিরে দিয়ে কার একটানা কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কে সে! সে কি পিসিমা! কে কাঁদছে অমন বুকফাটা কান্না?

হঠাৎ! হঠাৎই মনে হয় নিলু, পিলুদের কথা—বিকেলে দেখা ভাইটার কথা। কোলে কোরে বসে থাকা নির্বিকার মুখখানা!

কিন্তু দরজা পর্যন্ত এসে আর এগুনো যায় না। সুকুমারী এসে হাত ধরে আবার ঘরে নিয়ে আসে: ওদের ছেলেটা মারা গেল—! কিন্তু তুই কোথায় যাচ্ছিস?—পিসিমার চোখে জল টলটল করছে: পিসেমশাই গেছে, বিধু গেছে। যা করবার ওরাই করবে। তুমি যেও না, ছবি। কি দেখবে—দেখবার কিছু নেই!

ছবি ছেলেটাকে দেখতে চায় না। ওর চেয়ে অনেক সুস্থ-সবল শরীর নিয়ে মারা গিয়েছিল সেফুর ভাই। ওই কংকালসার চেহারা দেখলে দুঃখের চেয়ে আতঙ্ক হবে বেশি। সে শুধু দেখতে চায় নিলুদের মা-কে। ওই স্থির, নিষ্ঠুর চোখ ছাপিয়ে জল পড়ছে! সত্যিই তবে প্রাণ আছে—কাঁদতে জানে ছেলে মরে গেলে, যেমন করে কাকীমা কেঁদেছিল!

কিন্তু পিসিমা যেতে দেয় না।

ছবির ভারি সুন্দর স্বপ্নটা নষ্ট হয়ে গেছে কান্নায়। বায়োস্কোপ দেখতে গিয়ে অনেক চেষ্টাতেও চোখে জল সে আনতে পারেনি কিন্তু এখন তার চোখ ছাপিয়ে জল আসছে। সহজে—অনায়াসে।

তের



স্কুলে মিন্নুর সঙ্গে ছবির বেশি ভাব সে কথা সবাই জানে—সব মেয়েরা। বেবীর সঙ্গেও একেবারে কম ভাব নেই এ কথাও সবাই জানে। কিন্তু আজ আর এই মুহূর্তে বেবীর সঙ্গে ভাব রাখতে ইচ্ছে করছে না মিন্নুর চোখের জল দেখে।

বড় ঝগড়াটে মেয়ে বেবীটা! খেলতে গিয়ে কত কিছু হয়—তাই বলে ঝগড়া করতে হবে! হাডু-ডু খেলতে গিয়ে মিন্নু নাকি দম ছেড়ে দিয়ে আর একবার একদম নিয়েছে বেবীকে ছুঁয়ে দেবার আগে, স্বচক্ষে দেখেছে সে। মা কালীর নামে দিব্যি করে সে কথা বললেও মিন্নু কিছুতেই তা মানে না। সে বলছে সে দম নেয়নি। বেবী রেগে আগুন হয়ে বলে: তা মানবি কেন! মা কালীর দিব্যি দিলাম তাও মিথ্যে বলছি আমি? বলবি নে কেন? আমাদের মা কালীকে তোরা মানিসনে তো—তাই গায়েও লাগে না। তোরা যে খৃস্টান্, তোদের ছুঁলেও আমাদের জাত যায় জানিস—,—এ কথা শুনে মিন্নু হঠাৎ কেঁদে ছুটে পালায়। বলে: দাঁড়াও, আমি অমলাদিকে বলে দিচ্ছি—।

বেবী বলে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে: বল্‌গে যা বল্‌গে—তোরা যে আবার দুজনেই এক কিনা!

স্বভাবতই খেলা আর জমে না। যারা এ ঝগড়ায় অংশগ্রহণ করেছিল, যারা করেনি, সবাই একে একে সরে যায়। কেবল অত-বড় মাঠটার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে ছবি। আর খানিকটা ভয় পাওয়া, খানিকটা জেদী, হিংসুটে হিংসুটে ভাব করে তখনও দাঁড়িয়ে থাকে বেবী।

বেবী একগুঁয়ের মতো তার হাত ধরে টেনে বলে: দোলনায় চড়বি, ছবি? বলতে গেল! ওঃ ভারি তো ...... বল্‌গে না .....। যা সত্যি কথা তা বললেই—। বয়ে গেছে, দিক না নালিশ করে।

কিন্তু বেশ বোঝা যায় সে ভয় পেয়েছে। অমলাদিকে বলে দেবার ভয়টা এখন তাকে আস্তে আস্তে পাংশু করে দিলেও সে সেটাকে চাপ দেবার চেষ্টা করে আবার ছবির হাত ধরে টানে : আয় না ভাই! এখুনি তো ছুটির ঘন্টা পড়বে—গোণা দুটো ঝুল খেয়ে যাই।

: না। এতক্ষণ, এতকাণ্ডের পরে ছবি প্রথম কথা বলে : না, তুই কেন ওকে অমন করলি। মা কালীকে সবাই মানে জানিস—নিশ্চয়, ও দম নেয়নি তাই........।

: নারে না,—বেবী যেন গোপন কথা বলার মতো করে কাছে এগিয়ে আসে : ওরা আমাদের ঠাকুর মানবে কি! ওরা যে খৃস্টান, জানিস নে?

না। ছবি তা জানত না। জানে না। আজ জানলো। জেনে তার আর বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। সে চিরকাল জানে খৃস্টান হয় সাহেব-মেমরা, তারা জাত মানে না—ম্লেচ্ছ! তাদের ছুঁলে জাত যায়। খৃস্টানরা এক অদ্ভুত মানুষ, সাহেব-মেমরা সেজন্যেই তো অদ্ভুত—তাদের সম্বন্ধে কত মজার গল্প শুনেছে সে, অবিশ্বাস্য কিন্তু মজার! তারা হাত দিয়ে খেতে জানে না, তারা জুতো পরে বিছানায় ঘুমোয়, তাদের ভাষা বোঝা যায় না—খৃস্টানরা এমনি মজার!

কিন্তু সাহেবও নয়—মেমও নয়, কালো কটকটে তারই বয়সী মিনু, তার মতো বাংলা কথা বলা, তার মতো হাত দিয়ে টিফিনের সময় রুটি ছিঁড়ে খাওয়া মিনুটা—সেই কিনা খৃস্টান! খৃস্টান সেই স্টীমারে দেখা, ভুলতে না পারা, চশমা চোখে অন্যমনস্ক ছেলেটাও! তাদের মা!

তার এতদিনের বন্ধু মিনু খৃস্টান! তার ভাই অসীমদা খৃস্টান! কই কখনও তো মনে হয়নি—কোথাও অস্বাভাবিক লাগেনি মিনুকে তার চেয়ে, বরং আরও ভালবাসতে ইচ্ছে করেছে তাকে, আরও—আরও।

ছুটির ঘন্টা পড়তে বেবীও দৌড়য়—সে হয়তো এখন ভিড়ের মধ্যে মুখ লুকিয়ে পালাবে। কিন্তু ছবিকে আশ্চর্য করে দিয়ে গেছে। ক্লাসের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে গিয়ে কখন একসময় মিনুর সঙ্গেই প্রায় ধাক্কা খায় ছবি। তার বইগুলো আলাদা করে দিতে দিতে মিনু বলে : বাবা! কি করছিলি রে মাঠে বসে? ঘন্টা শুনিসনি?

মিন্নুর চোখদুটো তখনও ছলছলে কিন্তু মুখের হাসিটুকু আগের মতোই।

: অমলাদিকে বলিস্‌নি ?—ছবি জানতে চায়।

: না থাক্‌গে—কি হবে বলে। বেবীটা ঝগড়াটে সে কথা সবাই জানে। বলে দিলে তো শান্তি পাবে।

এত ভালো মিন্নুটা! ছবির বন্ধু সে শুধু সেজন্যে নয়—মিন্নুর জন্যেই মিন্নুকে ভালো লাগে।

: চল্‌।

: চল্—, ছবিও বলে কিন্তু পরক্ষণেই সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় : চল্‌, তোদের বাড়ি যাই। নিয়ে যাবি ভাই ?

: তোর পিসিমা যদি বকেন ?

: কেন ?—প্রশ্নটা করে ছবি নিজেই কেমন লজ্জা পায়, তারপর জোর করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে : বকুগ্‌ গে, চল্‌। মিন্নু, তোদের ঠাকুরকে দেখাবি কিন্তু।

চলতে চলতে খানিকটা দল ছাড়া হয়ে, দুজনে অনর্গল কথা বলতে বলতে যায়। মিন্নু বলে : জিশু ছাড়া তো আমাদের ঠাকুর নেই ভাই। জানিস্‌—জিশুকে ওরা ক্রুশিফাই করেছিল ? কিন্তু মহাপুরুষদের কখনও মৃত্যু হয় না, ওরা কেবল শরীরটাকে মারতে পারে।

: ক্রুশিফাই কি ?—ছবি একেবারে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।—: সত্যি মরেননি তবে ?

: দেখবি—চল্‌। আমাদের বাড়িতে একটা ছবি আছে। কথাটা শেষ করে মিন্নু একবার আড়াআড়ি করে বুকে হাত রাখে। তা দেখে ছবি ফিক্‌ করে হাসে : ও কি রে ? ওরকম করলি কেন ?

: যাঃ!—খুব লজ্জিত মুখে মিন্নুও হাসে : করতে হয় যে। তুই ভাই দাদার মতো। দাদাও ওমনি, চার্চে যদিও বা যাবে কখনও উপাসনা করবে না, উপাসনা যদিও বা করবে তো কখনও বাইবেল পড়া শেষ হলে ক্রুশ করতে চায় না। কেবল হাসে ফিক্‌ ফিক্‌ করে, মা যে কত বকে……।

মিন্নুর মা চাকরী করেন, হাসপাতালে। মা চাকরী করেন এটা ছবির কাছে অদ্ভুত লাগে—দেশের বাড়িতে থাকতে সে কোনো দিন

এমন কথা শোনেনি। মা'দের কাজ তো কেবল রান্না করা আর খেতে দেওয়া........।

: তোর মা বুঝি রান্না করেন না ?

: কেন করবে না ? আমাদের তো আর রাধুনী রাখবার পয়সা নেই, মাকেই তো সব করতে হয়। আমরা তো আর বড়লোক না...

মিনুকে ইস্কুলে দেখলে কিন্তু মনে হয় কত যেন বড়লোক তারা। সাজগোজ করে না কিন্তু ফিটফাট-ছিমছাম হয়ে থাকে, যা ছবি হাজার ভালো জামা পরে এলেও হয় না। সেইজন্যেই কিনা কে জানে, মেয়েরা সেধে সেধে মিনুর সঙ্গে কথা বলে, জজ সাহেবের মেয়ে পর্যন্ত।

ছোট্ট বাড়ি, সরমা পিসির বাসার মতো টালির ছাদ দেওয়া ছোট ছোট দুখানা ঘর কিন্তু বেশ সাজানো-গোছানো। বাইরের ঘরটাতে ঢুকেই কেমন ভালো লাগে। পিসিমার বাড়িতে তো অত ঘর, আলমারী, চেয়ার-টেবিল কিন্তু কেমন ছড়ানো-ছিটানো। এলো-মেলো হয়ে এখানকার জিনিস ওখানে পড়ে থাকে।

নিলুদের বাড়িতে যাও। সেখানে তো কিছুই নেই—যা আছে সব ছেঁড়া, ময়লা, তুলো-ওঠা, ধুলে-ভড়া। সেখানে দাঁড়ানো যায় না।

কিন্তু এখানে! বসবার ঘরখানায় একটা গোল টেবিলের চারপাশে চারখানা চেয়ার, টেবিলের ওপর ফুলদানিতে ফুল। দেওয়ালে একখানা মাত্র ছবি কিন্তু সেখানা ভালো করে দেখতে গিয়ে ছবির চোখ একেবারে আটকে যায়।—অমন করে রক্ত পড়ছে লোকটার শরীর থেকে! কাঠের গায়ে পুঁতে দেওয়া একটা অর্ধনগ্ন দেহ, মাথায় তার মুকুট। তাকিয়ে দেখে সে বুঝতে পারে—সেটা সোনার নয়, রূপোরও নয়—সেটা কাঁটার। কাঁটার মুকুট! আর পায়ের কাছে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ও কারা কাঁদছে! যারা তাকে ভলোবাসে ? দেখতে দেখতে ছবিরও কখন দু'চোখ পুরে জল এসেছে যেন।

পাশের ঘর থেকে মিনু এসে বলে: আয় ভাই, দাদা ডাকছে—ছবিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখে বুঝিয়ে বলে: ওই হোল ক্রুশিফিকেশন। ক্রুশ করতে জানিস, ছবি ? এই দ্যাখ আমি শিখিয়ে দিচ্ছি—, দু'একবার দেখিয়ে দিলে ছবিও শিখে ফেলে। এবার আর সে হাসে না। ছবিটা

তার মনে গভীর নাড়া দিয়েছে—কেমন কষ্ট হচ্ছে, রাগ হচ্ছে তার : কিন্তু মহাপুরুষদের তো মৃত্যু নেই।

: নেই-ই তো।—, মিনু বলে : জানিস, ওরা অমন করে কষ্ট দিল, তবু জিশু বলেছিলেন, ভগবান, ওরা জানে না ওরা কি করছে, তুমি ওদের ক্ষমা কর। ক্ষমাই জিশুর ধর্ম।

কথাগুলোকে মিনুর মুখে কেমন নতুন শোনায়। ছবিও বুঝতে পারে সে শোনা কথা বলছে, বড়দের মুখের কথাকে নকল করছে তবু খারাপ লাগে না। তার হঠাৎ মনে হয় সেও পুজো করবে জিশুকে, তাদের দেবতার ছবির পাশে ওই ছবিটাও রেখে দেবে আর সবাইকে বুঝিয়ে বলবে : মারতে চাইলে কি হবে! মহাপুরুষদের মৃত্যু নেই!

পাশের ঘরে মিনু নিয়ে যায় ওকে। জানলার কাছে মাটিতে বসে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় মোটা চশমা চোখে রোগা ছেলেটা আজও তেমনি বই পড়ায় তন্ময় হয়ে আছে, চোখ তুলে তাদের দেখে হাসে : দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো না।

সে আর মিনু দুজনেই হাঁটু মুড়ে বসে তার পাশে। বই থেকে মুখ তুলে অসীম বলে : নিহিলিস্ট কাদের বলে জান, ছবি?

ছবি তা কেমন করে জানবে! সে তো পড়ে ক্লাস সিক্সে আর অসীমদা সামনের বছর ম্যাট্রিক দেবে। সে কি-ই বা জানে! কিচ্ছু না!

অসীমই বুঝিয়ে দেয়, বলে : আমাদের দেশে যেমন টেরোরিস্ট, রাশিয়ায় তেমনি ছিল নিহিলিস্ট। এখানে যেমন টেরোরিস্টরা ইংরেজদের তাড়াতে চেয়েছিল, রাশিয়ায় তেমনি ওরা জারকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তার জন্যে ওদের গোপন দল ছিল। বিশ্বাসঘাতকতা করবার উপায় ছিল না কারুর, তাহলে তাকে মরতে হবেই। সে তুমি যেখানেই থাক। ওরা ঠিক খুঁজে বার করে নেবে। উঃ, তুমি যদি পড় সে গল্প, ছবি!

অসীমদার মুখে শুনতে ইচ্ছে করে গল্পগুলো কিন্তু তার আগেই চটির শব্দ করে ওদের মা এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে। গল্প শোনা হয় না, কি মনে করে সে মিনুর মাকে একটা প্রণাম করতে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন তিনি তাকে : ছিঃ ছিঃ! প্রণাম কেন? প্রণাম নয়। প্রণাম করে না।

করে না! বড়দের তো প্রণামই করতে হয়। কে জানে কেন উনি অমন করলেন। পাশ থেকে মিনু বলে ফিস্‌ফিস্ করে: খৃস্টানদের প্রণাম নিতে নেই যে? তুই কিচ্ছু জানিস নে।

ছবি জানতো না অনেক কিছুই। জানতো না মিনুদের খৃস্টান হবার ইতিহাস। অসীমও সে কথা বলতে চায়নি কিন্তু মা পাশের ঘরে গেলে মিনুর জেদে তাকে বলতে হয়। ভালো করে সেও জানে না। কাটা কাটা, ছেঁড়া ছেঁড়া! মা'র ঠাকুমার গল্প।

চোদ্দ বছরের বিধবা মেয়েকে লোভ দেখিয়ে শহরে নিয়ে এসেছিল গ্রামের একটা পাজী লোক; তারপর ফেলে পালায়। সে মেয়েকে আর কে ঘরে নেবে? গ্রামের কার ঘরে তার জায়গা হবে, নিজের বাবা-মাই যখন সমাজের ভয়ে সাহস পাচ্ছে না মেয়েকে নিতে! তার উপায় কি হবে?

: সত্যি কি হোল তারপর?—ছবি ব্যাকুল বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে: কেউ কাছে থাকতে দিল না—নিজের বাবা-মা পর্যন্ত না?

দিয়েছিল একজন। এক পাদরী সাহেব। সে সেই অভাগী মেয়েকে বলে-বুঝিয়ে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষা দেয়, তাকে লেখা-পড়া শেখায়। তারপর সেই মেয়ে নিজে ইচ্ছে করে বিয়ে করে এক দারওয়ানকে, খৃস্টান দারওয়ান। তাদের এক ছেলে হয়েছিল—অসীমের দাদু। দারওয়ানের ছেলে কিন্তু অনেক লেখা-পড়া শিখে সরকারী চাকরী পেয়েছিলেন। তাঁর হয়েছিল তিন ছেলে, এক মেয়ে। অসীমদের মা।

: মামারা কিন্তু দাদুর মতো না, জান? দাদু নিজে কত লেখা-পড়া জানতেন, মামাদের কিন্তু লেখা-পড়ার দিকে ঝোঁকই হোল না। তারা চিনলো টাকা, বললো চাকরী করব। দাদু তিনজনকেই চাকরী দিলেন, একজন কেরানী হোল, দুজন পুলিশ! পুলিশ মামা······, বলে অসীম হঠাৎ হাসে।

মিনু এসে বলে: ছবি আয়, দাদা এসো, মা খাবার দিয়েছে।

বাইরের ঘরের টেবিলের ওপর তিনখানা থালা, চেয়ার-টেবিলে সামনা-সামনি বসে খেতে খেতে ছবির অদ্ভুত লাগে। খাওয়াটাও যে কত আনন্দের এমন করে এর আগে যেন সে বোঝেনি কোনো দিন।

খেতে খেতে মিনু বলে: জানিস দাদা, আমরা খৃস্টান শুনে ছবি একেবারে অবাক হয়ে গেছে। হি হি....। আমাকে ক্রুশ করতে দেখে

হাসছিল তোর মতো। তুইও তো ওমনি করিস, চার্চে যেতে চাস্‌নে। শুধু শুধু মা'র মনে কষ্ট দিয়ে তোর বুঝি আনন্দ হয়?

অসীম মুখ তুলে বলে : আহা, কি বা হয় চার্চে? কেবল আ—মে—ন, হে প্রভু জিশু, তুমি আমাদের পবিত্র কর, পাপ থেকে মুক্ত কর। সুর করে করে তাই বলা। আমার ভালো লাগে কি জানিস? দুম্‌-দাম্‌ এই,—বলে সে একটা আঙ্গুলে বিশেষ একটা ভঙ্গি করে, চালাও শটাশট্‌—যেমন টেগরা চালিয়েছিল।

হঠাৎ দরজার ওপাশ থেকে রূঢ় কঠিন গলায় কে ধমকে ওঠে : খোকা! ফের এই সব কথা?—বুকে একটা ক্রুশ এঁকে মিনুর মা এসে সামনের চেয়ারখানায় বসেন। রূঢ় কঠিন দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকান একবার; কিন্তু তারপরই কোমল হয়ে আসে মুখ : খাওয়া হয়েছে? মিনু, এবার তোমার বন্ধুকে একটা গান শুনিয়ে দাও।

মিনু বলে : দাদাও গাইবে, মা। আমি একা না।

অসীম শক্ত হয়ে মাথা নিচু করে থাকে। ছবির সামনে সে গাইতে চায় না বুঝেও মা বলেন : গাও খোকা। কেন গাইবে না?

মিনুই প্রথম আরম্ভ করে : প্রভু, তোমার অসীম করুণা,—অসীমও গায় কিন্তু ছেঁড়া ছেঁড়া সুরে, বিরক্ত মুখে। শেষ হলে মুখ ভেংচে বলে : আহা মেয়ে আর গান পেলে না—প্রভু তোমার অসীম করুণা। কেন? সেই গানটা গাইতে পারলি নে, 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু'। সেদিন শেখালাম অত করে।

ওদের মা বলেন : না, ও-গান মিনু গাইবে না, তুমিও গাইবে না—আমি বারণ করেছি। ওটা বিদ্রোহের গান, ওতে হিংসার প্রবৃত্তি হয়।

অসীম তবু তর্ক করার চেষ্টা করে ক্ষীণ স্বরে বলে : ওতো স্বদেশী গান—বিদ্রোহ কোথায়। দেশের কথা আছে।

: কিন্তু ও-গান ইংরেজদের বিরুদ্ধে। আমরা তা গাইতে পারি না। আমরা তাদের বিরুদ্ধে নই।

: কিন্তু দেশটা তো আমাদের। ইংরেজরা গায়ের জোরে ...।

: চুপ কর খোকা! অত বড বড় কথা আমি তোমার মুখে শুনতে চাই নে,—রূঢ় ধমকে শুধু অসীমকে নয়, ছবি মিনুকে পর্যন্ত যেন কাঠের মতো শক্ত করে দেন ওদের মা।

কিন্তু ও কি! যার গলার স্বর অত কঠিন হতে পারে এত তাড়াতাড়ি সে আবার কাঁদতেও পারে! মিনুদের মা কাঁদছেন। রুমালে চোখ মুছে ফেলে ধরা গলায় বলতে থাকেন: আমি বেশ বুঝতে পারছি খোকা, তোকে দিয়ে আমার কোনো আশা পূর্ণ হবে না। তুই! তুই আমার কথা একবারও ভাবিস নে? তোর বাবাকে যে ওই স্বদেশীওয়ালারাই মেরেছিল সে কথাও ভুলে যাস?

ছবি এবার আড়ষ্ট হাত-পা ঝেড়ে নিয়ে ওঠে, তাকে যেতে হবে সে কথা যেন তার এতক্ষণে মনে পড়ে কিন্তু মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে থাকে! যাবার আগে খুশি হওয়া গেল না, যে খুশিটা এখানে এসে হয়েছিল। এমন ছোট্ট সংসার কিন্তু তারও কোথায় যেন একটা দুঃখ আছে। এ দুঃখটার রূপ নিলুদের মতো নয় পিসিমার মতোও নয়। কিন্তু তবু তাকে অস্বীকার করা যায় না।

মিনু আর অসীম দুজনে তাকে পৌঁছে দিতে যায় বাড়িতে। হাঁটতে হাঁটতে অসীম বলে: মা যেন কেমন! আগে বকবে একবার তারপর কাঁদবে, তারপর বাবার কথা তুলবে। শেষে জিশু! খৃস্টান বলে কি বাঙলা দেশ আমার নয়? জানিস্ মিনু, ওই যে নতুন নার্স টোনির মা, ও এসে এসেই মা'র মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে। জন্মে তো ইংল্যাণ্ড চোখে দ্যাখেনি, তবু লণ্ডনকে বলবে হোম্। স্বদেশীর নাম শুনলেই ওরা কাঁপতে থাকে।

মিনু কথাগুলো শোনে কিন্তু উত্তর দেয় না; আর ছবি তখন অন্যমনস্ক হয়ে দেখে, রাস্তার পাশের গাছগুলোয় নতুন পাতা গজাচ্ছে। ধুলো ধুলো বিষণ্ণ শহরটায় কেমন জলজলে একটা ছাপ লেগেছে, হলদে হলদে অজস্র ফুলে ভরে আছে কতকগুলো অচেনা পাহাড়ী গাছ। কী মাস এটা! ফাল্গুন! বসন্তকাল! দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া দিচ্ছে, কোকিল ডাকছে থেকে থেকে। ছবির মনটা হঠাৎ কেমন করে ওঠে, গ্রামকে মনে পড়ে, মনে পড়ে মাকে, মণিদাকে—সবাইকে। সব্বাইকে!

কেমন করে এতদিন পরে আজ হঠাৎ পুরোন কথা এত স্পষ্ট করে, এত বেশি করে মনে পড়ছে—মনে পড়ছে কত ক—ত কথা। সে যেন গন্ধ পাচ্ছে ঘাসের, মাঠের, ঘাটের। গন্ধ পাচ্ছে মটোর ফুলের, সর্ষে ফুলের, আমের মুকুলের। শহর আর গ্রাম, গ্রাম আর শহর সব মিলে

মিশে একেকার হয়ে গেছে। সেও যেন কেমন একটা ভালোবাসার টান অনুভব করতে থাকে, সে টান মা'র জন্যে নয়, মণিদার জন্যে, আরও কিছুর জন্যে—কি একটা যেন। সে দেশ! সে অসীমের মতো অত কথা বোঝাতে পারে না, বলতে পারে না কিন্তু অনুভব করতে পারে। কি যেন একটা ঠেলে ঠেলে বুকের কাছাটায় উঠে আসে, দুঃখ না, কান্না না, একটা আবেগ। মনে পড়ার আবেগ। ঝাপসা ঝাপসা একটা স্মৃতির পাতা যেন বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তার চোখের সামনে দিয়ে, বারে বারে মনে হতে থাকে: কতদিন এসেছি আমি! ক—ত দিন। কে জানে কত দিন!

অসীম হঠাৎ বলে: আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, গানটা জান ছবি? শুনেছ?

ছবি বলে: হ্যাঁ জানি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী—অধীরকা গাইতো। আকাশ কেমন করে বাঁশী বাজায়, অসীমদা?

মিনু বলে: ছবিও গান জানে, দাদা। সেই গানটা ছবি?—সেই, যায় যাবে জীবন চলে, বন্দেমাতরম বলে।

ছবি গম্ভীর হয়ে বলে: হ্যাঁ, ওটাও অধীরকা গাইতো। মুকুন্দ দাসের গানও গাইতো অধীরকা—ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান, সাথে আছে ভগবান—নাহি ভয়।

মিনু বলে: গা না ভাই, গা।

: যাঃ। এসে গেছি দেখছিস নে।

বাড়িতে পৌঁছে মিনু সুকুমারীর কাছে ছবিকে দিয়ে বলে: রাগ করতে পারবেন না কিন্তু মাসিমা। ছবিকে আমার মা দেখতে চেয়েছিলেন তাই ওকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম।

কি সুন্দর গুছিয়ে কথা বলে মিনু, ছবি ওরকম পারে না। কোনো কথা সে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারে না। হয় লজ্জায় চুপ করে থাকে না হয় এলোমেলো বলে।

মিনুর কথা শুনে সুকুমারী বলে: না, রাগ আর কি....। কিন্তু···বড্ড দেরি করেছে। যাকৃগে। এসো তোমরা কিছু খেয়ে যাও।

: আমরা যে খেয়ে এসেছি মাসিমা। ছবিকে না খাইয়ে রাখিনি তাই বলে।

সুকুমারী মিনুর কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে হাসে একটু : তা হোক, আর একবার না হয় খেলেই।

সামনে বসিয়ে খাওয়াতে খাওয়াতে বলে : রবিবারে এসো সকালে—ছবির সঙ্গে খেলা কোরো। ওর তো সঙ্গী-সাথী বিশেষ নেই।

মিনু বলে : রবিবারে তো আসতে পারবো না, মাসিমা। সেদিন আমরা চার্চে যাই, দুপুরে মা বাইবেল পড়ে। সেদিন হয় না।

: চার্চে!

ছবি বোঝে মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছে কিন্তু তা বুঝতে দিতে চায় না পিসিমা।

ওরা চলে গেলে সুকুমারী বলে : এমনিতে তো বেশ ছেলে-মেয়ে দুটো, কিন্তু খৃস্টান! কপাল! আগে জানলে রান্নাঘরে বসাই। ছবি, জামা-কাপড় ছেড়ে মাথায় গঙ্গাজল দেবে এসো। দেখ তো কাণ্ড! সব ছুঁয়ে-নেড়ে একাকার, আগে কি জানি!

পিসিমা যেন একমুহূর্তের মধ্যে একেবারে অন্য মানুষ। ছবি কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—সে জামা-কাপড় ছাড়বে না, মাথায় গঙ্গা জল দেবে না। কিছুই করবে না সে!

দেশে থাকতে দেখতো দুঃখীরামের মায়ের মাজা বাসন ঘরে ঢোকানো হোত না। অমন ঝকঝকে করে মাজা, তবু সব আবার ঠাকুমা একটা একটা করে ধুয়ে ঘরে তোলাত। তার কাজ নেওয়া চলত কিন্তু জল চলত না, ছোঁওয়া চলত না। সে ছিল চাঁড়াল

আর মিনুরা খৃস্টান! খৃস্টান কিন্তু তাতে কি!

হঠাৎ কোথা থেকে কয়েক ফোঁটা জল গায়ে পড়তেই চমকে দেখে পাথরের বাটিতে তুলসীপাতা ভিজিয়ে পিসিমা গঙ্গাজল ছিটোচ্ছে। শিউরে উঠে ছবি ছুটে ঘরের মধ্যে পালায়। চোখের কোণ দুটো ভিজে উঠেছে তার।

সুকুমারী পেছেন থেকে চেঁচায় : ও ছবি দাঁড়া, জামা ছাড় আগে, ঘরে ঢুকিস নে। ও ছবি....!

চোদ্দ



পিসিমা বলে, নিলু চোর। তাই বাড়ির মধ্যে ওদের ডাকা যায় না। বাগানে বসে খেলা করতে হয়। কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি বরং কেমন একটা আকর্ষণ বেড়েছে বাড়ির। আগে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছেই হোত না—মন খারাপ হয়ে যেত, আজকাল লাগে না। ফিরে এসে খেয়ে বৈঠকখানা ঘরের ভেতরের দরজাটা খুট করে খুলে ছবি বাগানে আসে, ওদিকে বেড়ার ধারে উঁকি মারতে থাকে দুজোড়া চঞ্চল চোখ, ছবির গেটটা খলবার অপেক্ষায়। তারপর তিনজোড়া চোখ, আগে একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে হাসে—খুশির হাসি, অপেক্ষা করে থাকার হাসি। তিন জোড়া হাত জামা-কাপড়ের তলা থেকে বার করে জিনিসগুলো—পুতুল, খেলনা।

ছবির ভালো দামী পুতুল (লুকিয়ে আনা, পিসিমা দেখলে বকে), নিলুদের ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুতুল এক জায়গায় জমা হয়। পিলু ইট দিয়ে উনুন তৈরী করে তাতে মাটির হাঁড়িতে ভাত চাপায়। নিলু পুতুলগুলোকে সাজায়। এমন সুন্দর করে সাজায় যে ছবি মুগ্ধ হয়ে দেখে। পিসিমার ফেলে দেওয়া জরির পাড় কনে-পুতুলের কুঁচি দেওয়া কাপড় হয়, ছবির আনা পাউডার দিয়ে আলতা দিয়ে পুতুলকে সাজাতে সাজাতে নিলু একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বলে: কতটুকু কাপড়ে দেখ পুতুলের হয়ে যায় কিন্তু মানুষের—! এমন সুন্দর শাড়ি, কিন্তু কেবল পুতুলের—না রে?

মাঝে মাঝে সেই জরির টুকরো কোমরে গুঁজে রাখে, সন্ধেবেলা উঠে যাবার সময় বুকের কাপড়ের মধ্যে খেলনা লুকিয়ে নিয়ে যায় দুটো একটা, ছবি তা দেখে রাগ করে না, তার হাসি পায়, কষ্ট হয়। সে জানে, নিলু হয় পরদিন না হয় দু'দিন পরেই ওমনি করে লুকিয়েই আবার সেগুলোকে রেখে দেবে।

নিলুর মুখের দিকে তাকিয়ে কে জানে কেন—ছবি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। নিলুর যদি ছবির মতো জিনিস-পত্তর থাকতো? তাহলেও কি অমন হোত ওর স্বভাব? পিলুটা তো অমন নয় কিন্তু নিলু ভারি ছটফটে—ছটফটে বলেই বোধহয় কোনো কাজ ও ভেবে করতে পারে না। এমন কি ছোট্ট একটা পুতুল পর্যন্ত চুরি করে রাখতে পারে না।

হঠাৎ কখন পুতুল ফেলে বেড়ার ফাঁকে মুখ রেখে নিলু চেঁচায়: এ্যাই পরীবানু, শোন্—শোন্।

ডেকে সে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকে ছবির মুখের দিকে: এই মেয়েটাকে দেখেছিস ছবি, ছাখ্ কি সুন্দর দেখতে। প্রাইমারী স্কুলে পড়ে আবার জানিস? কতবার ওর নাম কাটা গিয়েছে কিন্তু বড় দিদিমণির পা জড়িয়ে ধরে এমন কেঁদেছে যে আবার ইস্কুলে নিয়েছে ওকে। এখন বড় দিদিমণির বাড়িতে যত ঘুঁটে লাগে দেয়, তার বদলে বিনে পয়সায় পড়তে পায় ইস্কুলে।

ছেঁড়া ময়লা তেলচিটে কাপড় পরা মেয়ে, হাতে একটা বালতি ঝুলিয়ে এসে দাড়ায়। পরীবানু! কি অদ্ভুত নাম!

নিলু বলে: ছাখ্ ভাই, বেশ সুন্দর দেখতে না?

সুন্দর! গা দিয়ে খড়ি উড়ছে, সারা মুখ খসখসে, গায়ে ময়লা জমেছে, চুলগুলো তেলের অভাবেই বুঝি লাল কিন্তু তবু কি সুন্দর!

নিলু বলে: গোবর কুড়িয়ে আনলি বুঝি? মেয়েটা নিঃশব্দে মাথা নাড়ে, তারপর লোভীর মতো তাকিয়ে থাকে ওদের খেলনাগুলোর দিকে, পুতুলের দিকে।

: জানিস ছবি, ও ইস্কুলে কেলাসে প্রত্যেকবার ফার্স্ট হয় কিন্তু ওকে ফার্স্ট করে না। কোনো প্রাইজ দেয় না। তাহলে নাকি ভদ্দরলোকেরা চটে যাবে, মেয়ে দেবে না। নারে পরীবানু?

মেয়েটা হাসে একটু, সম্মতির হাসি। ওর ডান হাতখানা গোবর মাখা, আঙুলে মাছি উড়ে বসছে। সামনে দাঁড়াতেও যেন লজ্জা করছে তার।

নিলু বলে চলে: জানিস ভাই, ওরা গরীব। ভীষণ! আমাদের চেয়েও। আমাদের তো বাবা আছে তবু, চাকরী করে, ওর তাও নেই। ওর মা ঘুঁটে বেঁচে, কাঁথা সেলাই করে দেয় কিন্তু কারুর বাড়িতে চাকরি করে না ···। পাঠানদের নাকি তা করতে নেই।

: পাঠান। ওরা তবে মুসলমান। ছবি জানে পাঠান কাদের বলে, ইতিহাসে পড়েছে সে, মোগল আর পাঠান। শেরশাহ পাঠান ছিলেন। বীর শেরশাহ, হাত দিয়ে যিনি বাঘ মেরেছিলাম। অদ্ভুত বিস্ময়ে ছবি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে মেয়েটাকে। তারপর হঠাৎ বলে: দাঁড়া নিলু, পুতুলগুলো রেখে আসি। পরীবানুদের বাড়িতে যাব।

আর সেই কথা শুনে এই প্রথম মেয়েটাও কথা বলে: আমাদের বাড়ি যাবে?

: বাংলা বলতে পার তুমি? তোমার……।

: বাংলা!—বড়দের মতো হাসে পরীবানু: আমার জন্ম এ দেশে জান? আমি মা'র সঙ্গেও বাংলা বলি। কিন্তু আমাদের বাড়ি—তুমি যাবে? কেন?

নিলুও বলে: পিসিমা যদি বকে, ছবি?

অবাধ্য ঘোড়ার মতো ঘাড় ঝাঁকিয়ে সে বলে: না, বকবে না।

যে মেয়েটা বড় দিদিমণির পা জড়িয়ে ধরে পড়ার জন্যে, বিনে পয়সায় তার বাড়ির ঘুঁটে যোগায় তাদের সংসারটা একবার দেখতেই হবে তাকে। আর কিছু সে জানে না।

ছবি গেলে নিলু, পিলুকেও যেতে হয় কিন্তু বিমর্ষ আর শংকিত হয়ে থাকে সারাক্ষণ। ফিস্ ফিস্ করে নিলু বলে: মা যদি জানে—। এদিকে খিদে পেলে খেতে দেবে না কিন্তু কোথাও যদি খেয়ে আসি—তাতেও বকুনি! কেবল বকবে—কেবল।

শ্যাওলা ভরা পুকুরটার পাড়ে যে হুমড়ি খেয়ে পড়া ঘরখানার সামনে দাঁড়িয়ে পরীবানু তার মাকে ডাকে সেখানে কি মানুষ থাকতে পারে? কাছিমের পিঠের মতো উপুড় করা ঘরখানা দেখলে ভয় হয়। কিন্তু কেউ বেরোয় না, কেবল একটানা একটা কাতরানির শব্দ ভেসে আসে। শংকিতমুখে পরীবানু বলে: আবার জ্বর এসেছে মা'র—সকালে ছিল না। দুপুরে দুটো ভাত খেয়েছে ওমনি। আসবে ভেতরে—?—ভাসা ভাসা শংকিত চোখে সে তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে, ছবির ফর্সা জামা-কাপড়ের দিকে বারে বারে তাকায়।

নিলু বলে: ছবি চল্, ফিরে যাই।

ছবি তবু নড়ে না, তার যেন জেদ চেপেছে। সে একবার ভেতরে যাবে। যাবেই।

ঘরের মেঝে মাটির, দেওয়ালের মতো শুকনো খট্‌খটে নয়, ভেজা ভেজা স্যাঁৎসেঁতে, তার ওপর ছেঁড়া কাঁথা গায়ে কাঁপছে পরীবান্থর মা। জটা ধরা চুলের মধ্যে থেকে এখনও উঁকি দিচ্ছে তার টিকালো নাক, ভেঙে যাওয়া চোয়ালের ওপর দুটো সুন্দর চোখ। পরীবান্থর মাকে দেখলে এখনও কেমন করে যেন চেনা যায় সুন্দরী বলে।

পরী বলে : ওরা নিলু পিলু, আর তুমি ?

: ছবি।

: হ্যাঁ, ছবি। একটা ছেঁড়া বিবর্ণ গালচে পেতে দিয়েছে পরীবান্থ তাদের বসবার জন্যে, এখনও তার জ্বলে যাওয়া সুতোর কারুকায মিলিয়ে যায়নি। ছবি অবাক হয়ে সেখানা দেখে। ওর মা বলে ভাঙা ভাঙা বাংলায় : ওটাই আছে সম্বল। সবটা আমার করা জান ? কাশ্মীরি মেয়ে আমি—একদিন আমারও দিন ভালো ছিল পরীর বাবা বেঁচে থাকতে কিন্তু এখন নসীব দেখেছো—? কাঁদছে পরীর মা চোখে কাপড় দিয়ে, শুধু এই পরীটার জন্যে বেঁচে আছি। কিছু করতে পারিনে ওর জন্যে, বলি চল কাশ্মীর চলে যাই—ও যাবে না। বাংলা দেশ ও ছাড়বে না, বাংলা শিখবে, বাংলা দেশের ছেলে বিয়ে করবে ওর ইচ্ছে। তবে থাক—আমি কি কোরবো। কিন্তু আমি মরলে—তখন কি হবে তোর; বল্ ?

পরীবান্থ হাত ধুয়ে এসে মায়ের পাশে বসেছিল, সে রেগে বলে : ধ্যেৎ, কেবল মরার কথা বলবে তুমি। বারণ করিনি তোমাকে ? অন্য কথা বলতে পার না ?

: আচ্ছা আচ্ছা, মা থামে, তারপর কি ইশারা করে। মেয়েটা উঠে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে মাটির থালায় শক্ত শক্ত নিমকির মতো জিনিস এনে ওদের সামনে রাখে। নিলু, পিলু খায়, ছবিও খায়। পরীবান্থ আধভাঙা কাঁচের গ্লাসে জল আনে, তাও খায়।

আস্তে আস্তে ছোট্ট স্যাঁৎসেঁতে মাটির ঘরখানায় অন্ধকার নেমে আসছে। পুকুরপাড়ের গাছগুলোর ডালে একদল বাসায় ফেরা পাখী কিচির মিচির করে ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে—কক্কগে। ছবি

তন্ময় হয়ে রুমু, হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে কথা বলা পরীবানুর মায়ের মুখে কাশ্মীরের গল্প শোনে, ফলের বাগানের, নদীর, পাহাড়ের।

পরীবানু ততক্ষণে ঘরের কোণে ছোট একটা প্রদীপ জ্বালিয়েছে, সেখানে একমনে সে মাথা নিচু করে বই নিয়ে পড়ছে। : ওই আলোতে কি চোখে দেখা যায়? ছবি তো পড়ে ইলেকট্রিক আলোয় চেয়ার-টেবিলে বসে। দেশের বাড়িতে লণ্ঠন জ্বালানো হোত। কিন্তু সে কথা পিসিমা তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ পিসিমার কথা মনে পড়তেই লাফিয়ে উঠে পড়ে সে। এতক্ষণ নিশ্চয় তার খোঁজ পড়ে গেছে।

প্রদীপের আলো আঁচল আড়াল দিয়ে পরীবানু ওদের পুকুরের অন্ধকার রাস্তাটা পার করে দেয়। সারি সারি আরও কতকগুলো হুমড়ি খাওয়া ঘর এদিকটায়, তার একটা ঘরে কে যেন কার সঙ্গে ঝগড়া করছে, আর একটা থেকে আসছে ছোট ছেলে-মেয়ের তারস্বর চেঁচানি। কী অন্ধকার এ দিকটা। এতটুকু আলো নেই।

নিলু বলে: এটা মুসলমান পাড়া, কোচোয়ান, বাবুর্চিদের পাড়া। অন্য জাতও আছে দু' এক ঘর।

বড় রাস্তা থেকে এ ঘরগুলো যেন নিজেদের ইচ্ছে করে আড়াল করে রেখেছে—আলো থেকে, বাতাস থেকে, রাস্তার কোলাহল থেকে। কেবল পুকুর পাড়টার চারধার ঘিরে মশার গুঞ্জন উঠছে, ব্যাঙ ডাকছে মকমক্ করে, মস্ত বড় ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটায় বসে পেঁচা ডাকছে কর্কশ স্বরে।

আর হুমড়ি খাওয়া ঘরখানার এককোণায় একটা মেয়ে এতটুকু একটা প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় চোখ কুঁচকে পড়া করছে। ঘরের কোণে শুয়ে তার মা জ্বরে কাতরাক্—, পড়াটা সে শেষ করে নেবেই। সে স্বপ্ন দেখছে বাংলার, তার মা স্বপ্ন দেখছে কাশ্মীরের।

কিন্তু থাক পরীবানু। ছুট—ছুট: পড়ি কি মরি করে পিলুর হাত ধরে ছবি ছোটে। ঢিব ঢিব করা ভয় নিয়ে বাড়ির মধ্যে পা দিয়ে আপনা থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে তার। পিসিমার ঠাকুর পুজোর ঘণ্টা বাজছে টিং টিং টিং। এখনও তার খোঁজ পড়েনি তবে।

ভালো মেয়ের মতো হাত-পা ধুয়ে পড়তে বসে বারে বারে তবু অন্যমনস্ক হয়ে যায় ছবি। এত উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলোতেও কিছুতেই ঝাপসা হচ্ছে না একটা ছবি—, ঘরের কোণে এতটুকু আলোয় চোখে কুঁচকে পড়া করছে একটা মেয়ে। তাকে ঘিরে বাইরে নেচে বেড়াচ্ছে অন্ধকার, গুঞ্জন উঠছে মশার, শ্যাওলা ঘেরা পুকুর থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে আসছে। কিন্তু সেই বুক-চাপা অন্ধকারের মধ্যেও কচুর পাতায় ফোঁটা ফোঁটা করে জমা হচ্ছে টলটলে শিশির।—জমা হচ্ছে।



পনের

তারপরও ছবি দু'একবার পরীবানুদের বাড়িতে গেছে লুকিয়ে লুকিয়ে, পালিয়ে। ঝুলে পড়া অন্ধকার ঘরখানায় যেদিন শুধু পরীবানুর মাকে শুয়ে শুয়ে কাতরাতে শুনেছে। উঁকি দিয়ে দেখেছে মেয়েটা নেই, ওমনি আবার চুপি চুপি পালিয়েও এসেছে।

কিন্তু আজ আর পালিয়ে যাওয়া যায় না। পায়ের শব্দ ক্ষীণ হলেও পরীবানুর মায়ের কান এড়ায় না, ক্ষীণকণ্ঠে সে বলে: কে! পরী। একটু পানী দে—, ভাষাটা বাংলা নয় কিন্তু বুঝতে পারা যায়।

ছবির আর চলে যাওয়া হয় না, সে এগিয়ে এসে বলে: আমি!

জ্বরতপ্ত লাল লাল দুই চোখ মেলে সেই মা তাকায়, চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি মাথার কাছ থেকে চাটাইখানা এগিয়ে দেবার চেষ্টা করে ভাঙা বাংলায় বলে: তুমি! পরীর দোস্ত। বোস। ও গেছে দোকানে বার্লি কিনতে, আসবে এখুনি। বেগমের বাড়ি থেকেও তো ডেকে গেছে, সেখানে যাবে—সেখান থেকে এসে খানা পাকাবে। মেয়েটার যদি কোনো হুঁস থাকে··· !

: বেগম কে! সেখানে যাবে কেন?—অপরিসীম কৌতূহলে ছবি যেন ফেটে পড়ে।

পরীবানুর মা ছবির এনে দেওয়া জল খেয়ে ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলে ঠোঁট মুছে একটু ম্লান হাসির চেষ্টা করে বলে: চেন না বেগমকে! বড় রাস্তার পশ্চিম দিকের মস্ত গেটওয়ালা বাড়িটা—ফুল বেগম। খুপসুরৎ!

বাড়িটা চেনে ছবি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো লোহার গেট আছে, তার দু'পাশে দুজন দারওয়ান পাহারা দেয়। সারা বাড়িটা লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা আর সেই লোহার বেড়া ঢেকে ফুটে থাকে একরকম নীল ফুল: গাঢ় নীল। ভারি সুন্দর দেখতে। ছবির কতদিন ইচ্ছে হয়েছে ওই ফুল কটা ছিঁড়ে নেয়—ওই বিরাট বাড়িটার মধ্যে একবার

ঢোকে। নিলু গল্প করেছে ওর মধ্যে নাকি ফোয়ারা আছে—আপনা আপনি জল পড়ছে দিনরাত—কেউ ঢালছে না। আপনা থেকেই জলটা উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আর আছে হরিণ, খাঁচায় করা চিতাবাঘের বাচ্চা আর নানারকমের পাখী। কিন্তু ও বাড়ির মধ্যে কেউ ঢুকতে পায় না—ওটা ফুলবিবির বাড়ি। নিলু বলেছিল ফুলবিবি। বেগম বলেনি। কেমন করে ঢুকেছিল নিলু কে জানে—সে কথা আর জিজ্ঞেস করা হয়নি কিন্তু হিংসে হয়েছিল সে কথা শুনে। এখন হিংসে হয় পরীবানুর ওপর। ওকে লোক দিয়ে ডেকে পাঠায় বেগম!

: রোজ যায়?

: হাঁ, রোজ!

: কেন ওখানে কি?

পরীবানুর মা বলে: নোকরী! নোকরী করতে যায় মেয়ে! বেগম তো একেবারে রাখতে চায়, কিন্তু মেয়ে তা শুনবে না। ওর……।

খুব মৃদু পায়ে ঘরে ঢুকে ছবিকে দেখে একটু হাসে পরীবানু, ভারি মিষ্টি খুশির হাসি।

ওর মা বলে: লোক এসেছিল, যেতে বলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা হঠাৎ পাংশু আর কঠিন করে একমুহূর্ত কেমন নিস্তব্ধ হয়ে থাকে মেয়েটা, জেদী গলায় বলে: দেব ছেড়ে ও কাজ। রোজ রোজ তলব আমার ভালো লাগে না।

: ছেড়ে দিলে চলবে কি করে বল্, তোর বই কেনার পয়সা খাতা, পেন্সিল—পাবি কোথায়? আমার ঘুঁটে বেচা পয়সায় দেখিস্ না—পেট-ভরে একবেলাও খাই না।

আর কথা বলে না—ছবি বোঝে আর কথা বলার নেই। তার দম আটকে আসে।

অতটুকু মেয়ে পরীবানু চাকরী করে। বেগম তাকে লোক দিয়ে ডেকে পাঠায় এমন চাকরী! কিন্তু ছবি বেশ বোঝে—লোক দিয়ে ডেকে পাঠানোটাও খুব সম্মানের নয় সব ক্ষেত্রে। এমন চাকরী যা পরীবানু পছন্দ করে না। কি সে কাজ।

এরমধ্যেই কখন ঘরের এককোণ থেকে তার ছেঁড়া ময়লা কাপড়খানা ছেড়ে পরীবানু পরে এসেছে একটা আস্ত রঙীন কাপড়, চুলটাও

আঁচড়ে নিয়েছে। আঁচলে ঘষে ঘষে মুখটাকেও সে খানিকটা চক-চকে করেছে। আর তাতেই! এই সামান্য পরিবর্তনেই আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। আশ্চর্য! ছবিকে মুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে পরীবানু আবার হাসে—বড় মেয়েদের মতো হাসি। তারপর ওকে ইশারা করে বাইরে আসবার জন্যে।

পাশাপাশি চলতে চলতে ছবি বলে: তুমি চাকরী কর? এইটুকু মেয়ে তুমি? রোজ ওই বেগমদের বাড়িতে যাও?

আবার হাসে মেয়েটা: যাই! তুমি যাবে?

: আমি? আমাকে ঢুকতে দেবে?

: দেবে! আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। দেখবে কি চাকরী করি আমি।

ঢুকতে দেবে? ছবির যেন বিশ্বাস হতে চায় না। সেই ফোয়ারাটা দেখা যাবে, হরিণ, চিতাবাঘের বাচ্চা দেখা যাবে। সেই নীল ফুল আনা যাবে। আজ নিলু, পিণ্টু বিকেলে ভাগ্যি খেলতে আসেনি—তাইতো এমন একটা সৌভাগ্য হয়ে গেল তার।

সত্যিই ঢুকতে দিল তাকে। দরজার দারওয়ানটা পরীবানুর সঙ্গে কি একটা রসিকতা করল কিন্তু পথ আটকাল না। আর ভেতরে ঢুকে ছবি একেবারে অবাক হয়ে গেল।

পরীবানু ওকে সামনের বারান্দাটা দেখিয়ে বলে গেল: আমি ওদিকে থাকবো, কাউকে বললেই ডেকে দেবে। তোমার যা ইচ্ছে দেখ, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে আমার নাম কোরো।

কথা শেষ করে অদৃশ্য হয়ে গেল পরীবানু—ত্রস্ত পায়ে। ছবি ভীতু ভীতু মুখে খানিক সেই প্রকাণ্ড চত্বরটায় দাঁড়িয়ে থেকে শেষে এগিয়ে গেল ফোয়ারাটার দিকে, সেখান থেকে দেখতে গেল হরিণটাকে, চিতাবাঘের বাচ্চাটাকে—পাখীগুলোকে। খুঁজে খুঁজে নিজেই দেখে নিল যা যা শোনা ছিল। কেউ তাকে বাধা দিল না—কেউ বার করে দিল না। কাউকে দেখতে পর্যন্ত পাওয়া গেল না। যতক্ষণ পারলো সে সেই মখমলের মতো নরম ঘাসের ওপর পা ঘষে ঘষে চলে বেড়ালো, চুপি চুপি বেড়ার ধারে গিয়ে গোটাকয়েক নীল ফুল ছিঁড়ে নিয়ে এল, তবু কেউ এলো না। দরজায় দারওয়ান থাকে কিন্তু ভেতরটা কেমন নির্জন—ছমছমে। একসময় সে আকাশের দিকে মুখ তুলে

তাকালো, দেখল বেলা পড়ে আসছে। একসময় হঠাৎ ভারি চমৎকার একটা রান্নার গন্ধ ভেসে এলো কোথা থেকে যেন—বাতাসে নাক রেখে সে গন্ধটা অনুভব করার চেষ্টা করল। তারপরই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল কথাটা—বেগম!

বেগমকে দেখা হয়নি। পরীবানু কেমন করে চাকরী করে দেখা হয়নি।

যে বারান্দার ধারে পরীবানু তাকে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল সেখানে এসে সে একবার থমকে দাঁড়ালো। কোথায় যেতে হবে সে জানে না। কোন্ ঘরে পরীবানু আছে তাও সে জানে না। এখান থেকে বেরিয়ে যেতেও সাহস হচ্ছে না—যদি পরীবানু না থাকলে তাকে বেরুতে না দেয়।

খুব নিঃশব্দ পায়ে সে উঠে এল বারান্দার ওপর। কোনদিক থেকে যেন অনেকগুলো কথার শব্দ আসছে। দীর্ঘ বারান্দা পেরুতে ছবির বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করছে—মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি কেউ তাড়া করে আসবে, এখুনি কারা যেন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠবে এ নিস্তব্ধতা ভেঙে যাওয়ায়।

গলার শব্দ লক্ষ্য করে ঠিক ঘরখানার সামনে এসেই দাঁড়িয়েছে সে। কিন্তু ভিতরে ও কি! ও কে!

একটা অর্ধ উলঙ্গ দেহ! ফর্সা ধবধবে রঙ কিন্তু চামড়া ঝুলে ঝুলে পড়া। একটা অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি। পর্দাটা ফাঁক করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ছবি কিন্তু ভয়ে তার গায়ের মধ্যে কাঁপছে, সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, বুকের ভেতরটায় ধড়ফড় করছে এমন করে, যেন সে শব্দটা ওদের কানে গিয়েও পৌঁছবে।

অর্ধউলঙ্গ দেহটাকে সবাই মিলে কি করছে!

কি ও? কেমন লালচে একটা রঙ মাখাচ্ছে সারা গায়ে—কে একজন খোলা চুলে আস্তে আস্তে মাখিয়ে দিচ্ছে সেই রঙ। সাদা চুল কালো হয়ে যাচ্ছে, ফর্সা চামড়া, ঝুলে পড়া বুকের নিচেটা, হাতে পায়ের রঙ হয়ে উঠেছে অন্য রকম। পরীবানুও আছে—মাথা নিচু করে সে এখন সেই চামড়া ঝুলে পড়া শরীরটায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। এই চাকরী! পরীবানুর চাকরী!

কে জানে কেন ছবির হঠাৎ গা বমি বমি করে, অসহায়ের মতো কান্না পায়। হয়তো চেপে রাখা রুদ্ধশ্বাস ভয়টা তাকে এমন করেছে। হয়তো গলা দিয়ে শব্দও বেরিয়ে যেত কিন্তু তার আগেই পর্দা সরিয়ে পরীবানু বেরিয়ে আসে। তার বিরক্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, 'ভু' হাতে মাখান লাল রঙ—কাপড়েও লেগেছে, নাকের পাশে, চুলে।

ছবির হাত ধরে সে একেবারে বাইরে টেনে এনে গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে বাঁ-হাতে ধরা পয়সা ক'আনা গুনে আঁচলে বাঁধে।

তারপর তেমনি হাসি মুখে বলে : দেখেছ বেগমকে ?

ছবি মাথা নাড়ে।

: আমাকে এ চাকরী ঠিক করে দিয়েছে সরীফনের মা—রান্নাঘরের রাঁধুনি। বেগমকে অনেক বলে কয়ে···। এতে আমার খাতা পেন্সিলের দাম উঠে যায়, মাকে মাঝে মাঝে চিনি কিনে দিই, ফল কিনে দিই।

ছবি বলে : ওই বেগম ? ওই ? ন্যাংটো হয়ে ....?

ফিক করে হেসে ফেলে পরীবানু চলতে চলতে। রাস্তার লাইট-পোস্টের আলোর এক চিলতে এসে পড়েছে তার মুখে। সেই হাসিটুকু দেখে এখন আর ওকে ছবির চেয়ে বড় বলে মনে হয় না, গম্ভীর মনে হয় না। ছেলেমানুষী খুশিতে সেও উচ্ছল হয়ে উঠে সামনের তেলেভাজার দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ: দাঁড়াও ফুলুরি কিনি। খাবে ফুলুরি ? খাও তোমরা ?

পিসিমার কঠিন নিষেধ আছে কিন্তু সে কথা বললে পরীবানুকে এমন সহজ করে পাওয়া যাবে না। ছবি বলে : খুব ! কত খাই।

দুজনে ফুলুরী খেতে খেতে বেগমের কথা মনে পড়ায় হাসে আবার।

: বয়েস কত জান ফুলবিবির ? পঞ্চাশের ওপর। মেহেদী রঙ মাখে গায়ে, চুলে দেয় কলপ—নইলে সাদেক মিয়ার মন হয় না। তার যে আরও তিনটে বেগম—তাদেরও আলাদা আলাদা মহল। তারা অল্পবয়সী-সুন্দর। একে আর তাই এখন দেখতে পারে না সাদেক মিয়া। বুড়ো কিনা তাই বুড়িকে আর দেখতে পারে না। পারবে কি করে, পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে যে।

: পঞ্চাশ বছরের বুড়ি! হি হি......, দুজনেই হেসে ওঠে কিন্তু

তারপরই পরীবানু আর কেন যেন হাসে না। হঠাৎ তার গলার স্বর গম্ভীর হয়ে যায়, বলে : জান, বেগম কাঁদে। ওর তো ছেলেও নেই মেয়েও নেই, কার কাছেই বা কাঁদবে? ওই বাঁদীদের কাছেই কাঁদে। আমাকে রাখতে চেয়েছিল, বলেছিল যত্ন করে রাখবে। কাছে থাকতে হবে। এখনও বলে....।

: থাক না কেন?—বিস্মিত হয়ে ছবি জানতে চায়।

: কেন থাকব? ওই হারেমে ঢুকলে আর কোনোদিন বেরুন যায়? বেগমদের কতগুলো করে বাঁদী থাকে জান? আমি বাঁদী হব না, মরে গেলেও না। বেগমের জন্যে আমার কষ্ট হয় এটা ঠিক কিন্তু আমি ওর কাছে সারাজীবন থাকতে পারবো না—কিছুতেই না। আর তা ছাড়া....।

কি একটা কথা যেন পরীবানু হঠাৎ বলতে গিয়েও থেমে যায়। তার মুখের দিকে তাকিয়েও সে কথার আভাস পাওয়া ছবির সাধ্য নয় বরং রাস্তার লাইট-পোস্টের দিকে তাকিয়ে এবার অন্য কথা মনে পড়ে। ফেরার কথা! পিসিমার কথা!

পড়ি কি মরি করে সে ছোটে। ঝুপড়ি ডাল মেলে অন্ধকার করে রাখা জামগাছটার তলায়, দরজার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ চাপ। মাথার ওপর গাছের ডালে পাখীর ছানাগুলো চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচাচ্ছে।

বিধু লণ্ঠন হাতে করে বেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়: মা, এই তো দিদিমণি।

সিঁড়ির ওপর গম্ভীর নিস্তব্ধ হয়ে পিসিমা দাঁড়িয়ে আছে রাগ থমথমে মুখ নিয়ে।

: কোথায় গিয়েছিলি?—পিসিমা কি এত রাগতে পারে! এত থমথমে হয় মানুষের গলার স্বর!

: পরীদের বাড়িতে।

চোখ কুঁচকে সুকুমারী বলে : পরী কে?

: ওই যে, যার মা খুঁটে দেয়, কাঁথা সেলাই করে।

: সেই পাঠান মেয়েমানুষটা? তাদের বাড়ি গিয়েছিলি তুই ভর সন্ধেবেলা? আরও গিয়েছিস কোনোদিন?—হঠাৎ সুকুমারী টানতে

টানতে ছবিকে নিয়ে সিঁড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয় : আমি ভাবলাম বাগানে খেলা হচ্ছে রোজকার মতো। সন্ধে হয়ে গেছে—দেখি নেই। সঙ্গী হয়েছে তোমার ভালো—একটা খৃস্টান, একটা মুসলমান, একটা চোর....।

: চোর না ! ককখনো কিছু চুরি করেনি নিলু।

: না করেনি, সুকুমারীর মাথায় যেন খুন চেপেছে : সিল্কের ফ্রক পরান সেই মেম-পুতুলটা তবে কোথায় ? আমি আজ দেখিনি ভেবেছিস তোর পুতুলের বাক্সে ? চোর না ! একেবারে সাধু ! আবার ভর সন্ধ্যেবেলা মুসলমানের বাড়ি ঘেঁটে এল—লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, এইজন্যে তোকে এনেছিলাম, এই সব কুশিক্ষার জন্যে !—কান ধরে গালে ঠাস্ করে একটা চড় মারে সুকুমারী, যা কলতলায়—আমি গরমজল করে নিয়ে যাচ্ছি, হাত-পা ধুয়ে তবে ঘরে উঠবি।

পিসিমা তাকে মারল ! বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠছে কান্নায় ! তাকে মারল পিসিমা ! কিন্তু কান্না আসতে দেবে না সে—দাঁতে দাঁত চেপে খানিক সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কলতলায় গিয়ে ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢালে হড় হড় করে—তারপর অন্ধকার ঘরখানায় আলো না জেলেই চুপ চাপ এককোণে বসে থাকে।

নিলু চোর, মিনুরা খৃস্টান, পরীপানুরা মুসলমান। ওদের ছুঁতে নেই, ওদের কিছু খেতে নেই। মানুষকে ছোঁবে মানুষ, তাতে জাত যাবে—তাতে স্নান করতে হবে ! আবার তাদের স্বাস্থ্য পড়ানোর সময় ডাক্তারবাবু আরকে ভেজানো যে মানুষের ফুসফুসটা এনেছিলেন, নাড়তে দিয়েছিলেন তাদের, সে কথা শুনেও পিসিমা তাকে চান করিয়েছিল—বকেছিল।

: মরা-পচা মানুষের টুকরো ! ছিঃ ! রাম রাম।

সে কথা শুনে তারও ঘেন্না হয়েছিল। ফুসফুসটা ধরেছিল বলে সেদিন সে ডান হাতে আর ভাত খেতে পারেনি সেটা ঠিক।

কিন্তু তাই বলে জ্যান্ত মানুষকেও অমন ঘেন্না করা যায় কখনও, আরকে ভেজানো মরা মানুষের ফুসফুসকে ঘেন্না করার মতো ? কেন করে পিসিমা ? কেন তাকে শেখাতে চায় ঘেন্না করানো ? অথচ এমনিতে কত ভালো—কখনও বকে না, কখনও মারে না !

চোখ দিয়ে জল পড়ে অভ্যাসের মতো সে মলিন হাতে তা মুছে ফেলে।

কে যেন তার মাথায় হাত রেখে আদর করে ডাকছে: ও ছবি, লক্ষ্মী সোনা, মেরেছি তোকে—বড্ড রাগ হয়েছিল। ওঠ্—ছবি চল।

কিন্তু ছবি উঠতে চায় না—বিড় বিড় করে কি যেন বলে, বিরক্ত মুখে পাশ ফিরে শোয়।

তাকে দু'হাতে সাপ্টে তুলতে গিয়ে সুকুমারী হঠাৎ চমকে ওঠে: গা গরম। জ্বর হয়েছে!

তুলে দাঁড় করিয়ে দিতেই ঘুমন্ত ছবির শিথিল হাত থেকে ঠকাস্ করে মাটিতে পড়ে—সিল্কের ফ্রক পরা একটা মেম-পুতুল!

ষোল



জ্বরটাকে রাতে আমল না দিলেও পরদিন থেকে সেটা বেশ ভালো করেই বাড়তে থাকে। সারাদিন ছবি প্রায় অচৈতন্য—তার পরের কয়েকটা দিনও। সুকুমারী দিন-রাত তার বিছানার পাশে বসে কাছে, ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে। অবিনাশ মাথার আছে ঝুঁকে দাঁতে-দাঁত চেপে রাখা মেয়েটাকে নাড়া দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন : ছবি! ছবি! কি হয়েছে তোমার? কি কষ্ট হচ্ছে?

ছবি কথা বলে না, কেবল শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কথা বলে যখন তা হয় অসংবদ্ধ প্রলাপ। কান পেতে শুনে শুনে সুকুমারীর কি মনে হয় কে জানে, অবিনাশের কাছে গিয়ে কেঁদে ফেলে : একটাও ঠিক কথা বলছে না, টুকরো টুকরো কথা—কি সব বলছে? কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে, ওর অভিমান হয়েছে।

ভালো হয়ে গিয়ে ছবির সে অভিমানের কথা আর মনে নেই। বরং সুকুমারী মনে করিয়ে দিলে তার হাসি পায়।

সুকুমারী বলে : কি ভয়টাই পাইয়ে দিয়েছিলি, ছবি—বাবাঃ! কি যে বলছিস সব আবোল-তাবোল। আমার এমন ভয় করত।

: যাঃ—ছবি এখন শুনে লজ্জা পায়। সে বুঝি খুব পাগলামো করেছে অসুখের মধ্যে? আরও একবার মা'র কাছে থাকতে এমনি অসুখ হয়েছিল তার, সেবারও কি এমন আবোল-তাবোল কথা বলতো? কে জানে? কেউ তো সে কথা তাকে জানায়নি।

ছবির হঠাৎ নিজের মুখটা দেখতে ইচ্ছে করে কিন্তু আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে চেনাই যায় না যেন মুখটাকে। মুখ আবার এমন বদলে যায় নাকি? কেমন অন্যরকম! কেমন একটু সুন্দর....। কেমন করে হোল? আর কি তাকে বুনো বলবে সুধাদি? এখনও?

বিকেলে বাগানের সিঁড়ির ওপর পুতুলকে কাপড় পরাতে পরাতে নিলুর সঙ্গে গল্প করে ছবি। আজই সে প্রথম বাইরে এসে বসতে পেরেছে। কথা বলতে বলতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছবির মনে হয় এগিয়ে আসা মানুষটাকে যেন সে চেনে। ও সরিফনের মা। পরীবানুদের বাড়িতে একদিন মাত্র দেখেছিল ওকে।

বুড়ি সরিফনের মা'র কিন্তু সরিফন বেঁচে নেই, তবু সবাই তাকে ওই নামে ডাকে—পরীবানুই বলেছিল।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বোঝার ভারে। কাঁকালে একটা ধামা আর হাতে একটা থলে নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে। বেগমের বাড়ির রাঁধুনির যোগানদার ও।

ছবি বলে : ডাক্ তো নিলু, ডাক্ তো ওকে।

: সরিফনের মা! ও সরিফনের মা—, নিলু চেঁচায়।

: কে! কে ডাকছে?—এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুড়ি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

পিলু ছুটে গিয়ে গেট খুলে দেয়, হাতছানি দিয়ে তাকে আরও কাছে আসতে বলে ছবি।

কাঁকালে ধামা আর হাতে বোঝা নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালে বোঝা যায় বুড়ির মাথাটা স্থির থাকছে না, অল্প অল্প কাঁপছে। মুখের সামনের দিকের ক'টা দাঁত নেই, চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, ঝুলে পড়া ভুরুর নিচে ছোট ছোট দুটো চোখ—বিষণ্ণ।

: আমাকে চিনতে পারছো, সরিফনের মা?

বুড়ি ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে চেনবার চেষ্টা করে। নিলু, পিলুর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে : ওদের চিনি। আমড়া আর তেঁতুল খেতে যেত আমাদের পাড়ায়।

ছবি বলে : বোস না তুমি। দুটো বোঝা নিয়ে যে হাঁফিয়ে গেছ।.......পরীবানুকে আসতে বোলো তো........বিকেলে যেন আসে বাগানে।

: ইয়া আল্লা,—বুড়ি হঠাৎ ডুকরে উঠে ধামা নামিয়ে মাটিতে বসে পড়ে, এবার মাথাটা ঘন ঘন কাঁপছে, ছোট ছোট চোখদুটো জলে ভরে

উঠেছে। ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলতে ফেলতে বুড়ি হায় হায় করে: সে কি আছে নাকি?

: নেই?—চমকে উঠে ছবি বলে: কোথায় গেল?

: হায় খোদা! কোথায় তা কি সরিফনের মাকে বলে গেছে বেতমিজ মেয়েটা!........মা'টা বিমারে ভুগছিল কতদিন থেকে, কত তাকে বলেছে রাজী হয়ে যা পরী—বেগম তোকে বাঁদী করে নেবে।....মেয়ে বলে, বাঁদী হবো না। ....মা'টা মরে যাক সেও ভি আচ্ছা!

নিলু শুনে বলে: কেন বাবা। বেগমের বাড়ি চাকরি তো মজারই। ভালো ভালো জামা-কাপড় পরা যায়—ভালো ভালো খাওয়া........!

ছবি বিরক্তমুখে নিলুকে থামিয়ে দিয়ে সরিফনের মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আগ্রহ নিয়ে: তারপর—কি হোল তারপর?

: মা'টা তো মরে গেল চারদিন আগে। পরীকে বললাম—এবার চল বেগমকে বলি: আমার সরিফন নেই—কেউ নেই। তুই আর আমি থাকবো......., সে বলল, আমি লেখাপড়া না শিখতে পারি, ঘুঁটে বেচবো। লেকিন বাঁদী বনেঙ্গে নেহি........।

ছবি বলে: তবে নেই বলছো কেন সরিফনের মা?

: নেই!—হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বুড়ি। গালের কুঁচকানো চামড়া পর্যন্ত কাঁপতে থাকে তার। পর্শুদিন থেকে আর দেখতে পাচ্ছি না তাকে। কত জায়গায় খোঁজ করেছি। বেগমের খানসামা মুন্নাতের সঙ্গে মনে মনে আমি ওর সাদি পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছিলাম—সেও অনেক খুঁজেছে, কিন্তু কোথাও নেই। দীননাথের সঙ্গে চলে গেছে নিশ্চয়ই।

: দীননাথ কে সরিফনের মা?

: কে আবার! বাবুবাজারে গেঞ্জির কারখানায় কাজ করত এক কমবখত ছোকরা—ছবিদের জাতের ছেলে সে। সরিফনের মা'দের পাড়ায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো—পরীর সঙ্গে ভাবও ছিল তার। বেইমান মেয়েটা শেষে তার সঙ্গে..... । আল্লা জানেন, পরীবানুকে কত ভালোবাসতো সরিফনের মা, কিন্তু........।

প্রায় লোল হয়ে আসা শরীরে একখানা আধময়লা কালো-পাড় শাড়ি

আর তার সঙ্গে অদ্ভুত রঙচঙে একটা সিল্কের ব্লাউজ পরেছে। ব্লাউজের গলা নেমেছে বুকের কাছে, হাত দুটো কাঁধ ছাড়িয়ে ঝুলে পড়েছে কব্জি পর্যন্ত, মাথার সামনের ক'টা চুল পেকে একেবারে সাদা হয়ে আছে। সরিফনের মা'র দোল খাওয়া মাথা, পরিশ্রান্ত মুখ আর জল মুছে ফেলা চোখের দিকে তাকিয়ে ছবি যেন হঠাৎ পরীবানুর মুখটাকেই দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে।

আবার ধামা কাঁকালে তুলে, খলে হাতে সরিফনের মা যাবার জন্যে পা বাড়ায়। তার আর কি! রান্নাঘরের যোগানদার হয়ে তিরিশটা বছর তার কেটে গেছে। বুড়ো হয়ে গেছে—এমনি করে খাটতে খাটতে একদিন সে মরে যাবে ওই পরীবানুর মায়ের মতোই। কেউ নেই যে মরবার সময় একবার আল্লার নাম শোনাবে! ভেবেছিল..........কিন্তু বেইমান মেয়েটা....।

নিলু বলে: আচ্ছা তো পরীবানুটা? নারে ছবি?

ছবি কিছু ভাবতে পারছে না। বেত্‌মিজ্‌! কাকে বলে বেত্‌মিজ্‌! সে কি বাঁদী হতে চায়নি বলে, নাকি হিন্দু ছেলের সঙ্গে কাউকে না জানিয়ে চলে গেছে বলে?

কিন্তু ছবি তাকে ভুলবে না। মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া এক অন্ধকার কুঁড়ের মধ্যে তেলের প্রদীপের আলোর সামনে বাংলা বই-এর ওপর ঝুঁকে পড়া একটা মেয়ে! কাশ্মীরে তার দেশ ছিল নাকি একদিন! কিন্তু সে কথা বললে সে হাসে। গোবর মাখা আঙুলে তার মাছি বিন্ বিন্ করে, সেই হাত ধুয়ে ফেলে সে বই-এর পাতা ওল্টায়। বড় দিদিমণির যত ঘুঁটে লাগুক সে দেবে শুধু বড় দিদিমণি তাকে যেন একটু ক্লাসে বসতে দেয়। সে ফার্স্ট হবে কিন্তু তার নাম খাতায় উঠবে না, প্রাইজ পাবে না! সে বেগমের কাছে সুখে থাকতে চায় না—মাকে মরে যেতে দেখেও না। সে মুসলমান কিন্তু হিন্দু ছেলের সঙ্গে তার ভাব........সে!

বিকেলের ছায়া দীর্ঘ হয়ে নামছে পৃথিবীতে, কাঁঠাল গাছটার ঝাঁকড়া ডাল-পাতার মধ্যে এর মধ্যেই অন্ধকার বাসা বাঁধছে। আসন্ন সন্ধ্যাকে ঠিক চোখের দেখায় ধরা যাচ্ছে না···কিন্তু অনুভব করা যাচ্ছে সারাদিনের সমাপ্তিকে—শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ দিয়ে। রাস্তার ও-পাশের বাড়িটা সেই কবে থেকে তালাবন্ধ পড়ে আছে—কেউ খোলে না।

তার চওড়া সিঁড়িতে বসে একটা রাস্তার গরু আরামে রোমন্থন করছে। রাস্তার ওপরের লম্বা হয়ে বহুদূর চলে যাওয়া ইলেকট্রিক তারে একটা বাদুড় উল্টো ঝুলে আছে, মরে গেছে বোধহয় শক্ খেয়ে মরেছে।

নিলুও কখন কথা থামিয়ে দিয়ে পুতুলের বাক্স গুছোচ্ছে মাথা নিচু করে। ছবির আর কিছু ভালো লাগছে না—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়ায়।

গুছোনো পুতুলের বাক্স তার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিলু বলে : এটা নিয়ে যা।

ক্লান্ত গলায় ছবি বলে : ওটা তোর কাছে থাক। আমার আর খেলতে ভালো লাগে না।

তবু নিলুকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে : নে না, আমি বলছি। পিসিমা বকবে কি না ভাবছিস? বকুক গে… …। কদিন পরে তো চলেই যাচ্ছি মার কাছে… …বকলে বয়ে গেল। ও পুতুলগুলো তোকে দিলাম নিলু, তোকে আর পিলুকে।

ওরা গেট খুলে চলে গেলে ভেতরের দিকের দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে রাস্তার দিকে চোখ পড়ে, একেবারে নির্জন হয়ে গেছে এই মুহূর্তে—একটা লোকও যাচ্ছে না। সেই একমুহূর্তের শূন্য রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনটা কেমন করে ওঠে ছবির। মনের ওপর একটা দুঃখ চেপে বসে থাকলে সেটা যেমন ছায়ার মতো সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে, ছবির যেন তাই। কান্না এসেও আসছে না, দুঃখটাও স্থায়ী হচ্ছে না কিন্তু সহ্য করাও যাচ্ছে না। এখন খুব খানিকটা কাঁদতে পারলে যেন শান্তি পাওয়া যেত।

ঘরে গিয়ে সে পেন্সিলের বাক্স থেকে মমতার লেখা সব চিঠি-গুলোকে বার করে। ঠিক পড়া নয়—ঝাপসা ঝাপসা চোখে অক্ষর-গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রথম চিঠিখানায় মা লিখেছিল : ছবি, সোনা আমার। তারপরের খানা : মা ছবি। তারপরের খানা : স্নেহের ছবি। তারপর : কল্যাণীয়া…। সবসুদ্ধ চারখানা চিঠি—এতদিনে মা মাত্র তাকে চারখানা চিঠি লিখেছে আর ক্রমশ তা সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। এছাড়া আর একখানা চিঠি আছে, সেখানা বাবার :

স্নেহের ছবি,

তোমার গ্রীষ্মের বন্ধ কবে হইবে সত্বর জানাইলে তোমার বড়কাকা তোমাকে আনিতে যাইবেন।

তোমার শরীর কেমন আছে? স্কুল কেমন লাগে?

এখানে সকলে একপ্রকার। তোমার মায়ের শরীর ভাল না।

আঃ

তোমার বাবা।

ঝাপসা চোখদুটো হঠাৎ মুছে ফেলে খুশি মুখে এবার চিঠিগুলোকে তুলে রেখে সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। বাবার চিঠিখানা তার সব দুঃখকে ভুলিয়ে দিয়েছে—সে যেন চোখ বুজে গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

অন্ধকারে কে যেন তার মাথার কাছে এসে বসেছে। পিসিমা!

পিসিমার যে কী হয়েছে! থেকে থেকে তার কাছে এসে বসে থাকে, তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় একটু, আবার এক সময় উঠে যায় কথা না বলে। কি যেন একটা বলতে চায় পিসিমা কিন্তু বলতে পারে না।

কি এমন কথা? সে কথা শুনলে কি তার কান্না আসবে? সেই ভয়ে পিসিমা বলছে না! নাকি বলতে গিয়ে পিসিমার নিজেরই কান্না আসবে—সেই ভয়ে বলছে না!

সুকুমারী ডাকে: ছবি!

পিসির গলার স্বর কেঁপে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে ছবির মুখে হাত বুলিয়ে সে আগে বুঝে নেয় ছবি জেগে আছে কিনা। একটু থেমে, একটু ইতস্তত করে কখন একসময় মরীয়ার মতো বলে ওঠে: ছবি, তুই যাস্ নে।

যাস্‌নে!—ছবির স্থির হয়ে থাকা শরীরটা কেঁপে ওঠে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠতে গিয়ে হঠাৎ কান্নটাকে গলার মধ্যে আটকে ফেলে রুদ্ধস্বরে সে বলে: না, আমি যাব।

পিসিমাও কি কাঁদছে! কে জানে! কিন্তু গলার স্বরটা ভার, বলে: তবে আমি কি নিয়ে থাকবো? কাকে নিয়ে থাকবো?

সে কথা ছবি কি জানে! এতদিন যেমন করে ছিল তেমনি

করে থাকবে। এতদিন কি ছবি ছিল! ছবি তো সেদিন এসেছে! তাকে তো কদিন পরেই ফিরিয়ে দেবার কথা ছিল! সে কথা পিসি ভুলে গেছে! সে কি মায়ের কাছে যাবে না—কুসুমপুরে যাবে না! চিরকাল এখানেই থাকবে!

ভয়ে, আশংকায় তার ঠোট কাঁপতে থাকে থরথর করে। সে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে: না, আমি যাব, আমি যাব-ই।

সুকুমারী এবার রোগা দুর্বল মেয়েটার হাউমাউ করা কান্না থামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যতবার ছবিকে কাছে টেনে নিতে যায় ততবার সে ছিটকে চলে যায়, হাত সরিয়ে দেয়, মুখ ফিরিয়ে নেয় আর কেবল কাঁদে। তার চোখের জলে সুকুমারীর হাত ভিজে ওঠে।

: ছবি! ও ছবি! শোন্,—সুকুমারী ব্যগ্র ব্যাকুল গলায় আকুতি করতে থাকে: যাবি। যাবি। জানি তোর মনকে ভোলাবার ক্ষমতা আমার নেই। যাবি তুই—কাঁদিসনে, আর কাঁদিসনে।

তখন ছবি শান্ত হয়, আর সে ছিটকে সরে যায় না, মুখ ফিরিয়ে নেয় না কিন্তু কাঠের মতো শক্ত হয়ে থাকে।

একটা দীর্ঘনিঃশাস ফেলে সুকুমারী বলে, কিন্তু ছবি, আর যে ওরা তোকে আসতে দেবে না। তোর যে লেখা-পড়া কিছুই হবে না। সেবার কত করে নিয়ে এসেছি, এবার একেবারে আটকে রাখবে তোকে।

ছবি বলে: ইস্।

: সত্যি ছবি! তুই তো আমার বাবাকে চিনিসনে। তাঁর কথার ওপর কারুর কথা চলে না। ইচ্ছে থাকলেও কেউ তোকে পাঠাতে পারবে না আর....।

এবার কাঠের মতো শক্ত করে রাখা শরীরটা ছবির আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে সুকুমারীর কাছে ঘেঁসে আসতে থাকে। এবার সে গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবে, আর কাঁদে না।

এবার ওকে কাছে টেনে নিয়ে মাথার ওপর মুখখানা রেখে কানে কানে বলার মতো করে সুকুমারী বলে: গিয়ে কি হবে, ছবি? জানি মা'র জন্যে তোর খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু একটু কষ্ট করে থেকে লেখা-পড়া শিখে মা'র কাছে গেলেই তো বেশি আনন্দ হবে—তাই না?

তার চেয়ে চল ছবি, আমরা পুরী বেড়াতে যাই—মধুপুর যাই। ক—ত নতুন জায়গায় বেড়াব। নাই বা গেলি কুসুমপুরে ছবি!

কুসুমপুর! কু—সু—ম—পু—র! অন্ধকারে তাকিয়ে তাকিয়ে, খুব তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েও তো কই কুসুমপুরকে দেখা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না, চেনা যাচ্ছে না। তার জায়গায় ভেসে উঠছে অন্য কতকগুলো ছবি—পু-রী! মধু—পুর! নতুন দেশ! নতুন জায়গা!

কিন্তু মা! মা!

মা তো লেখাপড়া শিখতেই পাঠিয়েছে তাকে! গেলে যদি আর আসা না হয়! দাদুর কথার ওপর যে কেউ কথা বলতে পারে না! বাবা—না, বড়কা—না, মা—না, ঠাকুমাও না।

কি করবে ছবি তবে! কি করবে! —হঠাৎ পিসিমার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে।

সুকুমারী তার পিঠের ওপর হাত রেখে মুখখানা উঁচু করে তুলে ধরে নিজের জলে ভেজা চিকচিকে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করে: তবে কি করবি, ছবি? যাবি তো?

জানলা দিয়ে এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে পড়েছে কখন যেন, নারকেল গাছের পাতাগুলোর ঝরঝরানি শোনা যাচ্ছে। অল্প অল্প আলোয় ছবির মাথা নাড়াটা কোন্ দিকে ভালো বোঝা যায় না। কি যেন বলছে ও! কি? আকুল আগ্রহ নিয়ে কান পেতে থাকে সুকুমারী।

: তবে আমি যাব না। যাব না আমি!

: ছবি! ছবু!

খুশিতে কি করবে ভেবে পায় না পিসিমা। তার এলোমেলো ছড়ানো চুলগুলো সরিয়ে চওড়া কপালে একটা চুমো খায়, মাথার ওপর হাত রেখে বলে: আমি জানতাম, ছবি। খুব কষ্ট হবে কিন্তু সহ্য করে থাকতে হয়, নইলে কি বড় হওয়া যায়! তোকে অনেক বড় হতে হবে, ছবি। কেমন করে হবি সে কথা আমি জানি না কিন্তু তুই তা জানিস! বড় হলে আমাকে মনে রাখবি তো, ছবি? —এলোমেলো কথা বলে যায় সুকুমারী! ছবি তার কথার উত্তরে কিছু বলে কি না, সে তা দেখতেও চায় না, শুনতেও চায় না। ছোট

শিশুর মতো তাকে বুকের কাছে নিয়ে বসে থাকে সে অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না অবিনাশের সাড়া পাওয়া যায়।

মেয়েটাকে কোলের কাছে নিয়ে কোলটা যখন ভরে উঠেছে মনে হয়, অন্ধকারে যখন খুশি আর দুঃখ মেশান চোখের জল মুছে ফেলছে আঁচলে, তখনই হঠাৎ কেমন করে অবিনাশের জন্যেও একটা নতুন উপলব্ধি হতে থাকে সুকুমারীর।

অবিনাশের একটা মস্ত বড় ব্যথার জায়গা আছে সে কথা তার জানা। সেখানে ঘা দিয়ে দিয়ে যন্ত্রণা সে কেবল বাড়িয়েই দিয়েছে—বুঝবার চেষ্টা করেনি, ভালোবাসা দিয়ে ফেরাবার চেষ্টা করেনি। তাই অবিনাশও ক্রমে ক্রমে দূরে সরে গেছেন, দুজনের মধ্যে মস্ত এক সাগরের ব্যবধান হয়ে গেছে দিনে দিনে।

ছবি এসে সে ব্যবধান অনেকখানি কমিয়েছে—অনেক কাছাকাছি আসতে পেরেছেন তাঁরা ওকে উপলক্ষ্য করে। ছবি তাকে কি দিয়েছে সে জানে না—কিন্তু সুকুমারী তা জানে।

ছবি কেন তাঁর নিজের হোল না! কেন সেই স্বপ্ন দেখা, কল্পনা করা মেয়েদের একটা হয়ে ছবি এল না!

: ছবি!—অবিনাশ ডাকছেন।

সুকুমারী উঠে আলোটা জ্বালিয়ে দিল। একরাশ জামা-কাপড় এনেছেন অবিনাশ, সেদিকে একবার তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে মেয়েটা বসে থাকে।

অবিনাশ বলেন: এই ছিটগুলো নিয়ে এলাম। সঙ্গে দিয়ে দিও—ফিরে আসে ভালোই নইলে থাকবে।

সেগুলো একবার উল্টেপাল্টে দেখে সুকুমারী বলে: ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো তো এই সময় ওকে পুরী নিয়ে যাওয়া ভালো কিনা? ফেরার পথে মধুপুর হয়ে আসব।

: সেকি! ও না বাড়ি যাবে?

: ছবি যাবে না বলছে। ওকে নিয়ে আমরা পুরী যাব।

: যাবে না!—অতি সাধারণ কথা। কিন্তু মনে হয় অবিনাশের

বুক থেকে যেন ভারি বোঝা নেমে গেল একটা : তাহলে তো আরও কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে। একটা লিস্ট করে ফেল কি কি লাগবে। ছবির জুতো, মোজা, জামা, বিস্কুট, ওভ্যালটিন, হরলিক্স—সব লিখো। সব সঙ্গে থাকা ভালো। নতুন জায়গা!

নতুন জায়গা! ছবি শূন্যদৃষ্টিতে জিনিসপত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। পিসেমশাই-এর অনেক টাকা! তাকে কত জিনিস দেয়—কত জিনিস দিয়েছে! আরও আসবে।

সে তো কুসুমপুরে যাবে না। সে নতুন জায়গায় যাবে। মাকে দেখেনি সে ক-ত-দিন! তবু সে যাবে না।

বড়্কা যদি আসে তবে ফিরে যাবে।

মা জিজ্ঞেস করবে, কেন ছবি এলো না?

সে যে লেখাপড়া শিখবে। কুসুমপুর থেকে আর যদি তাকে না আসতে দেয়!

মা চোখ মুছে ফেলে ভাববে, ভালই হয়েছে, আর আমি কাঁদব না! যেমন ছবি ভাবছে, আর আমি কাঁদব না।

সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে থাকে। জামার ছিটগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে দলা পাকায়। নতুন আনা পুতুলটার রঙ করা লাল ঠোঁটটা খুঁটে খুঁটে মেটে রঙটা বার করে ফেলে।

সুকুমারী বলে : ছিটগুলোকে অমন দলা পাকিও না, ছবু! সিল্কের জিনিস সেলাই করতে অসুবিধে হবে।

পিসিমা কি জানে! পিসিমা তার কি জানে! ছবি কান্নাটা চাপবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু অত সহজে কান্না চাপা যায় না।

অনেক রাতে পাশে পিসিমা থাকে না। সে ঘুমিয়েছে মনে করে পাশের ঘরে পিসিমশাই-এর কাছে যায়। রোজ যায়, আবার চলে আসে। পাশে কেউ না থাকলে ছবির ভয় করে কিন্তু পিসিমাকে সে বলেনি সে কথা।

আজও পাশের ঘর থেকে কথার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আজ আর

ভয় করছে না, বুকে মধ্যে কি যেন একটা জমে আছে তার, সেটা ঠেলে ঠেলে ওপরের দিকে উঠছে।

সন্ধেবেলা খানিক কেঁদেছিল কিন্তু তারপর জোর করেই সে কান্নাকে থামিয়ে দিয়ে ভেবেছিল আর কাঁদবে না।

এখন সেই থমকানো কান্না দমকে দমকে তার গাল, বালিস ভিজিয়ে দিতে থাকে। আরও বেশি করে বালিসে মুখটা চেপে ধরে সে—শব্দ না হয়!

—বড়্কা বড়্কা! তুমি তো ফিরে যাবে। মাকে কিন্তু ভাল করে বুঝিয়ে বোলো, মণিদাকে বোলো, উমা, দুর্গা, বাসন্তীকে বোলো, মায়াদিকে বোলো, কুসুমপুরের সব্বাইকে বোলো—ছবি আসবে না। ছবি অনেক লেখাপড়া শিখবে। ছবি নতুন দেশে যাবে।

ন—তু—ন—দেশ!

যাবার আগে ছবির বারে বারে একজনের কথা মনে হয়। কে?

কুসুমপুরের সবায়ের জন্যে তো অনেক কান্না কেঁদেছে সে—আর না। নিলু, পিলুদের তো আবার এসেই দেখতে পাবে। মিনুরাও মামার বাড়ি যাবে ছুটিতে—ওদের কারোর জন্যেই কষ্ট নেই। ও আর একবার দেখতে চায় সেই মেয়েটাকে! সেই মেয়েটা! পিসেমশাই যার বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এসেছিল।

কিন্তু রাগ করলে তো লোকের মুখ লাল হয়, পিসেমশাই-এর মুখ কেমন সাদা হয়ে গিয়েছিল! ছবির হাত-ধরা হাতখানা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল আর কাঁপছিল অল্প অল্প।

সকালে সে অবিনাশের কাজ করার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, পায়াটা আঁচড়ায় নখ দিয়ে। আজকাল পিসেমশাই-এর সঙ্গে তার ভাব—আর ভয় করে না একটুও।

অবিনাশ কাজ করতে করতে এক সময় মুখ তুলে বলেন: কি চাই, ছবি!

: কিছু না।

: উঁহু, কি যেন একটা মতলব আছে মনে হচ্ছে! সেই চাটনীর শিশিটা বুঝি?—হাসেন পিসেমশাই।

: না।

: তবে? পুতুল? তোমার খেলনা-পুতুল সব নিয়েছ তো সঙ্গে?

ছবি বলে: ধ্যেৎ! আমার পুতুল খেলতে ভালোই লাগে না।

: তবে কি ভালো লাগে?

ছবি সে কথার উত্তর না দিয়ে আরও কাছে ঘেঁসে এসে খুব আস্তে আস্তে বলে: সেই পিসিমার কাছে আমাকে একবার নিয়ে যাবেন, পিসেমশাই?

অবাক হয়ে কলম থামিয়ে ছবির দিকে তাকিয়ে অবিনাশ বলেন: কার কথা বলছিস?

: ওই যে ইস্কুলে ভর্তি হবার দিন গেলাম।

: ও সরমা,—পিসেমশাই অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তার দিকে বিষণ্ণ চোখ তুলে জিজ্ঞেস করেন: সেদিনকার কথা বলেছিস বুঝি পিসিমাকে?

ছবি মাথা নেড়ে জানায় যে সে জানায়নি। পিসেমশাই তো বলতে বারণ করেননি—তবু না।

: যাবি? তুই এখনও ওকে মনে রেখেছিস? চল্, আর যাস না ভেবেছিলাম—তোর জন্যেই যাই।

চল্—, বলেও অবিনাশ খানিক বসে থাকেন, দোয়াতের মধ্যে কলমটা ডুবিয়ে তুলতে ভুলে যান, তারপর হঠাৎ একসময় ধড়মড় করে উঠে পড়ে বলেন: চল্ চল্, বাইরে যাবার আগে একবার দেখাটা করেই যাই।

পিসেমশাই কোথাও নিয়ে বেরুলে পিসিমা একটুও আপত্তি করে না, খুশি হয়। কিন্তু আজ জিজ্ঞেস করে: কোথায় যাচ্ছ এত বেলায়! যা রোদ, রোগা মেয়ে!

কি বলবেন বুঝতে না পেরে একটু ইতস্তত করে অবিনাশ ছবির মুখের দিকে তাকান: বল না তোমার মেয়েকে। ও যে যেতে চাইছে!

: কোথায়?—সেটাই জানতে চাইছে সুকুমারী।

পিসেমশাই মাথা নিচু করে আছেন। ছবি বুঝতে পারে সত্যি কথাটা কিছুতেই বলতে পারছেন না তিনি, বলতে পারছেন না মিথ্যে কথাটা।

ঘাড় শক্ত করা জেদ নিয়ে ছবি বলে : যাব না তাহলে বেশ! কোথায় আবার! ভাঙা পাহাড়টার কাছে যে সাঁওতাল পাড়াটা আছে সেই পর্যন্ত। রোদ কোথায়! কোথায় রোদ দেখ না তুমি। সব সময় বাড়ি বসে থাকতে বুঝি ভাল লাগে

সুকুমারী ছবির রাগ দেখে হঠাৎ হেসে ফেলেন। যে বেশি কথাই বলে না, তার মুখে অত কথা শুনে তাঁর আশ্চর্যও লাগে। বলেন : বাবা! মেয়ের রাগ দেখ! কেবল জিজ্ঞেস করেছি কোথায়! যা না, আমি কি বারণ করেছি?

রাস্তায় বেরিয়ে পিসেমশাই একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নেন। আবার সেই ঘোড়ার পায়ের তাল শুনতে শুনতে চলা, সেই দুই পাহাড়ের মাঝখানের সরু পথটায় দুটো ঘোড়ার চারজোড়া পায়ের গম্ভীর শব্দ কান পেতে শুনতে শুনতে কখন নিজেই একসময়ে বুঝতে পারে যে সে এসে গেছে।

এখন তার বুকের মধ্যেটা দুরদুর করে, হাত-পা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসে। নতুন কোনও কিছু দেখলে, কোথাও গেলে তার ওমনি হয়। কেন হয় তা সে জানে না।

অবিনাশের পেছন পেছন গেট খুলে সে ভেতরে ঢোকে। সেদিনকার কুকুরটা তো ছুটে এল না! বারান্দায় অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল পাতা। এমন তো ছিল না সেদিন! ভেতর থেকে খুব ছোট শিশুর কান্নার শব্দ ভেসে আসছে।

পিসেমশাই সে শব্দটা শুনে একবার থমকে দাঁড়ালেন কেবল, তারপর বারান্দায় উঠে দরজার কড়া নাড়লেন।

দরজাটা খুলে গেছে। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কালো, মোটা এক মেমসাহেব। মরমা পিসি তো নয়!

মেমসাহেব! কিন্তু কালো।

এতদিন সে জানতো মেমসাহেবরা নাকি ভীষণ ফর্সা হয়, দুধের মতো সাদা তাদের রঙ। কিন্তু সবাই তা নয়, খুব কালো মেম আছে, সাহেব আছে।

অসীমদা বলেছে, আসলে ওরা মোটেই মেমও না, সাহেবও না। তারা থাকে বিলেতে, ইউরোপে। এরা ভারতবর্ষেরই লোক, সাহেবদের সঙ্গে

কোন্ দিন ওদের পূর্বপুরুষদের কোনও মেয়ের কি ছেলের বিয়ে হয়েছিল, তারপর থেকে বংশ বংশ ধরে ওরাও সাহেব হয়ে গির্জায় যায়, লণ্ডনকে বলে হোম্!

অসীমদা এমন মজা করে কথা বলে—সত্যি না হেসে পারা যায় না!

কিন্তু সরমা পিসির বাড়িতে ওরা কোত্থেকে এল?

পিসেমশাই এতক্ষণ ধরে কি কথা বলছেন? ছবি দেখে, মেমের মাথা নাড়া দেখে পিসেমশাই-এর মুখটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে. তবু বারে বারে কি যেন জিজ্ঞেস করছেন। ফিরে এসে হাত ধরে বলেন: চল ছবি।

: সরমা পিসি কোথায় গেল? চলে যাব কেন?

: নেই!—ছবি তবু পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়, তার কান্না পায়: নেই? কোথায় গেল?

: জানিনে।

: ওই মেমসাহেব জানে। পিসেমশাই, মেমসাহেব জানে।

: না ছবি,—অবিনাশ বলেন: উনি বাসাটা ভাড়া নিয়েছেন। ভাড়াটে কোথায় গেছে উনি কেমন করে জানবেন?

ছবি অনিচ্ছুক পা দুটোকে টেনে টেনে চলতে থাকে। বারে বারে ফিরে তাকায় বাড়িটার দিকে, তার বিশ্বাস হতে চায় না। তার ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে ওই মোটা কালো মেমসাহেবকে নিজে জিজ্ঞেস করে: মেমসাহেব! মেমসাহেব! তুমি নিশ্চয়ই জান! তুমি জান সরমা পিসি কোথায় গেছে? ওই যে কালো, রোগা চেহারা! যার মা অসুখে সব সময় শুয়ে থাকে। যার ছেলে আছে? বিধবা বলে যাকে ক্ষমা করতে হয়। মেমসাহেব তুমি জান!

কিন্তু ছবি যে ইংরিজী জানে না। ইংরিজী না জানলে তো ওদের সঙ্গে কথা বলা যায় না। হঠাৎ অবিনাশের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলে। কেন যে কান্না পায় সে নিজেও ভাল করে বুঝে উঠতে পারে না।

অবিনাশ জোর করে গাড়িতে তোলেন। রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেন: সরবৎ খাবি, ছবি? চল্—আমরা সরবৎ খাইগে।

এখন খেতে ভাল লাগবে না তবু আপত্তি করা যায় না পিসেমশাই-এর

মুখের দিকে তাকিয়ে। খানিকটা অবাক হওয়া, খানিকটা ব্যথা পাওয়া, খানিকটা রাগভরা সেই বিচিত্র মুখখানার দিকে তাকিয়ে ছবি তার কান্নাটাকে গিলে ফেলে গাড়ি থেকে নামবার আগেই।

এরকম দোকানে ছবি কখনও আসেনি। পর্দা দেওয়া ছোট ছোট ঘরের মতো একটাতে পিসেমশাই তাকে নিয়ে বসে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে কি যেন বলে দেন আস্তে আস্তে।

একটু পরেই লোকটা থালার ওপর একটা গেলাস নিয়ে এসে ছবির সামনে রাখে, সাদা সাদা বরফ ভাসছে তাতে। খেতে বেশ ভালো —চুমুক দিতে দিতে সরমা পিসির চলে যাবার দুঃখটা খানিকটা বুঝি ভোলা যায়।

পিসেমশাই-ও খাচ্ছেন কিন্তু তার মতো গেলাসে চুমুক দিয়ে নয়। পাশে রাখা শিশিটা থেকে হলদে কী একটা ঢেলে নিচ্ছেন, তার সঙ্গে সাদা সিরাপ মিশিয়ে খাচ্ছেন। কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ আছে তার।

ছবি যা খাচ্ছে, পিসেমশাই তা খাচ্ছেন না। তবে ওটা কি ?

জিজ্ঞেস করতে যাবে এমন সময় হঠাৎ, চমকানির মতো ছবির মনে পড়ে যায়—মদ! একেই বুঝি মদ বলে! যা খেয়ে প্রথম প্রথম অনেক রাতে ফিরতো পিসেমশাই, যার জন্যে পিসিমা ঢুকতে দিত না ঘরে।

কেমন লজ্জা আর অপরাধ বোধ চেপে ধরে হঠাৎ, হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে থাকে তার।

মদ খাচ্ছেন পিসেমশাই! অনেক চেষ্টায় ছবি একবার মাথাটা তুলে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে মুখটা।

মদ খেলে কি লোকদের চোখ দিয়ে জল পড়ে? পিসেমশাই-এর চোখ দিয়ে জল পড়ে গ্লাসের হলদে জলটার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

পিসেমশাই কাঁদছেন! মদ খেলে লোকেরা কাঁদে তাহলে? তবে কেন খায় লোকে অমন বিচ্ছিরি জিনিস—যা খেলে কাঁদতে হয়।



সাতের

রোগা শরীরটা সেরে উঠে উজ্জ্বলতা মেশান এক নতুন ভাব এসেছে ছবির দেহে। তার চোখদুটো যেন স্বপ্ন দেখে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে আছে। যেন সে কোনও এক আনন্দের সন্ধান নিয়ে এসেছে তার দুচোখ ভরে, তার সারা শরীরে, তার ফুলো ফুলো মুখখানাতে।

আজও নিলু তার কাছে বসে মুখের দিকে ভক্তের মতো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা শুনছে। শুনছে সমুদ্রের কথা, পাহাড়ের কথা, মন্দিরের কথা, মন্দিরের দেবতাদের কথা।

সমুদ্রের ঢেউ এসে ভেঙে ভেঙে পড়ত পাড়ে ছবিদের পায়ের কাছে—ভিজিয়ে দিত। স্নান করবার সময় ভাসিয়ে নিয়ে যেত, আবার ফিরিয়ে দিয়ে যেত। ছবি ঝিনুক কুড়োত বালিতে, আর নুড়ি, শামুকের খোলস। তারা যে হোটেলটায় ছিল তার দরজায় চক্ দিয়ে কাঁচা হাতের লেখা ছিল বড় বড় করে: বালি খুঁড়িলেই ঝিনুক পাওয়া যাইবে।

হয়তো ছবির মতো কোনও মেয়ে ছিল সেখানে, হয়তো কোনও ছেলে—তা কে জানে!

কিন্তু বালি খুঁড়ে ঝিনুক অনেক পেয়েছে ছবি, ছোট-বড় সুন্দর পাথর। সে তার কিছু দিয়েছে নিলু, পিলুদের, কিছু রেখেছে অসীম আর মিনুর জন্যে।

অসীম তাকে চকোলেট দিয়েছিল, সে দেবে তার নিজের হাতে যোগাড় করা সুন্দর পাথর, দেবে ময়ূরের পাখা। খুব খুশি হবে অসীম—নিশ্চয়ই হবে।

ছবি অনর্গল গল্প করে যায়। কথা দিয়েও সে যেন তার নতুন পাওয়া অভিজ্ঞতাকে কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তার সমস্ত মন, চেতনা যেন কতদূর থেকে তার বর্ণনাকে বয়ে আনে।

নিলুর খানিকক্ষণ ভালো লাগে। পিলু চকচকে নুড়ি-ঝিনুকগুলো খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে কিন্তু তারপর আর ভাল লাগে না। ওই ছায়া-ঘন গাছটার তলায় বসে ছবির আনা পুতুলগুলো, একবোঝা খেলনা নিয়ে খেলা করার চাইতেও কি বেশি ভাল এই গল্প আর গল্প!

ছবি ভুলে গেছে পুতুলের কথা, খেলার কথা। ওরা বারে বারে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, বারে বারে উসখুস করছে—ছবির খেয়ালও নেই।

কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হয়েছে। হঠাৎ থেমে গেছে তার কথা। চমকে সে কান পেতে শোনে। তারপর নিলুর মুখের ওপর তার সেই দূরে ভেসে যাওয়া দৃষ্টি ফেলে বলে: কে-রে?

এক উচ্চকণ্ঠের গান ছবিকে চমকে থামিয়ে দিয়েছে।

নিলু বলে: তোরা যেদিন গেলি তার কদিন পরেই ওরা এসেছে ও-বাড়িটায়—ভাড়াটে! বেশ বড়লোক ভাই! কত চেয়ার, টেবিল, খাট এল। ছেলেটার কিন্তু মা নেই! বাবা আছে। খুব আদুরে ছেলে, পড়শোনা করে না—কেবল জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে গান করে।

অনেক খবর যোগাড় করেছে নিলু এরই মধ্যে। ছবির কানে তার কিছু ঢোকে, কিছু ঢোকে না। সে অবাক হয়ে সেই উচ্চকণ্ঠের গান শোনে।

ওইটুকু ছেলে! কতই বা বড় হবে তার চেয়ে। ছবি এবার তাকে দেখতে পাচ্ছে। ওদের উঠোনে দাঁড়িয়ে গুলতি ছুঁড়ছে একটা গাছের ডাল লক্ষ্য করে। বেশ হয়েছে! পাখিটা উড়ে এসে ছবিদের কাঁঠাল গাছের মাথায় বসেছে।

ছেলেটা তেমনি চেঁচিয়ে গান করতে করতে রাস্তার একটা কুকুরের পা লক্ষ্য করে গুলতি ছুঁড়েছে। এবার কুকুরটা হঠাৎ আর্তনাদ করে ছুটে পালাল।

তার সেই কেঁ—উ, কেঁ—উ শব্দটা শুনে ছবির ভারি কষ্ট হয়:

ভারি পাজী তো ছেলেটা! দেখেছিস নিলু—পাখি না পেয়ে কুকুরটার ওপর ঝাল ঝাড়ছে।

তার কথার স্বরেই হোক কিংবা তাদের দেখতে পেয়েই হোক গান থামিয়ে ছেলেটা হঠাৎ চুপ করে গেছে। সে চোখ নামিয়ে এবার মাটিতেই ঠাঁই ঠাঁই করে গোটাকয়েক গুলতি ছুঁড়ে হঠাৎ কি মনে করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

যেন রাগটা ছবির হয়নি, হয়েছে তার।

ছেলেটাকে ভালো করে দেখা গেল ইস্কুলে যাবার দিন। বাড়ির সামনের কাঠের গেটটা ধরে দাঁড়িয়ে একটা চাবুকের মতো জিনিস নিয়ে নিজের মনেই বাতাসে শপাং শপাং করে বাড়ি মারছে আর গুন গুন করে গান গাইছে আপন মনে। ছবিকে দেখে এবার সে জোরে জোরে গেয়ে ওঠে, হয়তো সেদিনকার কথা মনে করে। কিন্তু আজকের গান বাংলা—গায় আর শাঁই শাঁই করে বাতাসে বাড়ি মারে।

হঠাৎ হাসি পায় ছবির, পাগল নাকি ছেলেটা? ওর পড়াশোনা নেই? স্কুল নেই?

কতদূর পর্যন্ত ছেলেটার উচ্চকণ্ঠটা শোনা যায়। গলাটা কিন্তু সত্যিই ভালো। ভালো না ছাই! না—গলাটা ভালোই। বেশ গান গায়।

ছবি কি গাইতে পারে? কে জানে! ছবি তা নিজেই জানে না। গান গাইতে পারলে কিন্তু বেশ মজা!

কি গান গাইছিল ছেলেটা!—: মনের গহনে তোমার মুরতিখানি। ওগো সুন্দর।

মনের গহনে মানে কি? সুন্দর কে!

কিন্তু ও-কথা ভুলে যেতেও বেশিক্ষণ লাগে না মেয়েদের চেঁচামেচিতে। অনেকদিন পরে বন্ধ স্কুল খুলেছে, কত কথা জমা হয়ে আছে—কত গল্প! আবার সারারাস্তা হো হো হি হি। আবার ধুলো ছিটিয়ে মনের খুশিতে চলা। বড় মেয়েরা কিন্তু ছোট মেয়েদের চেয়ে গম্ভীর। তারা নিজেদের

মধ্যে আস্তে আস্তে কথা বলে ওদের কথা অন্যরকম, ওদের গন্ধ অন্যরকম।

ক্লাস নাইনের প্রভাতীদি আসেনি! আর নাকি আসবে না। কেন?

ওমা! বিয়ে হয়ে গেছে যে তার ছুটির মধ্যে! ছবি অবাক হয়ে থাকে—কেমন অদ্ভুত লাগে ভাবতে গেলে। বিয়ে হয়ে গেলে আর বুঝি পড়া হয় না! কেন?

কেন আবার—শ্বশুরবাড়ি থেকে পছন্দ করে না। মেয়েদের পড়া তো বিয়ে পর্যন্তই। এখন আবার কি?

ইস্কুলে ঢুকেই মাঠের মধ্যে আর একদল মেয়ের ভিড়। ওরা কাকে যেন ঘিরে রয়েছে। কে? ক্লাস টেনের মালতীদি, মালতীদির কপালে কত বড় একটা সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে সিঁদুর! মালতীদিরও বিয়ে হয়ে গেছে, ওর শ্বশুরবাড়ি ভালো—পড়তে দেবে বিয়ের পরেও।

ওরা সবাই কি সব জিজ্ঞেস করছে—হাসছে। ওদের সব কথা ছবি বুঝতে পারে না।

মিনু আসেনি? মিনু? ছবি মেয়ের দলের মধ্যে তাকে খুঁজতে থাকে।

তারপর সারাদিন তাদের গল্প চলে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে। মিনুর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা কোথাও মেলে কোথাও মেলে না। কেউ বেশি দেখেছে, কেউ কম দেখেছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না।

কেবল একটা দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে মিনু—ওরা আর বেশিদিন এখানে থাকবে না। অসীম এবার ম্যাট্রিক দেবে তারপর ওরা চলে যাবে মামাবাড়ি—কোলকাতায়। সেখানে অসীম কলেজে পড়বে—মিনু পড়বে ইস্কুলে।

কোলকাতা! ছবির স্বপ্ন সে দেশটা!

সে কথা শোনবার পর থেকে মনটা কেমন খারাপ হয়ে যেতে থাকে মাঝে মাঝেই।

মিনু সান্ত্বনা দেয়: তার তো এখনও দেরি আছে, ভাই।

ছবি মিনুকে সেই ছেলেটার গল্প বলে।

মিন্থু বলে : ভারি পাজী ছেলে তো! ওর মাকে নালিশ করে দিস ?

: ওর তো মা নেই।

: তবে কে আছে ? সব সময় গান-করা ছেলেরা বখাটে হয় জানিস্? তুই তোর পিসিমাকে বলে দিস।

ছবির কিন্তু নালিশ করতে ইচ্ছে করে না। শুধু শুধু পিসিমাকে বলতে যাবে কেন সে—ও তো আর কিছু বলেনি। কিন্তু মিন্থু বলেছে বখাটে! কে জানে!

বিকেলে স্কুল থেকে ফিরবার পথে আবার দেখা যায় ছেলেটাকে—ওদের মাঠটায় একটা সাইকেল নিয়ে অনবরত পাক খাচ্ছে গোল হয়ে আর গান করছে চীৎকার ক'রে। আবার গান! ছেলেটার কি গলাও ভেঙে যায় না ?

বিকেলে যখন নিলুদের সঙ্গে রোজকার মতো বাগানে খেলা করতে আসে তখন দেখা যায়, লম্বা কী একটা জিনিস চোখে লাগিয়ে ছেলেটা তাদের বাগানের দিকেই তাকিয়ে আছে।

নিলু বলে : আজ আমরা ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম জানিস ? খুব বড়-লোক ওরা—তোর পিসেমশাই-এর চেয়েও। ওদের একটা কলের গান আছে, সেটাতে পিন দিতে হয় না—কিছু না, আপনা থেকেই বাজে। তাকে বলে রেডিও। সেখান থেকেই তো গান শেখে সাধনদা। সাধনদার বাবা আমাদের বিস্কুট দিয়েছেন।

ছবি বিরক্তিতে চুপ করে থাকে। কথাটা ঠিকই। পিসিমার কলের গান আছে কিন্তু রেডিও নেই।

নিলু বলে : ডাকবো দেখবি ?

উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই সে হঠাৎ হাত নেড়ে ডাকে : সাধনদা, সাধনদা—আ।

ছেলেটা চোখ থেকে যন্ত্রটা নামিয়ে একবার এদিক-ওদিক তাকায়, গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে বেড়ার কাছে দাঁড়ায়।

রোগা, ফর্সা আর লম্বা চেহারা, চুলগুলো লালচে রঙের, সবায়ের

মতো কালো নয়—ছবি আড়চোখে একবার দেখে নেয় চেহারাটা। ছেলেটা চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে নিলুকে বলে : কে ডাকছিল ? তুমি ?

কৃতার্থের ভঙ্গিতে নিলু বলে : হ্যাঁ আমরা, ছবিও।

: মিথ্যে কথা বলিস্‌নে—আমি ডাকিনি।—ছবি লজ্জিত অপ্রস্তুত আর বিরক্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে।

তার কথা শুনে ছেলেটা একটু হাসে, নিলুকেই বলে : কেন ডাকছিলে ?

: আপনার হাতে ওটা কি, সাধনদা ?

: বাইনাকুলার। এ দিয়ে দূরের জিনিস দেখা যায়।

: আমাদের একটু দেখতে দেবেন ?—নিলু, পিলু দুজনেই এগিয়ে এসে আগ্রহভরা দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকায়।

সাধন ছবির দিকে তাকিয়ে বলে : দেখবে ?

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে ছবি জানায় সে দেখতে চায় না। নিলু, পিলু সমস্বরে বলে : আমরা দেখব, সাধনদা।

যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে খুশিতে নিলু প্রায় চেঁচায় : ও বাবা, ও—ই বক্সীদের বাড়িটা কত কাছে এসে গেছে। কে যেন বসে আছে বারান্দায়—ওদের মেজছেলে! ও বাবা! কী মজা! ছবি ছাখ্‌, ছাখ্‌—দূরের সব জিনিসগুলো ক-ত কাছে দেখাচ্ছে।

খুব মজার জিনিস নিশ্চয়! তবু ছবি শক্ত হয়ে বসে থাকে, দেখতেও চায় না, কোনও রকম আগ্রহ পর্যন্ত প্রকাশ করে না।

নিলুর পরে পিলু দেখে, তারপরে নিলু আরও একবার চোখে লাগিয়ে দেখতে গেলে ছেলেটা হঠাৎ যন্ত্রটা টেনে নেয় হাত থেকে : আর দেখো না— দাও দাও।

আরও দেখবার ইচ্ছেটা ফুরোয়নি নিলুর, সে একটু বিমর্ষ মুখে বলে : আর একদিন দেখাবেন, সাধনদা ? আপনাদের বাড়ি গিয়েই না হয় দেখব।

পিলু বলে : আমাদের আবার বিস্কুট দেবেন, সাধনদা ?

গেট খুলে বেরিয়ে যেতে যেতে ছেলেটা একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে মুখ বাঁকিয়ে বলে : যা যা ভাগ্‌—হ্যাংলা কোথাকার !

নিলুর মুখ সে কথা শুনে একটু ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে, চোখ ছলছল করে : দেখলি ছবি, হ্যাংলা বলল আমাদের !

ছবি এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার সেও হঠাৎ কঠিন গলায় বলে : বলবেই তো। হ্যাংলামোপনা করলি কেন? দেবেন সাধনদা—দেবেন সাধনদা! যেন ওর সঙ্গে কথা না বললে চলছিল না!

চোখদুটো ছলছল করছিল কিন্তু ছবির কথায় তা এবার জলে ভরে ওঠে নিলুর। সে একটু মাথা নিচু করে থাকে, তারপরেই কি মনে করে হঠাৎ খুশি হয়ে উঠে বলে : চল্ ভাই, আমরা খেলিগে। আর কখনও যাব না ওদের বাড়ি।

হয়তো খেলত ছবি। খেলতে বসেছিলও সে কিন্তু আবার ছেলেটার উচ্চকণ্ঠের গান কানে যেতেই উঠে পড়ে বলে : না, আর খেলব না। এখানে খেলা করা আমরা ছেড়ে দেব রে নিলু! বখাটে ছেলেটার জ্বালায় এখানে বসা যাবে না।

তবু সেই ছেলেটারই গান শোনবার জন্যে ছবি বাইরের ঘরে বারে বারে এসে দাঁড়ায়। জানলার ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে চায় ছেলেটা কি করছে।

এখন ওদের সিঁড়ির ওপর বসে একটা বাঁশী বাজাচ্ছে সে। এলোমেলো সুর, ঠিক সুরটা ধরবার চেষ্টা করে বিরক্ত হয়ে শেষে বাঁশীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কতকগুলো ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে এদিক-ওদিক ছুঁড়ে একসময় ছেলেটা কি মনে করে উঠে যায়।

এখন আর গান গাইছে না। মনটা খারাপ নাকি! বোধহয় বাবার কাছে বকুনি খেয়েছে। বেশ হয়েছে!

ছবিরও হঠাৎ গান শিখতে ইচ্ছে করে।

সুকুমারী শুনে হাসেন : ধৈর্য নেই তো কোনও কিছুতেই। মাস্টার রেখে দিচ্ছি—মন দিয়ে শিখলেই হয়।

একাগ্র হয়ে গানের সাধনাতেই লেগে যায় ছবি। ইস্কুল থেকে ফিরে সে মাস্টারের কাছে গলা সাধে, যেদিন মাস্টার আসে না সেদিন নিজে নিজে গায়। গায় আর মাঝে মাঝে কান পেতে শোনে বাইরে ছেলেটা আরও উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছে কিনা।

বিকেলের খেলা ছবিকে ছাড়া কিছুতেই জমে না। নিলু, পিলু

বিমর্ষমুখে তার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ছবির স্বর লেখা খাতাখানা নিয়ে নাড়া-চাড়া করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে যায়।

সাধনাটা বেশ কয়েকমাস চালিয়ে যায় ছবি। কতকগুলো গানও সে শিখে ফেলে। সুকুমারী মাঝে মাঝেই গম্ভীর হয়ে বসে তার গান শোনে, অবিনাশও শোনেন। নিলু, পিলুদেরও শোনায় ছবি। তারপরেই হঠাৎ—একদিন কেমন করে যেন তার খেয়াল হয়, কিছু হচ্ছে না। কিচ্ছু হচ্ছে না!

সে স্বরলিপির খাতাখানা ছিঁড়ে ফেলে। হারমোনিয়ামটার ডালা সেই যে বন্ধ করে দেয়, সুকুমারীর হাজার বলাতেও আর খোলে না, আর গান গাইতে বসে না।

: মাস্টারমশাইকে চলে যেতে হোল। তা কি করবো? আমার এ গান আর ভাল লাগছে না—গলা নেই, কিছু না।—নিজের মনেই বিড় বিড় করে সে কাকে যেন কৈফিয়ৎ দেয়।

এতদিনের গান শেখার সাধনাটা তার একেবারে পণ্ডশ্রম মনে হয় যতই, ততই রাগ আর হিংসেতে তার বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যেতে থাকে। মাস্টার না রেখে, কারুর কাছে না শিখেও ওই ছেলেটা কি করে অমন গলা পেল? অমন করে গান গায় কেমন করে?

হিংসে হয়, রাগ হয় কিন্তু তার সঙ্গে আরও কি একটা অনুভূতি তাকে যেন ক্রমশ বদলে দিতে থাকে। নতুন আর একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে না পারলে তার ভাল লাগে না। এতদিনকার জগৎ তার ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে আসতে থাকে অন্য একদিকে—সে হঠাৎ বই পড়ার স্বাদ পায়।

লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে এসে, বাগানের সিঁড়িতে বসে বসে পড়ে। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

নিলুকে বলে: তুই শোন ভাই—তোরও ভাল লাগবে।

: আমি যে কিছু বুঝি না?

: খুব বুঝবি, শোন্ না আমি পড়ছি।

একটা অনুবাদ করা বিলিতি গল্পের বই এনেছে আজকে। এ দেশের গল্প নয়, ছেলেটা আর মেয়েটা দুজনেই বিদেশী। কিন্তু হলে কি হয়! একটুও অপরিচিত লাগে না।

মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে গেল ডাকাতরা, তার সঙ্গী ছেলেটা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এল কেমন করে তারই গল্প। ছবি মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে থাকে গল্পটা শেষ হয়ে গেলে। মেয়েটা যেন সে নিজে। ছেলেটাকে সে কখনও মণিদার সঙ্গে তুলনা করে, কখনও অসীমের সঙ্গে কিন্তু সব কেমন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গিয়ে অন্য একটা চেহারা ভেসে ওঠে চোখের সামনে—রোগা, ফর্সা আর লম্বা একটা ছেলে, লালচে লালচে চুল।

না, ও কক্‌খনো নয়, ও তো বখাটে ছেলে। বখাটে ছেলেরা কখনও সাহসী হয় না!

নিলুর ও গল্প ভাল লাগে না।

তখন আর একটা বই খুলে বসতে হয় তার জন্যে। পাতালপুরীর রাজকন্যার উদ্ধারের গল্প। একশো-বাইশটা সাপ সেই পাতালপুরীর রাজকন্যাকে পাহারা দিচ্ছে, কে যাবে সেখানে? কার আছে এত সাহস সেই বিষ ওগরানো নিঃশ্বাসের মধ্যে থেকে তুলে আনবে পদ্মের মতো সুন্দর রাজকুমারীকে। যার চোখের জলের প্রতিটি ফোঁটা হয়ে যায় প্রতিটি সোনার পদ্ম!

নিলু নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকে যখন ছবি জোরে জোরে সে কাহিনী পড়তে থাকে, শেষ হলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসটা ছেড়ে বলে: যাক বাবা, রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়েটা হোল শেষ পর্যন্ত!—তারপর খানিক সে ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে, গম্ভীর হয়েই বলে: জানিস্ ছবি, গরীব হওয়া খুব পাপ। মা বলে, আমার নাকি কোনও দিন বিয়েই হবে না, কে বিয়ে দেবে? বিয়ে হয়ে তবু মেয়েরা জামা-কাপড় পায়, গয়না পায়। আমি সে সব কিছুই পাব না। আবার ওদিকে হরনাথের মেসের সুকুমার আমাকে সেদিন একটা শাড়ি কিনে দিয়েছে বলে মা কত মারল! নিজেরাও দেবে না—কেউ দিলেও নিয়ে ফেলে দেবে। হরনাথও মাঝে মাঝে খাওয়ায়, একটা মালা দিয়েছে, পাউডার দিয়েছে। কিন্তু ও ভাই ভারি অসভ্য! বারণ করলেও শোনে না। আমাকে…।

ছবি খানিক অবাক হয়ে নিলুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটাকে বুঝতে চেষ্টা করে। বিয়ের কথা ভাবছে নিলু! বিয়ে।

আজই প্রথম মনে হয় সে আগের চেয়ে খানিকটা বড় হয়েছে। মাঝখানের অনেকগুলো দিন গড়িয়ে গড়িয়ে কেমন করে কোথা দিয়ে কেটে গেছে।

আজ সে নিলুর মুখের দিকে ভাল করে তাকায়, আগের চেয়ে বড় আর সুন্দর হয়েছে নিলু। না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে, দিনরাত অসুস্থ বাবা আর মা'র বকুনি-পিটুনি খেয়েও নিলুর বড় হওয়া কেউ আটকাতে পারেনি। আজ আর ফ্রক নয়, ছেঁড়া একটা শাড়ি পরেছে। নিলু বড় হচ্ছে! সে এখন বিয়ের কথা ভাবে। আর সে বাগানের গাছতলায় রান্না-বাড়ি খেলতে চায় না, চুপি চুপি ছবির পুতুল চুরি করে কাপড়ের তলায় ঢেকে নিয়ে যায় না, ছবির পুতুলের জরি পাড় শাড়ির টুকরো কোমরে গুঁজে রাখে না। তার এখন অন্য চিন্তা। সে গল্প শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

সুকুমারের কথা আগেও দু'একবার বলেছে ছবিকে কিন্তু আজকের মতো এমন করে বলেনি।

ছবি বলে : আর যাসনে তুই ওই মেসটাতে, নিলু। কেন যাস ?

: না গিয়ে উপায় নেই ভাই—মেয়েমানুষের বিয়েটাই তো আসল ও যখন আমাকে বিয়ে করবে বলেছে—দেখি...।

নিলু উঠে চলে গেলে ছবিও বই বন্ধ করে উঠে পড়ে। ধ্যেৎ! রূপকথার গল্পগুলো কেবল বানানো। সত্যি সত্যি যা হয় না তারই গল্প।

নিলুদের মতো মেয়েদের নিয়ে কেউ লিখতে পারে না! আর পড়বো না এ সব গল্প! কেবল রাজকুমার, রাজকুমারী, রাক্ষস, পক্ষীরাজ ঘোড়া! আর কিছু নেই! কিচ্ছু না!



আঠারো

চোখে পড়বার মতোই!

ইস্কুলে যাবার পথে বাঁ-দিকে যে পাঁচিলওয়ালা বাড়িটা আছে, তার দেওয়ালে সাদা রঙের খুব বড় বড় লেখা—কাল হরতাল!

হরতাল মানে কি?—ছবি তা জানে না।

মিনুকে আগে জিজ্ঞেস করতে হবে, মিনুও যদি না জানে তবে অসীমদাকে জিজ্ঞেস করে সে জানবে।

হরতাল!—এমন অদ্ভুত কথা সে কখনও শোনে নি। আজ শেষ হলেই তো কাল? কাল হরতাল!

ইস্কুলের দেওয়ালেও ঠিক তাই লেখা—কাল হরতাল!

সারা রাস্তা বড় মেয়েরা কি সব বলতে বলতে এসেছে। স্কুলে ঢুকে ছবি দেখে মেয়েরা ভাগ ভাগ হয়ে জটলা পাকাচ্ছে এখানে-ওখানে। কেউ বসে আছে। কাঁধে হাত রেখে দু'তিন জন একসঙ্গে ঘুরেও বেড়াচ্ছে মাঠের মধ্যে।

কি যেন একটা হবে! কি হবে?

ছবির মনে হয়, হঠাৎই মনে হয়—ওই মানে-না-বোঝা কথাটাই যেন কি এক নতুন কিছু করবে।

মিনু বলে: চল্, ক্লাস টেনের শোভাদিকে জিজ্ঞেস করিগে।

শোভাদিরা মাঠের একেবারে কোণায় অনেকে দল বেঁধে বসে আছে, কি একটা কাগজ একজন পড়ছে, আর সবাই শুনছে। ওদের দেখে তাড়াতাড়ি কাগজখানা লুকিয়ে ফেলে শোভা বলে: কি রে মিনু?

: হরতাল মানে কি, শোভাদি?

: মানে?—শোভা একটু ইতস্তত করে, অন্য মেয়েদের মুখের দিকে তাকায়, তারপর বলে: অমলাদিকে গিয়ে বলবিনে তো? বেলাদি,

ফুলুদি—কাউকে না! চিনুদি কিন্তু অমলাদির একেবারে ডান হাত, কিছু শুনলেই ওমনি টুক করে গিয়ে লাগাবে, আর সব দোষ পড়বে সুধাদির ঘাড়ে।

ছবি ওরও বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, ব্যাগ্র গলায় বলে : না শোভাদি, কাউকে বলবো না আমরা, বলুন আপনি।

: আমাদের দেশের সব স্বদেশী ছেলেদের ইংরেজরা ধরে ধরে আন্দামানে নির্বাসন পাঠিয়েছিল জানিস তো?

মিনু মাথা নেড়ে জানায়—সে জানে।

ছবি ভাবে অধীরকার কথা! স্বদেশী তো অধীরকা-ও? তাকেও কি আন্দামানে নির্বাসন দিয়েছে?

শোভা বলে চলে : ওখানে ওদের ওপর অত্যাচার করার সুবিধে হয় কিনা? সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়ে সে দেশ—দেশের লোক কিছু জানতেও পারে না তো, যা ইচ্ছে তাই করা যায়।

ছবি মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করে সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পারের দেশটাকে, আরও কাছে ঘেঁসে আসে সে।

: ওরা সেখানে সেই অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছে না, ওরা দেশে ফিরে আসতে চায়। আটকে রাখবে রাখুক কিন্তু দেশের লোকের চোখের সামনে রাখলেই হয়। কি করে সে কথা শোনান যায়? ওদের কথা তো ইংরেজ শুনবে না? অস্ত্র-শস্ত্রও নেই যে লড়াই করবে? তাই ওরা উপোস করে আছে। না খেয়ে শুকিয়ে থাকবে, দেশের লোকের কাছে যতদিন না ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

: কিন্তু ওরা যে মরে যাবে?—ছবির চোখ ছলছল করে, না খেয়ে কি মানুষ বাঁচতে পারে? তার তো কত সময় মন খারাপ হলে খেতে ইচ্ছে করে না কিন্তু বেশিক্ষণ আবার থাকাও যায় না। খুব খিধে পেলে খেতেই হয়। ওরা কি করবে খিধে পেলে?

শোভা বলে : মরবে! মরতে কি ওরা ভয় পায়? আর দেশের লোকই কি চুপ করে আছে নাকি? হরতাল তো সেইজন্যে। সমস্ত বাংলা দেশে কাল দেখিস স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার, অফিস-টফিস, সব বন্ধ থাকবে। কোনও কাজ হবে না। খুব জব্দ হবে ইংরেজ। শেষে বলবে, আচ্ছা মেনে নিলাম তোমাদের কথা—এনে দিচ্ছি

ছেলেদের। তোদের ক্লাসে বলে দিস্, কেউ যেন কাল ইস্কুলে না আসে।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়তেই শোভাদিরা বার করা কাগজগুলোকে আবার বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে লাইন করতে যায়। মিনুরাও যায়। শোভা পেছন থেকে ডেকে বলে: ছবি মিনু, বলে দিস্ কিন্তু মেয়েদের।

ছবির বুকের ভেতরটা উত্তেজনায়, নতুন কিছু একটা হবার আগ্রহে ঢিপ্ ঢিপ্ করে। আজ শেষ হলেই তো কাল! কি হবে কাল? কি যেন একটা হবে!

কেবলই তার মনে হতে থাকে সারা ইস্কুলটায় একটা চাপা ফিস্‌ফিসানি যেন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। টিফিনের সময় রোজকার মতোই আজও মেয়েরা দল বেঁধে বেড়ায়, চিনেবাদাম খেতে খেতে গল্প করে, থেকে থেকে তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় ছবি, তারপর হতাশ হয়ে ফিরে আসে—অন্য কথা বলছে ওরা, অন্য গল্প করছে। হরতালের কথা কেউ বলছে না।

কেবল শোভাদি তার বন্ধুদের নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে কি যেন বোঝানর চেষ্টা করছে। তাদের কথা কেউ শুনছে—কেউ শুনছে না। কেউ একটু দাঁড়াচ্ছে—কেউ পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

ছবির ইচ্ছে করে সেও কিছু বোঝায়। কিন্তু পারে না। কথা বলতে গেলে সব কথা সে গুছিয়ে বলতে পারে না—সব কেমন এলো-মেলো হয়ে যায়। কিন্তু হরতাল সবাইয়ের করা উচিত। না খেয়ে বেশিদিন মানুষ বাঁচে না—ওরা যদি মরে যায়? সাত সমুদ্র, তের নদীর পাড়ের দেশে ইংরেজ ওদের ধরে নিয়ে রেখেছে।

চোখের উপর অধীরকার চেহারাটা ভেসে ওঠে। খাচ্ছে না—না খেয়ে খেয়ে একেবারে রোগা হয়ে গেছে কাকা! হয়তো মরে যাবে। হয়তো মরেই গেছে!—তার কান্না পায়।

কেউ শুনছে না কেন শোভাদির কথা!

শোভাদি বলেছে অমলাদি যেন না জানে! অমলাদি জানলে কি হবে? কি? হেডমিসট্রেসের বুঝি আর কষ্ট নেই? সব দোষ সুধাদির ঘাড়ে চাপে কেন? সুধাদির দোষ কি? দোষ তো ইংরেজের!

আজ সুধাদির ক্লাস জবা দিদিমণি নিয়েছেন। সুধাদি আজ ইস্কুলেই আসেননি।

শোভাদিকে সুধাদি খুব ভালবাসেন—আজ এলে খুব ভাল হোত। শোভাদির কথা কেউ শুনছে না কিন্তু সুধাদির কথা শুনতো।—অসংখ্য টুকরো টুকরো চিন্তায় মাথা ভরে নিয়ে ছবি বাড়ি ফেরে। নিলুকে হরতালের কথা বোঝায় সে। বোঝে কি বোঝে না নিলু, কে জানে। মাথা নাড়ে, শোনে এক মনে।

ছবি খুব গম্ভীর হয়ে বলে : সব যখন বন্ধ হয়ে যাবে, খুব জব্দ হবে তখন ইংরেজ। তখন বলবে—আচ্ছা বাবা, খোল সব, এনে দিচ্ছি ওদের। হরতাল এমনি জিনিস!

অন্তত একটা জায়গা আছে যেখানে সেও শোভাদির মতো বোঝাতে পারে! কথাগুলো এলো-মেলো হয়ে গেলেও কেউ হাসবে না—কেউ ভুল ধরিয়ে দেবে না। কেবল বড় বড় দুটো চোখ অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলোকে শুনবে—না বুঝলেও মাথা নাড়বে।

পরদিন সারা সকালটা ছবি ছট্‌ফট্‌ করে। বইগুলোকে বার করে তার পাতা খোলে বটে কিন্তু পড়তে গিয়ে একবর্ণও তার মাথায় ঢোকে না। বই রেখে বাইরের ঘরের জানলায় চোখ রেখে সে রাস্তা দেখে।

কি যেন একটা হবে! তার মনে হয় রাস্তাটাতেই সেটা প্রথম দেখা যাবে। কি যেন একটা! সে নিজেও তা ভাল করে বুঝতে পারে না! একটা চেঁচামেচি, একটা মারামারি! কি? কি?

কিচ্ছু না! ঐ তো একজন লোক বেশ হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, একজন লোক চলে গেল সাইকেল চেপে। একটা খালি ঘোড়ার গাড়ি ঝর্‌ ঝর্‌ করে চলে গেল—তিনজন লোক কথা বলতে বলতে চলেছে। সব রোজকার মতোই। সব তেমনি আছে!

তবু কি যেন একটা নেই! কি নেই?

: গান! গান নেই! সেই ছেলেটা—সাধন যার নাম, সে আজ

আর গান করছে না। তাকে দেখা পর্যন্ত যাচ্ছে না। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সব কিছু। চীৎকার নেই, মারামারি নেই—নতুন কিছু একটা নেই! না শুনতে পেলে মন খারাপ হয়ে যাওয়া গান পর্যন্ত নেই!

পিসিমা কিন্তু বড্ড চটে যায়, মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, চেঁচিয়ে কানের মাথা খেয়ে দিল রে বাবা। ওর কি মাথার ওপর কেউ নেই?

কেই-বা আছে এক বাবা ছাড়া? ও তো ইস্কুলেও যায় না—বাড়িতে নাকি আলমারী ভরা বই আছে, তাই পড়ে। হরতালের কথা ও কেমন করে জানবে? কিন্তু গেল কোথায়?

ওর নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে ছবির কেমন কষ্ট হতে থাকে, ইচ্ছে করে ছেলেটাকে ডেকে হরতালের কথাটা জানিয়ে দেয়। কিন্তু নিজের থেকে কথা বলতে লজ্জা করে, যদি তাকেও হ্যাংলা বলে! থাক বাবা!

ভেতরে হঠাৎ সুকুমারীর উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়: সে কিরে? একটা দোকানও খোলা পেলিনে?

চাকর বিধু বলে: কি করব? বলল হরতাল, কিছু বেচবে না!

: তবে যা খগেনের দোকান থেকে গোটাকয়েক ডিম আর আলু অন্তত এনে দে। মেয়েটা ইস্কুলে যাবে।

বিধু বিরক্ত গলায় বলে: সেই দোকানই কি খোলা আছে নাকি মা? আসার সময় দেখে এলুম যে পাড়ার এই টুকুন টুকুন সব ছেলেরা মাথায় টুপি দিয়ে ভলান্টারী করছে! বলছে দোকান খুললেই খগেনের মাথা ফাটাবে।

ছবির খুব ভাল লাগে শুনে। তার ইচ্ছে করে ওমনি ভলানটিয়ার হতে। একদিন ভাল না খেলে কি হয়! ওরা যে উপোস করে আছে!

অবিনাশ ঘরে যেতে যেতে সুকুমারীর চেঁচামেচি শুনে বলেন: যা ঘরে আছে তাই দিয়ে চালাও। হরতাল হয়েছে—বিধু তার কি করবে? ছবিদের ইস্কুলও কি আজ হবে নাকি?

আজ তো ইস্কুলে যেতে নেই! পিসিমাকে বলাই হয়নি সে কথা। বলতে গিয়ে হঠাৎ ছবি ফিরে আসে।

এতক্ষণ কি হবে না হবে ভেবে সে রাস্তায় যে অপ্রত্যাশিত কিছু একটা দেখবার আশায় উঁকি মারছিল, এবার সত্যি সত্যি সেদিক থেকে অনেক গলার শব্দ ভেসে আসছে।

একদল ছেলে চলেছে—বড় ছেলেরা আছে, ছবির বয়সী ছেলেরাও আছে। লম্বা লাইন করেছে, কয়েকজনের হাতে নিশান। সামনের একদল ছেলে গান করছে—এলো-মেলো সুর, কথা—বোঝা যায় না ভাল করে।

ওরা চলে যাচ্ছে! কোথায় যাচ্ছে? ইচ্ছে করে ডেকে একবার জিজ্ঞেস করে।

হঠাৎ চোখ যায় সামনের বাড়ির দিকে—সেখানে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে! সেদিনের সেই যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে ও চলে যাওয়া দলটাকে দেখছে।

বেশ তো ছেলেটা! অতটুকু ছেলেগুলো পর্যন্ত রোদে মুখ লাল করে ঘুরছে আর ও ইয়ারকি করে পেছন থেকে হাসছে। ছিঃ, ওর কি লজ্জা নেই! ছেলেটার সঙ্গে একটু ঝগড়া করে আসা যেত যদি!

রাগে কট্‌মট করে সে তাকিয়ে থাকে সেদিকে, ততক্ষণে রাস্তার দলটা এগিয়ে চলে গেছে অনেক দূর!

ওরা কেমন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, চেঁচাবে, পতাকা ওড়াবে। আর সে! ইস্কুলে পর্যন্ত যেতে বারণ। ইস্কুলে না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকলে কীই বা লাভ হোল! কেমন হোল হরতাল—ইংরেজরা জব্দ হয়েছে কিনা কি করে সে বুঝবে? না দেখে সে থাকতে পারবে না। তাকে যেতেই হবে।

ঝি মানদা ছবিকে দেখে অবাক হয়: তুঁই যাইবা স্কুলৎ? কেউ আঁয় না—তিনগো-চারগো আঁয়ে।

কেউ আসেনি! একবার থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে যাবে কিনা! শোভাদিরা নিশ্চয় বকবে। কিন্তু প্রচণ্ড আগ্রহ আবার তাকে সামনে টানে। কেউ আসেনি। সেই না আসাটা কেমন সেটাই ছবি দেখবে।

পাঁচিলটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে ওরা—চারটে মেয়ে। ছবিকে নিয়ে পাঁচজন হয়।

প্রণতি জিজ্ঞেস করে: তুই যে বড় এলি ছবি? তোদের শোভাদি বকবে না?

: তুই এলি কেন?—ছবি পাল্টা প্রশ্ন করে।

: আমি! না এলে বাবা মেরেই ঠাণ্ডা করে দিত না? বাবা যে গভর্নমেন্টের চাকরি করে। আমরা ওসব হরতাল-টরতাল মানিনে।

সুষমা বলে: ধর্ ইস্কুলে গিয়ে যদি দেখি কেউ আসেনি তাহলে কি হবে?

ওপাশ থেকে সবচেয়ে গম্ভীর আর শান্ত মেয়ে অঞ্জলি বলে: হি হি, বেশ হয় তাহলে। ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজিয়ে ইস্কুল ছুটি হয়ে যাবে।

প্রণতি বলে: ভাই বুঝি? কাল অমলাদির সঙ্গে আমার বাবার দেখা হয়েছিল। অমলাদি বলেছেন একটা মেয়েও যদি আসে তাকে নিয়েই চারটে পর্যন্ত ক্লাস করবেন।

ছবিই কেবল একটা কথাও বলে না! সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনে-পেছনে, এদিকে-ওদিকে তাকাতে-তাকাতে যায় কিছু একটা দেখবার আশায়—কিছু একটা ঘটবার আশায়।

সে ঘটনাটা দেখা যায় ইস্কুলের কাছাকাছি এসে।

এখানে-ওখানে ভিড় জমে আছে টুকরো টুকরো। একদল ছেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে রাস্তার ওপরেই, তাদের কয়েকজনের মাথায় সাদা টুপি। কয়েকজন ছেলে হাত জোড় করে রাস্তার ওপর বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকা একদল মেয়েকে কি বোঝাচ্ছে! আর ইস্কুলের মস্ত বড় হাঁ-করা কাঠের দরজাটার সামনে—ও কে? ও কি!

মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে কয়েকজন ছেলে। সামনে হতভম্বের মতো একদল মেয়ে দাঁড়িয়ে, আর কাঠের মতো শক্ত মুখ নিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন অমলাদি। পাশে মোটা লাঠি হাতে দারওয়ান।

কাঠের মতো সেই শক্ত মুখখানা এগিয়ে এসে গম্ভীর গলায় ডাকে: এসো মেয়েরা, দাঁড়িয়ে থেকো না। স্কুলে ঢোক।

আগের থমকে দাঁড়িয়ে পড়া মেয়েদের পেছনে পড়ে গেছে ছবিরা।

মেয়েরা ইতস্তত করছে, অমলাদি আবারও ডাকছেন : কাম্ অন্, দাঁড়িয়ে থাকবে না।

তিনটে মেয়ে ঢুকে যাচ্ছে। কেমন করে ঢুকছে ওরা? ছেলেরা যে শুয়ে আছে! ওরা মাথা নিচু করে শুয়ে থাকা শরীরগুলো লাফিয়ে পার হচ্ছে। কিন্তু বাকী মেয়েরা তো ঢুকছে না! তারা এবার ফিরে দাঁড়িয়েছে—চলে যাচ্ছে! ওরা চলে যাচ্ছে!

এবার ছবিদের দলটাকে ডাকছেন অমলাদি।

ছেলেরা আরও সরে এসে পথটাকে আটকে দিচ্ছে।

মেয়েরা একবার অমলাদির মুখের দিকে তাকায়, যেন তাঁকেই কেবল খুশি করার জন্যে লাল লাল মুখ নিয়ে আলতোভাবে ডিঙিয়ে যায় দেহগুলো।

এবার ছবিকে যেতে হবে। এক মুহূর্তের মধ্যে আশে-পাশে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় সে, কেউ নেই—একটা মেয়েও না! নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগে আর ভয় ভয় করে ছবির!

অমলাদি ডাকছেন : কই ঢোক—তুমিও ঢোক।

কেমন করে ঢুকবে! ওদের ডিঙিয়ে?

ছেলেদের মধ্যে একসঙ্গে তিন চারজন চীৎকার করে ওঠে: বন্দেমাতরম্!

শোভাদি তো বলেছিল : আসিস্ নে ছবি। তবু কেন এল সে! সে নিজেই জানে না কেন এসেছে!

ওদের ডিঙিয়ে যেতে হবে! সে তা পারবে না।

হঠাৎ পেছন ফিরে ছুট লাগায় সে—ছুট! ছুট!

সারা রাস্তাটা প্রায় দৌড়ে বাড়ির কাছাকাছি এসে একবার দিনরাত গান গাওয়া ছেলেটার দিকে তাকায়। যদি দেখা যায় অন্তত তাকেও এই মজার কথাটা বলে নেওয়া যাবে।

কিন্তু তাকে দেখা যায় না।

অসময়ে ফিরতে দেখে সুকুমারী বলে : ইস্কুল বুঝি ছুটি হয়ে গেল, হ্যাঁরে?

ছবি উত্তর দেয় না। কিছুই যেন বোঝে না পিসিমাটা! জানে না যে আজ হরতাল।

কেবল বিকেলে যখন ইস্কুলের পিওন একটা চিঠি দিয়ে যায় পিসে-মশাই-এর নামে তখন একটু ভয় করে। সে খামখানা উল্টে-পাল্টে দেখে, অমলাদি নিশ্চয় তার কথা লিখেছেন। নিশ্চয় তাড়িয়ে দেবেন ইস্কুল থেকে।

রাত্রে ফিরে এসে সেই চিঠি খুলে পড়ে অবিনাশ খানিক গম্ভীর হয়ে থেকে হঠাৎ ডাকেন : ছবি !

ভয় পেয়ে একটু একটু করে ছবি কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

: তুই নাকি স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছিস্ ?

: স্কুল না—দরজার কাছ থেকে।

অবিনাশ হঠাৎ হেসে ফেলেই গম্ভীর হয়ে যান। দরজার কাছ থেকে কিরে ? স্কুলে ঢুকিসনি ?

: ঢুকবো কি করে ? ওরা শুয়েছিল দরজা আটকে। অমলাদি বললেন ওদের গায়ের ওপর দিয়ে যেতে, তাই যাইনি।

: তবে গেলি কেন ? গেলিই যদি তো চলে আসবি কেন ? জানিসনে ওটা সরকারী স্কুল—সরকার থেকে টাকা বন্ধ করে দেবে যে কোনও গোলমাল হলে। গেলি কেন ?

কেন যে গেল ছবিও তো সেটাই ভাবছে। গেলে যে হরতাল ভাঙা হয়—ইংরেজরা জব্দ হয় না এটা সে বোঝেনি।

কে জানে ইংরেজরা জব্দ হয়েছে কিনা !

অবিনাশ বলেন : যাও পড়গে। কাল সকালে আমার কাছ থেকে উত্তর নিয়ে স্কুলে যেও।

কি উত্তর দেবে পিসেমশাই ! কে জানে কি উত্তর !

মিনুকে মারেনি কিন্তু দাদাকে মেরেছে তার মা।

অসীমদাকে ?—শুনে কষ্ট হয় আবার হাসিও পায় হঠাৎ। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে যে ছেলে তাকে আবার কেউ মারে নাকি ?

: মারবে না কেন ? সকালে ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে গেছে প্রার্থনা পর্যন্ত না করে। অনেক বেলায় ফিরে এল মাথায় একটা সাদা টুপি পরে। দাদা নাকি দোকান-ইস্কুল বন্ধ করছিল অন্য ছেলেদের সঙ্গে।

টুপিটা নাকি কংগ্রেসী টুপি। মা সেই টুপি কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে দাদাকে দুটো চড় মেরে ঘরে শেকল দিয়ে রাখল। আমাকে বলল, থাক, তোমাকে আর ইস্কুলে যেতে হবে না—তুমিও আবার কি করে আসবে! তখনই মা কি একটা দরখাস্ত লিখে হাসপাতালে পাঠালো—সেটা নাকি চলে যাবার দরখাস্ত। এখানে আর থাকবে না মা—দাদাকে এবার মামাদের হাতে দিয়ে দেবে। ওখানে শাসনে থাকবে।

অসীমের জন্য ছবির এবার কষ্টে কান্না পায়! অসীমদাটা ভারি ভাল। কি যে ভাল—বলা যায় না। মামাদের হাতে দিয়ে দিলে শাসনে থাকবে? অসীম যাদের বলে, পুলিশ মামা—সেই মামারা?

কিন্তু অসীমদাকে কেউ শাসন করতে পারবে না, কেউ না। পারবে না। দিয়ে দিলেই বা কি?

আজ সবাই এসেছে—সবাই। শোভাদি তাকে দেখে হাসছে দূর থেকে। কেন? কে জানে?

সবাই এসেছে কিন্তু একজন আসেনি—ক্লাসে ঢুকে সেটা টের পাওয়া যায়। সুধাদি! আজও আসেনি সুধাদি।

শোভাদি তো সুধাদির বাড়ির পাশে থাকে। কেন আসছে না সে কথা শোভাদি হয়তো জানে।

টিফিনের সময় ছবি জানতে চাইলে শোভা তার হাত ধরে একপাশে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলে: কাউকে বলিস্‌নে ছবি—সুধাদিকে এ্যারেস্ট করেছে। অমলাদি জানতে পারলেই চাকরি খেয়ে দেবে।

এ্যারেস্ট! কথাটার মানে ছবির জানা আছে। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় ভাবনায়। এ্যারেস্ট করেছে! অধীরকার মতো? যদি আর না ছাড়ে—কোনও দিন না ছাড়ে! একথা কাউকে বলা যাবে না। অমলাদি যেন না জানে! যেন না জানতে পারে!

কিন্তু আশ্চর্য! কেমন করে যেন অমলাদি জেনেছে। কদিন পরে টিফিনে মিনু শুকনো মুখে ছুটতে ছুটতে আসে: সুধাদি চলে যাচ্ছে রে ছবি!

: চলে যাচ্ছে ? সুধাদি কি একদিনও এসেছে যে চলে যাবে ?

: এসেছে। থানা থেকে ছাড়া পেয়ে সুধাদি এসে তার বরখাস্তের চিঠি পেয়েছে।

সেই চিঠি হাতে করে সুধাদি দাঁড়িয়ে আছে দপ্তরীর ঘরের পেছনে বাদাম গাছটার তলায়। শোভাদি আর আরও কয়েকজন মেয়ে ঘিরে আছে—কাঁদছে দু'একজন। তাদের পাশ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ছবিরও এক সময় কান্না পায়।

শোভাদি বলছে : আমরা সবাই মিলে অমলাদির কাছে গেলে কিছু হবে না দিদি ? মেয়েদের সবাইকে বুঝিয়ে নিয়ে যাব।

সুধাদি শুনে করুণভাবে একটু হাসে : না রে, তাতে কি কোনও ফল হয় ? উল্টে তোরাও শাস্তি পাবি। আমি তো পার্মানেণ্ট হইনি—ইচ্ছে করলেই ছাড়িয়ে দিতে তো পারেই। টিচাররা পর্যন্ত চাকরির ভয়ে একটা কথা বলছে না।

—করবার কিছু নেই ! তার মানে সুধাদি চলে যাচ্ছে—যাবেই।

চলে গেল ! একটা ইস্কুলের দিদিমণি, এতদিন পড়িয়েছে ছাত্রীদের,-এতদিন কাজ করেছে—আজ চলে গেল একটা বাইরের লোকের মতো। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের হাত ধরে একটু হেসে, একটু চোখ মুছে চলে গেল সুধাদি বড় কাঠের দরজাটার হাঁ-করা খোলা মুখ দিয়ে।

শোভাদির চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে : জানিসনে তো সুধাদিরা কি গরিব ! তিন-চারটে ছোটো ছোটো ভাই-বোন। বাবা তো বুড়ো মানুষ তার ওপর মাথার গোলমাল হয়ে গেছে কিছুদিন থেকে। বড় ভাই আন্দামানে। ওই একা সুধাদি সংসার চালাত। এখন কি হবে ওদের—কে জানে।

কি হবে কেউ জানে না।

ছবি এই প্রথম সুকুমারীর সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কথা বলে। সুধাদির ঘটনাটা বলে জিজ্ঞেস করে : কি হবে পিসিমা ওদের এখন ?

এমন প্রশ্ন ছবি কোনও দিন করে না, উত্তর একটা দিতেই হবে।

খানিক ভাববার চেষ্টা করে গম্ভীর হয়ে সুকুমারী বলে : সব কপাল! কপাল! কপালে আছে কষ্ট—তার করবে কি?

: কপাল না!—ছবি ঝাঁঝিয়ে ওঠে : অমলাদি তো ইচ্ছে করে ছাড়িয়ে দিয়েছে। সুধাদির তো কোনও দোষ নেই—পুলিশের তো দোষ! নিলুরা এত গরিব—তাও বল কপাল। সুধাদিকে ছাড়িয়ে দিল—তাও বলবে কপাল। তুমি কিছু জান না পিসিমা।

থতমত খেয়ে সুকুমারী বলে : তবে কি? তুই বল্ না।

ছবি খুব ভেবে উত্তর দেবার চেষ্টা করে। শেষে হতাশ হয়ে বলে : আমি তো বুঝতে পারিনে। কিন্তু তুমি কেন বলতে পারবে না? তুমি?

সুকুমারী বলে : আমি কি লেখাপড়া জানি? মুখ্খু মানুষ—আমি অত কথা কোথা থেকে জানব?

তবে কে বলতে পারে? হয়তো মা পারতো!

মা! অনেকদিনের বিস্মৃত নামটা জেগে উঠেছে। সুকুমারী দেখে—ছবির সারা মুখটা লাল, একটা গোপন কথা মনে পড়ে যাওয়ার মতো মুখ হয়ে উঠেছে তার, সেটাকে সে ঢাকতে চায়।

এখন আর কথা বলবে না ছবি—কথা জমবে না। এখন সে চুপ করে বসে থাকবে নিস্তব্ধ হয়ে, আর নয়তো কোনও কোণায় গিয়ে মা'র চিঠিগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে পড়বে। কেউ দেখে ফেললে ভারি লজ্জা পায়। সে লজ্জা সুকুমারী ওকে দেয় না।

তারপর কদিন থেকে সমানে সুকুমারীর পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়ে—কি একটা বক্তব্য আছে তার কিন্তু সুকুমারী বুঝতে পারছে না। অবশেষে অবিনাশ বুঝেছেন।

ছবি সুধাদিকে তার মাস্টার রাখতে চায়। সুধাদির কাছে ছাড়া সে আর কারুর কাছে পড়বে না। পড়বেই না তবে।

অবিনাশ বলেন : রাখুক, আমার তো আর চাকরি যাবার ভয় নেই।

ছবি মিনুকে সে কথা জানালে মিনু বলে : আমারও ইচ্ছে করে ভাই কিন্তু আমাদের তো মাস্টারের কাছে পড়বার মতো পয়সা নেই। আর স্বদেশী করা মেয়েদের মা তো দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

ছবি বলে : তুই আমাদের বাড়ি আসবি। আমরা একসঙ্গে পড়বো।

: আমি? আমরা—, জোর করে ভুলে থাকা, মনে না করতে চাওয়া কথাটাই বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে : আমরা যে চলে যাচ্ছি ভাই। আর তো একমাস—, দুজনেই জানে সে কথা কিন্তু উচ্চারণ করেনি। এখন সে কথা মনে পড়ে দুজনেরই ঠোঁট কাঁপে, চোখ ছলছল করে, কথা এগোয় না।

হঠাৎ ছবি কেঁপে ওঠে, মিনুর গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে : মিনু, তোরা যাস্ নে? সত্যি যাবি ভাই? সত্যি—!

মিনুরও চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে জল পড়ে, মুছে ফেলে সে এক অদ্ভুত কথা বলে : তোরা যে হিন্দু, নইলে আমার দাদার সঙ্গে তোর বেশ বিয়ে হোত, আমরা একসঙ্গে থাকতাম, নারে?

দাদা মানে অসীমদা! নিলুর মুখে সেদিন বিয়ের কথাটা শুনে যেমন অবাক আর আশ্চর্য লেগেছে আজ আর তেমন লাগে না। আজ ছবি মাথা নেড়ে কি বলতে গিয়েও আবার চুপ করে যায়! লজ্জা করে তার, খুশির লজ্জা। অসীমদা খুব ভাল—ছবির খুব ভাল লাগে! বিয়ে হলে ভাল হোত! ওরা যেন না যায়—ভগবান, ওরা যেন না যায়।

কিন্তু চলে গেল মিনুরা।

ছবি খুব কেঁদেছে সুধাদির সঙ্গে স্টেশনে গিয়ে। অসীম কেঁদেছে, মিনু কেঁদেছে, আর আশ্চর্য মিনুর মাও কেঁদেছেন। প্রথমে খানিক অবাক হয়ে থেকে শেষে ছবিকে দু'হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছেন হঠাৎ।

কাঁদতে কাঁদতে সুধাদিকে বলেছেন : কি জানি! যে ভয়ে এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি ছেলেকে—সেটা হয়তো সব জায়গাতেই। শুধু শুধু ছেলে-মেয়েগুলোকে কাঁদালাম।

তিনজনে মিলে খুব কেঁদেছে আর চোখের জলে ঝাপসা মুখ নিয়ে যতক্ষণ পেরেছে মিনু আর অসীমের হাত আঁকড়ে ধরে থেকেছে ছবি—তারপর কখন একসময় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়ি চলে গেছে স্টেশন ছেড়ে। সুধাদি তার হাত ধরে বুঝিয়ে, ভুলিয়ে প্ল্যাটফরমের বাইরে এনেছে, নইলে সে কতক্ষণ কাঁদতো কে জানে!

মিনুর জন্যে তার কান্না পায় ঠিকই কিন্তু অসীমদার জন্যে একটা উদ্বেগ তার মনটাকে ছেয়ে রেখেছে। মামাদের শাসনে থাকতে হবে অসীমদাকে—পুলিশ মামা! কে জানে সেখানে থেকে থেকে হয়তো সে ওই রকমই হয়ে যাবে—মস্তবড় চাকরি করবে, সব ভুলে যাবে পুরনো কথা—ছবিকেও। কোনও দিন দেখা হলেও হয়তো চিনতে পারবে না। মনে করিয়ে দেবার জন্যে তখন কেবল অসীমদাকে একটা কথা বলবে ছবি: চালাও শটাশট—টেগ্‌রার মতো। আর ওর দেওয়া বইটা যত্ন করে রেখে দেবে সে—হারাবে না কিছুতেই। মিনু বলেছিল, হিন্দু হলে অসীমদার সঙ্গে বিয়ে হতে পারত। বেশ হোত তাহলে। হিন্দু না হলে হয় না? কেন? সে কথা সুধাদি নিশ্চয় জানে—কিন্তু জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করে।

সারা রাস্তা নিস্তব্ধ হয়ে একটা কথা ভাবতে ভাবতে এসেছে ছবি: যাদেরই ভালবাসা যায় তারাই কেন চলে যায়? পরিবানুকে ভাল লেগেছিল—সে কোথায় চলে গেল। চলে গেল সরমা পিসি—অসীমদা আর মিনুও থাকল না। চলে যাওয়ার কষ্টটা বড় বিচ্ছিরি—এত কান্না পায়, বুকের মধ্যে কেমন করে; অথচ কাউকে বোঝান যায় না। সুধাদিকেও না।

সুধাদি দেখতে কালো, রোগা আর লম্বা। এলোমেলো চুলগুলো মুখের চারপাশে উড়ে বেড়ায়, সেগুলোকে সরিয়ে দিতে দিতে হাসে—কথা বলতে বলতে হাসে—সবসময় হাসে। সুধাদিকেও তো ভালবাসে ছবি—আর কেমন করে মনে হয় সুধাদিও চলে যাবে একদিন!

কখন অন্যমনস্ক হয়ে শক্ত করে সে সুধার হাত চেপে ধরেছে!

সুধা বলে: কি ছবি? খুব মন কেমন করছে বন্ধুদের জন্যে?

সে কথা স্বীকার করতে গিয়ে আবার গাল বেয়ে জল গড়ায়, ভাঙা গলায় ছবি বলে: সবাই কেবল চলে যায়। আপনিও চলে যাবেন ওদের মতো?

তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে সুধা হাসে: না রে পাগলী মেয়ে। আমি যাব না।



উনিশ

কথা রেখেছিল সুধাদি। দুটো বছর ধরে সুধাদি তার নিত্যসঙ্গী ছিল—তার হাত ধরে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অস্ফুট শৈশবকে সুধাদি কৈশোরের পথে এগিয়ে দিয়েছিল—হয়তো আরও দিত! কিন্তু কি যে হোল!

একেবারে অবাক হয়ে, একেবারে বিহ্বল হয়ে ছবি একদিন আবিষ্কার করল সে বড় হয়েছে। বেশ বড় হয়ে গেছে!

সে তাকালো নিলুর দিকে—নিলু তার দিকে। আরও সুন্দর হয়েছে নিলু। না খেতে পাওয়া—শুকিয়ে যাওয়া হাতে-পায়েও যেন নতুন করে কিসের রঙ লেগেছে!

ছবি তার হাত-পা নেড়ে-চেড়ে দেখে। মাঝে মাঝে অকারণেই সারা শরীর দেখতে পাওয়া আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, স্নান করতে করতে হঠাৎ চুপ করে থাকে।

আর! আর—! বাগানের কামিনী গাছটার তলায় বসে খেলা তাদের আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে কবে নিজেরাই তারা জানে না। আজকাল সিঁড়ির ওপর বসে থাকে বই নিয়ে, নয়তো কোনও সেলাই নিয়ে, নয়তো খালি হাতে। শুধু শুধু।

ও বাড়ির উঠোনে ছেলেটা ঘুরে বেড়ায়, গান গায় কিন্তু গুলতি আর ছোঁড়ে না। ঘুরে বেড়ায় নয়তো বসে থাকে—শুধু শুধু। মাঝে মাঝে সাইকেল করে কোথা থেকে যেন ফেরে, গেটটার কাছ দিয়ে যাবার সময় হাসে একটু, কথা না বলে। কখনও কথা বলে একটা-দুটো—বেশি না।

মাঝে মাঝে পিলুকে দিয়ে গানের খাতায় গান লিখিয়ে আনে ছবি। সুধাদি তা দেখে, দেখে হাসে। সুধাদিও বুঝেছে ছবি বড় হয়েছে। সুধাদি তাকে দেশ-বিদেশের গল্প শোনায়—কবিতা শেখায়:

অন্ধ তব মোহবন্ধ দাও মুক্ত করি,
রেখো না বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী।

সে আর পিলু একসঙ্গে আবৃত্তি করে: চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির—।

নয়তো মুখস্থ করে:

> ক্ষীণপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
> এই চিরপেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে
> এই নিত্য অবনতি, অন্তরে বাহিরে
> এই দাসত্বের রজ্জু—।

সুধাদি আরও কি যেন বোঝাতে চায়: সব মানুষ সমান হবে। এ দেশ স্বাধীন হলে কেমন লাগবে দেখতে। ছবি তা বুঝতে চেষ্টা করে, কখনও পারে—কখনও পারে না।

আর ছেলেটা রোজ দাঁড়িয়ে থাকে—সে ইস্কুলে গেলে তাকিয়ে থাকে। ফেরবার সময়ও। লজ্জা করে কিন্তু ভালও লাগে, মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে সে চলে যায়।

এমনি করেই দিনগুলো হয়তো কাটতো—কাটছিলও।

কোথায় বুঝি যুদ্ধ বেধেছে। ম্যাপ দেখিয়ে সুধাদি [illegible] বোঝায়. কোথায় কোথায় বোমা ফেলেছে হিটলার। কোথায়! সে অনেক দূর। সাত সমুদ্র-তের-নদীর পাড়। তা দিয়ে ছবি কি করবে?

তার নতুন পাওয়া কৈশোর তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ।

ঐ ছেলেটা পিলুর হাত দিয়ে মাঝে মাঝে বই পাঠিয়ে দেয়। সুধাদিও মাঝে মাঝে এনে দেয় কিন্তু আর এক হাতে থাকে আর একখানা বই, বলে: গল্প পড়ার অনেক সময় পাবি ছবি, এটা পড়! বুঝতে শেখ।

অনেক বড় বড় কথা লেখা থাকে তাতে: স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সাম্যবাদ। সুধাদিকে খুশি করার জন্যে ছবি তা পড়ে কিন্তু কতটুকু সময়ই বা থাকে সুধাদি! বাকি সময়টুকু তার একার। তখন কপালকুণ্ডলা হয়ে বনে বনে পথ হারিয়ে বেড়ায়, আয়েষা হয়ে যায় স্বপ্নে, মৃণালিনী হয়ে যায় মনে মনে।

বাগানে গিয়ে নিজের হাতে ফুলগাছ লাগায়। ভাল লাগে তার সব কিছুকে—সব কিছু! গলার স্বর বদলে যায়, চোখের দৃষ্টি নম্র হয়ে আসে, সব সময় বিরক্ত হয়ে থাকা ভাবটা কেটে যায়। কথায় কথায় সে হাসে—উচ্ছল হয়ে ওঠে।

সেই উচ্ছলতাকে বাধা দিয়ে সুধাদি তাকে অন্য কথা বোঝায়: এই একটা সময় যাচ্ছে, ছবি জানিস! ইংরেজের এমন একটা দুর্বল সময় আর হবে না। কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড—ইস্!

বলে: কোলকাতার মিটিং-এ সুভাষ বোস বলেছেন জানিস, সময় এসে গেছে—এখন যদি ঘা দেওয়া যায় ভেতর থেকে ইস্—ইস্।

সুধাদির আজকাল কেবল ঐ সব কথা। আজকাল ঠিকমতো পড়াতেও আসে না, কি করে বেড়ায় কে জানে। সুধাদির কথা মনে হলেই তার অধীরকার কথা মনে পড়ে—কোথায় যেন মিল আছে দুজনের। কোথায়? তা ঠিক বোঝা যায় না।

সুধাদির মুখে শুনে তার ভাল লেগেছে ওদের নেতার কথা: Give me blood; and I will give you freedom! স্বাধীনতা পেতে হলে রক্ত দিতে হবে। অধীরকাও বলত ওমনি কি একটা কথা—কিন্তু সে খুব ছোটবেলায়, এখন আর তা ভাল করে মনে করা যায় না। সে ভাবতেও চায় না। কিন্তু সুধাদি তাকে ভুলতে দিতে চায় না, বলে: ছবি, এ যুদ্ধ আমাদের নয়। মরুক ইংরেজ। একদিকে হিট্‌লার—একদিকে জাপান। ইংরেজের এখন কেমন অবস্থা দেখেছিস?—সুধাদির চোখদুটো যেন জ্বলজ্বল করে: এ যুদ্ধে আমাদের নীতি কি জানিস? না এক পাই—না এক ভাই। কেউ যাবে না ওদের সাহায্য করতে।

কিন্তু তবু সবাই যায়। বক্সীদের বড়ছেলে নাকি যুদ্ধে চলে গেছে। পাড়ায় বেকার ছেলেদের নাকি আর চাকরির ভাবনা নেই। সুধাদির মতো তো কই ওরা ঘৃণা করছে না ইংরেজদের? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বড় বড় লোকের বাড়িতে গিয়ে হাত পেতে যুদ্ধের জন্যে ভিক্ষে নিয়েছেন টাকা—দিচ্ছে কেন তবে লোকে? যাচ্ছে কেন? তবে সুধাদিরা ও-সব কথা বলে কেন? কি ভীষণ করে ভাবতে পারে ওরা—আজকাল প্রায়ই নাকি মিটিং-এ বক্তৃতা দেয়।

ছবি অত ভাবতে পারে না—তার দরকারও নেই। কিন্তু ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন উড়ে যেতে দেখে, দেওয়ালে দেওয়ালে রক্তের মতো লাল রঙে লেখা পোস্টার দেখে তার আতঙ্ক হয়।

আর আতঙ্ক হয় কাল আসবো বলে চলে গিয়ে সুধাদি যখন আর আসে

না। একদিন—দুদিন—তিনদিন। শেষে ওই সাধনই খবরটা দিয়ে যায় তাকে—সুধাদিকে ধরে নিয়ে গেছে মিটিং থেকে।

কেমন করে ও জেনেছে কে জানে?

কেউ ওর কাছে জানতেও চায়নি তবু সেধে সেধে বলে যায়।

মাঝে মাঝে হঠাৎ কোথা থেকে বিকট সুরে সাইরেন বেজে ওঠে, মাঝে মাঝে কোন প্লেন ঝাঁকে ঝাঁকে কাগজ ছড়িয়ে দ্রুত পালায়, সন্ন্যাসী পাহাড়ের মাথা থেকে দুজন কোন্ দেশের গুপ্তচর যেন ধরা পড়ে।

আর আসে মানুষ। বার্মা দেশ থেকে দলে দলে লোক এসে ভরিয়ে ফেলেছে সহরটা—আবার এখান থেকেও চলে যাচ্ছে। এ সহরটা নাকি বিপজ্জনক। লোক আসছে—যাচ্ছে।

কিন্তু সুধাদি আর আসবে না। সেও নাকি এই সহরটার মতোই বিপজ্জনক। সে, না এক পাই—না এক ভাই—বলে জেলে চলে গেছে। সঙ্গে গেছে আরও অনেক ছেলে মেয়ে।

কেমন ত্রাস্ত-ব্যস্ত ভাব সারা সহরে। গুজব-গল্প, ভয়-ভাবনা, ছড়িয়ে আছে রাস্তায়-ঘাটে, ঘরে-বাইরে। ইস্কুলেও!

রাস্তার আলোগুলো ভুতুড়ে হয়ে গেছে। বাড়ির আলোগুলোতেও কালো কালো ঢাকনা পরিয়ে দিতে হয়েছে। আলো জ্বাললে তাদেরও ছায়া পড়ে কালো হয়। আর চমকে চমকে উঠতে হয়।

আজকাল সাধন আর চেঁচিয়ে গান গায় না—গম্ভীর হয়ে গেছে। ইস্কুলে যাবার সময় দাঁড়িয়েও থাকে না। আজকাল বরং ছবিকে দেখলে মাথা নিচু করে। ওর আবার কি হোল!

কান্না পায় নিলুদের অবস্থা দেখে। ছেঁড়া তালি মারা ধুতি পরা, ছেঁড়া বিবর্ণ ছাতা হাতে করে রোজ দশটায় কোর্টে চাকরি করতে যাওয়া লোকটা তবু চালিয়ে যাচ্ছিল সংসার। কিন্তু কবে বুঝি একদিন সে চাকরিও চলে গেলে নিঃশব্দে রোজকার মতোই নিলুর বাবা ফিরে এসেছিল। নিলু বলেছিল, তার বাবার হাঁপানির অসুখ বেড়েছে—বুড়ো হয়ে গেছে তাই চাকরি নেই। পিসিমা বলেছিল, হাঁপানি নয়, বোধহয় যক্ষ্মা।

কে জানে কি! কেউ জানবার আগে, কেউ শোনবার আগে হঠাৎ একদিন নিলুর মায়ের আর্তনাদ শোনা গেল, নিলু-পিলুদের সমস্বর ভয় পাওয়া কান্না শোনা গেল আর সেইদিনই প্রথম সবাই জানতে পারল নিঃশব্দ, জীর্ণ-শীর্ণ বিবর্ণ লোকটা আজ মারা গেছে। নিলু-পিলুর সঙ্গে ছবিও সেদিন খুব কেঁদেছিল—ওদের কাঁদতে দেখে। সারাদিন সেদিন নিলুর মা কেঁদেছিল ঘরের কোণে কাপড় মুড়ি দিয়ে পড়ে থেকে। সেদিন পাড়ার দুএকজন বউ-ও কাছে বসেছিল, উঠে বসবার জন্যে সাধাসাধি করেছিল, কে যেন একটু সরবৎও করে এনেছিল।

পরদিন থেকে নিলুর মা কিন্তু আর কাঁদেনি, আগেকার মতোই চুপ করে থেকেছে নয়তো ঘরের এটা-সেটা কাজ করেছে। আগেকার সেই মিহি পাড়ওয়ালা ছেঁড়া ছেঁড়া শাড়ি পরনে, কেবল হাতের লাল রবারের চুড়ি দুটো ছিল না আর সিঁথিটা সাদা! অন্যদিনের চেয়ে বেশি সাদা!

পরদিন থেকে পাড়ার লোকেরাও আর কেউ খোঁজে নেয়নি। কেবল পিসিমা বিধুকে দিয়ে বাজার করে পাঠিয়ে দিতে। চাল পাঠিয়ে দিত। চাল পাঠিয়ে দিয়েছিল কয়েকদিন কিন্তু রোজ তো আর পিসিমা দেবে না। ছবি সেই পথটা শিখেছে—সে চাল চুরি করে বাগানে রেখে দেয়—পিলু সন্ধ্যার সময় নিয়ে যায়। তাও কি রোজ দেওয়া যায়—মাঝে মাঝে। ছবি আর কত দিতে পারে—তাও শুধু চাল! ওদের কি হবে? কে দেখবে নিলুদের! ওদের যে কেউ নেই!

অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়ায় ছবি—কি করবে সে ভেবে পায় না।

মা একটার পর একটা চিঠি লিখছে পিসিমাকে, তাকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। তাতে কি সে খুসি হবে? কিছুতেই সে কথা সে ভাল করে ভেবে দেখতে চায় না—জোর করে ভাবনাটাকে সরিয়ে দেয়। কাকে সে বলবে? যাবার নাম হলেই পিসিমা ছলছলে চোখে সরে যায়—হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে আসে। পিসেমশাই গম্ভীর হয়ে থাকেন। সুধাদি নেই। ছিল এক নিলু। সেও আজকাল বেশি আসতো না—এলে গম্ভীর হয়ে থাকতো, কি যেন ভাবতো অন্যমনস্ক হয়ে। কয়েকদিন বলেছে, আমি চলে যাব ছবি—এখানে থাকবো না।

ছবি সে কথায় কান দেয়নি ভাল করে।

নিলু তবু বলেছে নিজের মনেই: কেন থাকবো এখানে? পেটভরে ভাত খেতে পাইনে আমরা। আমার একটা আস্ত কাপড় নেই—একটু সাবান মাখতে পাইনে, পাউডার নেই! আমাকে সব দেবে বলেছে—, বলতে বলতে কথা শেষ না করেই দ্রুতপায়ে আবার চলে গেছে মেয়েটা। ছবি কখনও অবাক হয়েছে, কখনও অভিমান করে চুপ করে থেকেছে কথা না বলে। নিলু এসেছে জ্বালাভরা চোখ নিয়ে, নিজের মনে বকবক্ করে আবার চলে গেছে।

ছবি নিজের ভাবনায় এত ডুবে ছিল যে আর একটা বড় হওয়া ক্ষিধে আর কান্না মেশান মুখের দিকে সে তাকায়নি। তাকালেও তার মনের অস্থিরতাকে সে ধরতে পারেনি। সুধাদি থাকলে পারতো—আর বোলতো, এ সব যুদ্ধের পাপ, রাজায় রাজায় যুদ্ধ—ইংরেজ এবার মরবে!

সব খারাপ! সব খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন-কে-দিন! এখন আকাশেই কেবল এরোপ্লেন ওড়ে না, রাস্তায় মিলিটারী ট্রাকগুলো সারা বাড়িটা কাঁপিয়ে চলে যায়!

ভয়-ভাবনা-দুশ্চিন্তায় পিসেমশাই যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন—হয়ে যাচ্ছে সারা সহরের লোক!

আর সবচেয়ে বেশি কান্না পায় সেই কথাটা মনে করলে—ইস্কুলটাই উঠে যাবে। সব মেয়েরা চলে যাচ্ছে এখান থেকে। মেয়েরা চলে গেলে কাকে নিয়ে চলবে ইস্কুল? ইস্কুলটা উঠে গেলে ছবিই বা কেন থাকবে?

তাছাড়া কত কিছু নাকি হতে পারে? বোমা পড়তে পারে, সহরটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সব কিছুই হতে পারে, হতে পারে না কেবল তার পড়াটা! আর দুটো বছর পরেই সে ম্যাট্রিকটা পাস করতে পারতো—কলেজে পড়তে পারতো। এতদিনে পিসিমার আবার মনে পড়েছে ছবি পরের মেয়ে—এতদিনে আবার অধিকার তার হাত বাড়িয়েছে। তারও মনে হচ্ছে, সে নিজের ইচ্ছেয় কিছু করতে পারে না। আসেনি—এখন থাকতেও পারে না।

পিলু পেছন থেকে বলে: দিদি এসেছে, ছবিদি?

: নিলু? কই না তো। নিলু আজকাল আসে না কেন রে পিলু? বলিস, ছবিদি খুব রাগ করেছে।

আসেনি শুনে পিলুর মুখ শুকিয়ে যায়: দিদি তাহলে বোধ হয় সত্যিই চলে গেছে ছবিদি! কাল রাত্তিরে কোথা থেকে যেন বাড়ি এলো—মা জিজ্ঞেস করলেও বলল না। মা তখন চুলের মুঠি ধরে খুব মারলো। দিদি আমাকে বলেছে মেসের অমরদা দিদিকে নাকি একটা চাকরি করে দেবে। সেখানে কোনও কাজ করতে হবে না কিন্তু অনেক টাকা পাওয়া যাবে। অমরদা তো আর সুকুমারের মতো পাজী, মিথ্যেবাদী না। মিথ্যে কথা বলে পালিয়ে যায় না। দিদি বলেছিল, অমরদার সঙ্গে কোলকাতায় চলে যাবে।

কথা শেষ করে তার বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ ছবির মুখে ওপর মেলে দিয়ে কাঁদতে থাকে পিলু: কি হবে ছবিদি? দিদি নিশ্চয়ই চলে গেছে।

ছবি বলে: চল্ তো দেখিগে।

সত্যিই নিলু নেই। বাড়ির আশে-পাশে খুঁজে, এবাড়ি-ওবাড়ি দেখেও পাওয়া গেল না। তার জমানো জিনিসগুলো খুঁজতে খুঁজতে বেরুল কটা ভাঙা-চোরা কাগজের বাক্স, দুটুকরো সাবান, আধশিশি গন্ধতেল, একটা কমদামী পাউডারের কৌটো।

সব কিছুই ফেলে গেছে সে—লুকিয়ে লুকিয়ে রাখতো। পিলুও দেখেনি কোনও দিন।

নিলুর জিনিসগুলো দেখতে দেখতে ছবি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা তুলে দেখে অসহায়, যন্ত্রণামাখা দুই চোখ মেলে দিয়ে সামনে বসে আছে নিলুর মা। সেই দুইচোখের দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভেতরটায় হঠাৎ ধড়ফড় করে ওঠে, নিলু তো চলে গেছে কিন্তু এখন তার ছোট দুটো ভাই-বোন নিয়ে কি করবে তার মা? কি করবে?

কি করে খবর পেয়ে সুকুমারীও চলে এসেছে পিলুদের বাড়ি। উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় উঠে, হতদরিদ্র ঘরখানার যেখানে ছবি মাটিতে লেপ্টে বসে নিলুর জিনিস একটা একটা করে সযত্নে তুলে রাখছে তার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। পা বাড়াতে পারছে না—কে যেন প্রাণপণে চেপে ধরেছে তার পা দুখানা। পাগলের মতো পায়ের কাছে মাথা কুটছে

নিলুর মা—বোকা-হাবা চেহারার একটা বিধবা বউ: ও দিদি, নিলু নেই। খেতে দিতে পারতাম না, ধরে ধরে মারতাম গায়ের জ্বালায়! ও দিদি!

সুকুমারীর চোখ ছাপিয়ে জল আসছে, জল আসছে ছবির চোখে, পিলুর চোখে—এতক্ষণের রুদ্ধশ্বাস ভয়টা একজনের মাথাকোটার শব্দে জল হয়ে বেরিয়ে আসছে। কপালটা ফুলে নীল হয়ে উঠেছে নিলুর মায়ের—মা'র কান্না দেখে নিলুর দু'বছরের ছোট ভাইটাও তারস্বরে কান্না জুড়েছে।

সুকুমারী হাত ধরে তুলে বসিয়ে দিয়ে নিলুর মায়ের মাথা কোটা বন্ধ করে বলে: উনি বাড়ি আসুন। আমি যেমন করে পারি খুঁজে আনবো। কেঁদো না তুমি।

সে কথা শুনে পিলু দুহাতে ছবিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। অজস্র ধারায় ছবির চোখের জল তার মাথার চুলে ঝরে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে ফিস্‌ফিস্ করে সে উচ্চারণ করে: নিলু! নিলু!

চলে গিয়ে পিসিমার হৃদয় জয় করে গেছে নিলু।

পুলিশে খবর দেবার আগে একবার ভাল করে হোটেলটায় খোঁজ করতে যেতে হয় অবিনাশকে। ছবি পিসেমশাই-এর ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে কিন্তু সামনে যায় না, আড়ালে আড়ালে থাকে। তার কেমন করে যেন মনে হয়—সব কথা পিসেমশাই তাকে বলবেন না! সব কথা তার শুনতে নেই, শুনতে গেলে তাকে মিষ্টি করে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেবে ওরা। তাই চিন্তিত মুখে ফিরে আসা পিসেমশায়ের কথা শোনবার জন্যে দরজার আড়ালে লুকোতে হয়—নিলুর কথা যে! কোথায় গেল নিলু! কি খবর এনেছেন পিসেমশাই?

: ওরা ঠিক করে কিছু বলতে পারল না। বলছে তো, লোকটা নাকি মিলিটারী কন্‌ট্রাক্‌টার। কোলকাতা থেকে এসেছিল—কাল হোটেল ছেড়ে গেছে।

: তবে? তবে কি হবে? ওই কি নিয়ে গেছে?

: মিলিটারী কন্‌ট্রাক্‌টার তো, কিসের ব্যবসা তাই বা কে জানে!

ভুলিয়ে ভালিয়ে মেয়ে নিয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। আমি পুলিশে খবর দিয়েছি।

মিলিটারী কনট্রাক্টার! মেয়ে খুঁজতে এসেছিল! তাই নিলুকে নিয়ে গেল! নিয়ে কি করবে? ব্যবসা তো লোকে জিনিস দিয়ে করে—মেয়ে দিয়ে কি ব্যবসা! কি করবে নিলুকে দিয়ে! কি করবে?

হঠাৎ অল্পদিন আগে বড় হওয়া ছবির সারা শরীর কাঁপিয়ে একটা অজানা আতঙ্ক ভর করে। তার ঠোঁট শুকিয়ে যায়, হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যায়, দেওয়ালে মাথা রেখে সে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। একটা বোবা কান্নায় তার গলা বুজে বুজে আসে কিন্তু কাঁদতে পারে না। তার কেবলই মনে হতে থাকে পিসেমশাই জানে না। কেউ জানে না। নিলুকে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে যায়নি—কারুর সঙ্গে যায়নি সে।—একা গেছে। একেবারে একা! যেমন চঞ্চল হয়ে সে কাছে এসে বসতো, যেমন চঞ্চল হয়ে সে উঠে যেত হঠাৎ, ঠিক তেমনি করেই সে বেড়াচ্ছে—কোথায়! কোথায়! আর ফিরবে না নিলু! আর ফিরবে না?

কুড়ি



ভাঙা ভাঙা ঘুমের আচ্ছন্নতার মধ্যেও কেমন করে যেন টের পাওয়া যায় একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামলো। শাড়ির আঁচল গুটিয়ে ছবি উঠে বসে শোনে কে যেন করুণ গলায় ডাকছে তার নাম ধরে।

কে ?

পিসিমা দাঁড়িয়ে আছে খাটের কাছে, ডাকছে : ছবি !—কি যেন বলতে চায় পিসিমা।

ঠোঁট শক্ত কোরে থেকেও কথাটা কেমন করে যেন বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে তার : জানি।

কি জানে ? কে এসেছে সে জানে। পিসিমা কি বলবে তাও সে জানে। অনেক কিছু জেনেছে সে—অনেক অজানা জিনিস।

সুকুমারী বলে : ছোট ছিলি যখন ভুলিয়ে ভালিয়ে রেখেছি—মায়ের মেয়েকে মায়ের কাছে যেতে দিইনি। এখন বড় হয়েছিস—আর তো তোর ওপর আমার জোর নেই—সাহস নেই রাখবার। এখন আমি কি করে থাকবো ছবি ?

হঠাৎ পিলু হাউমাউ করে তারস্বরে কাঁদতে কাঁদতে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে দুহাতে পিসিমাকে জড়িয়ে ধরে। ছোট দু'বছরের ভাইটাকেও সে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে এসেছে। চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে, পিলু বলে : মা মরে গেছে। মা ঝুলে মরে গেছে।

মরে গেছে ! শক লাগার মতো চমকে উঠে সুকুমারী বলে : মরে গেছে কিরে ? চল্‌তো।

পিলুর কান্নায় সুকুমারীর চোখের জল শুকিয়ে যায়, অবিনাশ আসেন, সুখদা আসেন। ছবি দূর থেকে বড়্‌কাকে দেখে, তার কেমন লজ্জা হতে থাকে হঠাৎ—বড় হয়ে যাবার লজ্জা, অনেকদিন না দেখতে পাবার

লজ্জা। আর তার সঙ্গে মিশে থাকে আগ্রহ মেশান এক জিজ্ঞাসার লজ্জা। সব কিছু এক নিঃশ্বাসে জেনে নেবার আগ্রহ।

সুখদা ছবিকে আরও লজ্জা পাইয়ে দেন। খুসি আর বিস্ময়ে মেশান মুখে প্রণাম করা হোলে মুখখানা উঁচু করে তুলে ধরে বলেন: কত বড় হয়ে গেছিস রে ছবি—এঁ্যা! এযে চেনাই যায় না রে! এত ফর্সা হয়েছিস—বেশ বেশ।

তার বেশি কথা বলবার সময় পাওয়া যায় না, ও বাড়ি থেকে সুকুমারী প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে: ও বিধু, ও ছবি। শিগগির দা, বঁটি যা পাস নিয়ে আয়, একটা টুল আন, সব্বোনাশ হয়েছে।

অন্ধকার ছোট্ট ঘরে যেখানে নিলুর মায়ের ঠাকুর থাকতো তারই কড়ি-কাঠে শরীরটা ঝুলছে। বিকট, বীভৎস। সুকুমারী ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে—ছবিকে, পিলুকে পাগলের মতো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে থাকে: যা, বেরিয়ে যা! কি দেখবি তোরা পোড়াকপাল!

কিন্তু ছবি বেরিয়ে যায় না। সেই জিভ বার করা, সারা মুখ নীল হয়ে যাওয়া গলার কাছে মোটা দড়ির মতো শিরা ফুলে ওঠা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে কয়েকদিন আগের কথা। সে গল্প করেছিল তার চলে যাবার কথা, পিসিমাদের চলে যাবার কথা। পিসেমশায়ের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে—ব্যবসা চলছে না। যারা অংশীদার ছিল তারা যার যার অংশ বুঝে নিয়ে কেউ গেছে—কেউ যায়নি। সহরে যদি লোক না থাকে তবে ব্যবসা চলবে কি করে? কেমন করেই বা মানুষ থাকবে সহরে!—বলে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলেছিল। সেইদিনই এসেছিল পিলুর মা সুকুমারীর কাছে, খানিক চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ একসময় বলেছিল: আপনিও নাকি চলে যাবেন দিদি! আমার কি হবে? আমার!—বলে কিন্তু পিসিমার মুখের দিকে তাকায়নি, অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিল।

: তোমার কি কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই যাদের কাছে গিয়ে থাকা যায়? এ সহরে তো থাকা উচিত নয়—সব চলে যাচ্ছে—। নেই কেউ তোমার? —সুকুমারী জিজ্ঞেস করেছিল।

সুকুমারীর প্রশ্নটা যেন নিলুর মা'র কানেই ঢুকলো না—তেমনি হতভম্বের মতোই আবার উঠে চলে গিয়েছিল সে।

তার সেই বোকা বোকা, হাসি হাসি মুখখানা দেখে, তার চোখের দিকে তাকিয়ে সেই দিনই প্রথম হঠাৎ ছবির মনে হয়েছিল: নিলুর মা পাগল হয়ে যাচ্ছে।

কেন মনে হয়েছিল সে জানে না। পাগল সে কখনও দেখেনি—তবু মনে হয়েছিল।

এখনও সে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর পিলু তার ঝুলে থাকা হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে ফ্যাস্‌ফ্যাসে গলায় জানতে চায়: মা কি মরে গেছে ছবিদি? মা কি মরে গেছে?

দড়ি কেটে নামানো শরীরটার ওপর ঝুঁকে পড়ে সুকুমারী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে: হারামজাদা! হারামজাদী কি কম চালাক! সব দায় যন্ত্রণা চুকিয়ে চলে গেল—এখন মরুক ছেলে-মেয়ে দুটো।

হতভম্ব নিলুকে, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মা মা বলে চেঁচানো ছেলেটাকে দুহাতে বুকের ওপর সাপটে নিয়ে, নিলুর মায়ের বুকের ওপর কাপড়টা টেনে দিতে দিতেও কান্না তার থামে না: জানে যে একেবারে ফেলে দিতে পারবে না, তাই মরে পথ করে দিয়ে গেল।

সারাদিন ধরে কেঁদে কেঁদে পিসিমা চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। পিলু আর তার ভাই-কে নিয়ে গিয়ে ভাল করে সাবান মাখিয়ে স্নান করাতে করাতেও কেঁদেছে। স্নান করিয়ে, চুল আঁচড়ে জামা পরিয়ে এমন সুন্দর দেখায় দুজনকে। সুকুমারী মুগ্ধ চোখে ওদের মুখ তুলে ধরে দেখে আর কাঁদে: হতভাগাগুলো! আত্মীয়-স্বজন কোথাও তো তিনকুলে কেউ নেই। সারাজীবন এখন এই বোঝা আমার টানতে হবে!

কিন্তু ছবির মনে হয় পিসিমা মনে মনে খুসি হয়েছে ওদের পেয়ে। খুসি না হোলে কেউ অমন করে পুতুলের মতো বারে বারে ছেলেমেয়ে দুটোকে নাড়াচাড়া কোরে দেখে—মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে! খুসি হয়েছে পিসিমা—যেমন কত-দিন আগে পিসেমশায়ের এনে দেওয়া সুন্দর পুতুল পেলে সে খুসি হোত। ওমনি বারে বারে নাড়া-চাড়া করে দেখতো, ওঠাতো, বসাতো, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতো। পিসিমার

খুসি দেখে তারও আনন্দ হয়। একটা কি যেন বোঝা নেমে যায় মন থেকে। সেটা সে আগে বুঝতো না কিন্তু স্পষ্ট করে বুঝেছে বড়কা আসার দিন যেদিন পিসিমা তার হতাশা আর কান্নাভরা চোখ মুখের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করেছে, এখন আমি কেমন করে থাকবো ছবি?—কারুর কষ্ট দেখলে, কেউ কাঁদলে, কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর দিতে না পারলে সব কিছুতেই তার এক এক সময়ে, এক এক রকম কষ্ট হয়। পিসিমার জন্যেও তার তেমনি উত্তর দিতে না পারার কষ্টটা হচ্ছিল—এখন তাই বোধহয় মনটা হাল্কা লাগে। আর পিসিমা জিজ্ঞেস করবে না, আমি কেমন করে থাকবো ছবি?—আর জিজ্ঞেস করছে না। এখন পিসিমা একেবারে নিজের জিনিস পেয়ে গেছে—ছবিকে আর দরকার নেই!

বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা অভিমানের মেঘ জমা হয়ে আছে, একটা চেপে রাখা হিংসে—কি যেন? কিন্তু তা খুব মৃদু। সেটা সে মাঝে মাঝে অনুভব করতে পর্যন্ত ভুলে যায় পিলুর মুখের দিকে তাকালে।

পিলু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। এ কোণে ও কোণে কেঁদে বেড়ায়, যেমন করে সেও একদিন কেঁদে বেড়াত। ছবি ওর পেছন পেছন বেড়ায়, চোখে চোখে রাখে। তার সবখানিই যে স্নেহ তা নয়, একটা কৌতূহল তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। নিজের ছোটবেলাটা যেন পিলুকে দেখে দেখে সে বুঝে নিতে চায়।

যখন-তখন পিলু চলে যায় ওদের বাড়ির দরজায়, বন্ধ দরজার ওপর মাথা রেখে কাঁদে। ছবি আস্তে আস্তে পিঠে হাত বুলিয়ে বলে: কাঁদিসনে পিলু, কাঁদিসনে।

পিলু জানতে চায়: মা তো মরে গেল, দিদিও কি আর আসবে না ছবিদি?

একথা শুনে কান্না পায়। ভরসা-হারা গলার ওমনি আর একটা জিজ্ঞাসার উত্তর তো ছবি দিতে পারেনি।—রাস্তায় যাওয়া বারণ তবু সেদিন পিসিমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। সাধন এসেছিল, হাসবার চেষ্টা করে বলেছিল: তুমি বুঝি চলে যাবে ছবি? আর আসবে না?

তার দুচোখে কি যেন ছিল, তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিতে হয়েছিল

কথা বলতে গিয়েঃ একবার গেলে কি আর আসা যায়? পিসিমারা-ই তো চলে যাচ্ছেন বাড়ি-টাড়ি বিক্রি করে দিয়ে। আপনারা কোথাও যাবেন না?

: হয়তো যাব। কে জানে, বাবা তো হাঁটা-চলা করতে পারেন না, সব কিছু তো আমাকেই করতে হবে। বাবার জন্যে আমার পড়াটা পর্যন্ত হোল না ছবি—জান? কি-ই বা হোল আমার? কি-ই বা হবে পালিয়ে গিয়ে? এখানেই বোমা পড়ে মরে যাব।—বিমর্ষ গলায় জবাব দিয়েছিল ছেলেটা।

ওর বিমর্ষ ভাবটা ছবিকে পর্যন্ত বিমর্ষ করে তুলেছিল। তা সরিয়ে দেবার জন্যে ছবি অন্য কথা বলেছিল হাসি হাসি মুখ নিয়েঃ জানেন সাধনদা, আগে আপনাকে দেখে কত কি ভাবতাম। রাগ হোত—।

: আর এখন?—এক অদ্ভুত গলায় জানতে চেয়েছিল ছেলেটা তার প্রশ্নের উত্তর।

: এখন!—ছবি সে কথারও উত্তর দেয়নি। আবার তুলেছে অন্য কথাঃ আপনি আর গান করেন না কেন?

: ভাল লাগে না—, ম্লান নিস্তেজ গলায় সে বলেছিলঃ গান আর গাইবো না। মন খারাপ।

: না, না, গাইবেন। এই পাড়াটায় আপনার গান শুনলে তবু মনে হয় যেন বেঁচে আছি। আপনি গান বন্ধ করবেন না।

তারপর যে কদিন ছিল ছবি, গান আবার গেয়েছে ছেলেটা কিন্তু কেমন বেসুরো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে উল্টো-পাল্টা লাইন ধরে গেয়েছে, অর্থহীনভাবে, আর ছবি নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে জানলা ধরে। আর কোনও দিন হয়তো দেখা হবে না ছেলেটার সঙ্গে। বখাটে, ভ্যাগাবণ্ড ছেলেটাকে কতদিনই বা মনে রাখা যাবে—সারা জীবনেও আর যদি দেখা না হয়?

একটা অস্পষ্ট অনুভূতি আর বেদনা—কি যেন। কি যেন! তাকে বোঝা যায় কিন্তু বোঝান যায় না। ছবি সে বোধটাকে ভুলে থাকতে চায় জোর করে।

কিন্তু একটা কথা ভোলা যায় না—একটা বেদনা বোধ চাপা নয়—

প্রত্যক্ষ। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন উড়ছে, রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে মিলিটারী লরি—মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে সাইরেনের আওয়াজ সেই কথাটাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ।

এখন কোথায় সুধাদি যে জোয়ান অফ্ আর্ক পড়াতে পড়াতে একদিন উঠে গেল—আর এল না! থাকলে সব কথা বলতে বলতে একটু কেঁদে নেওয়া যেত।

চলে আসবার সময় যখন কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল তখনও সেই মনটাই তেজী ঘাড় বাঁকানো ঘোড়ার মতো আবার একদিন ফিরে যাবার স্বপ্নও দেখতো। মনে মনে তার একটা স্বপ্ন ছিল, কল্পনা করতো হাসতে হাসতে সে ফিরে যাচ্ছে। জোর করে নিয়ে আসা পিসিমা কত কাঁদছে তাকে রাখবার জন্যে, কত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে তার চোখে একটু জল দেখবে বলে কিন্তু ছবি একটুও কাঁদছে না। কাঁদবে কেন সে? যার কান্না পায় সে কাঁদুক।

সে কথা ভেবে সে নিজের মনে মনেই খুসি হোত।

কিন্তু এ কি হোল? কি যে হোল? পিসিমার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে পিসিমার চেয়ে ছবিই যে বেশি কাঁদছে। কাঁদছে তো কাঁদছেই, সে কান্নার শেষ নেই!

তার মাথাটা কোল থেকে ওঠানোর চেষ্টা করে সুকুমারী বলে: কত কি তো ভেবেছিলাম তোকে নিয়ে। ভেবেছিলাম একটা অনেক লেখাপড়া জানা মেয়ে হবে আমাদের বাড়িতে। দেখতাম অনেক বিদ্যে দিয়ে সেই মেয়ে বিস্তির মতো, আমার মতো কপালকে ঠেকাতে পারে কিনা। কিন্তু হোল না যে।

সে কথা শুনে ছবি কোলের মধ্যে আরও জোরে চেপে ধরে তার মুখ, আরও কাঁদে।

অনেকদিন আগে একদিন এমনি করে কেঁদে ছটফট করে বারে বারে ছিটকে সরে গিয়েছিল সুকুমারীর টেনে নেওয়া কোলের মধ্যে থেকে। আজ সে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চায়।

কান্নার মধ্যে মধ্যে তার হাত-পা এক অনির্দিষ্ট আশংকায় ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চায়। কাল পর্যন্তও এত কথা মনে হয়নি তার। আজ মনে হচ্ছে, কিছু হোল না তার, সব শেষ হয়ে গেল। কি যেন হোল না।

সুকুমারীও বলে: আমি তো চেয়েছিলামই—কিন্তু কপাল তোর। হোল না! তবু চেষ্টা করিস তুই।

পিসেমশায়ের অংশীদাররা সবাই চলে গেছে। অনেক টাকা লোকসান দিয়ে গরিব হয়ে গেছেন পিসেমশাই—দিশেহারা হয়ে গেছেন। বাড়ি দুটো বিক্রি করবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—ছবি তা জানে।

তবু পিসিমা তাকে বাক্স ভরে কাপড় দিয়েছে, জামা দিয়েছে। যা ছবি চায়নি—যা চেয়েছে সব। অনেক দিয়েছে ওরা।

কিন্তু জিনিস দিয়ে কি হয়। টাকার কোনও মূল্য তার কাছে নেই। ও সবে তার দরকার নেই—সে তার পুরনো জীবনটা ফিরে চায়।

ইস্কুল থাক। মিনু চলে গিয়ে কষ্ট হলেও অন্য বন্ধুরা ছিল। নিলু চলে গিয়েছে কিন্তু সাধনকে দেখলে তার আনন্দ হয়। যা নেই, যা গেছে তাকেও তো সে চায় না। কেবল যা আছে তাই থাক।

কিন্তু থাকা গেল না! এই বিপজ্জনক সহরটা সবাইকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। কেউ থাকবে না এখানে!

অবিনাশও কেঁদেছেন গোপনে, চোখদুটো লাল হয়ে আছে। পিসেমশাই স্টেশনে যাবেন না। আজকাল বাড়িতে একা মেয়েদের রাখা যায় না। মিলিটারীর লোকেরা যখন-তখন ঢুকে পড়ছে অনেক বাড়িতে। সবাই যে খারাপ তাও নয়। কেউ হয়তো বাঙালী পরিবার দেখবার লোভে ঢুকেছে—কেউ ঢুকেছে বেহুদ্দ মাতাল হয়ে ভয় পাওয়াতে।

কান্নায় ঝাপসা চোখ নিয়ে না তাকালেও চলতো—তাকানো চলতো পিসিমার মুখের দিকে যে কিছুতেই ছবির হাত ছাড়তে চায় না, পিলুকে, তার ভাইকে একেবারে আপনার করে পেয়েও।

তবু চোখ যায় সাধনদের বাড়ির দিকে। গেট ধরে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবির দিকে তাকিয়ে সে একবার হাসবার চেষ্টা করে, ছবিও চেষ্টা করে কিন্তু চোখের জল ঠেকান যায় না।

যতক্ষণ গাড়িটা দেখা যায় সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেদিকে—

বিন্দু হয়ে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। এ বাড়ির গেট ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সুকুমারী কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠা শরীর নিয়ে।

ও বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে থাকে বখাটে, ভ্যাগাবণ্ড দিনরাত গান গাওয়া একটা ছেলে।

একদিন খুব ভোরে যে মেয়েটা এই ধুলো ধুলো বিষণ্ণ শহরটাকে দেখে ভুরু কুঁচকেছিল—খুশি হতে পারেনি—আজ সে জলভরা চোখ নিয়ে সেই ফেলে আসা শহরটাকে একান্ত আগ্রহে দেখতে চায়।

পাহাড়ের মাঝখানের পথ দিয়ে গাড়ি চলে, পথের ওপরের দুটো একটা বুনো পাহাড়ী গাছে আগুন-জ্বলা লাল ফুল ফুটেছে। পাহাড়ের গা থেকে দুটো একটা বুনো লতা ঝুঁকে পড়েছে নিচের দিকে, মাথায় ফোটা ফুল নিয়ে—ঝুঁকে পড়ে যেন ছবিকে চলে যেতে বারণ করছে। চওড়া বাঁধানো রাস্তাটায় পড়লে সে সব আর দেখা যায় না—সে রাস্তা অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়ার শব্দে মুখর। সব মানুষ শহর ছেড়ে পালাচ্ছে।

ভীষণ ভিড় স্টেশনে—গাড়িতে। সবাই ব্যস্ত, কোনও মতে পালাতে পারলে বাঁচে। এতটুকু জায়গা চাই—এতটুকু! বসতে চায় না, শুতে চায় না—পা দুটো রেখে দাঁড়িয়ে যেতে পারলেই হয়। অনুরোধ—ঝগড়া—গালাগালি—মারামারির শব্দে সমস্ত প্ল্যাটফরমটা মুখর। সেখানে তেমনি সব পাখাগুলো ঘুরছে—ঢাকনা পরানো আলোগুলো সব জ্বলছে কিন্তু তাতে আলো কোথায়! যা সব অন্ধকারকে দূর করে দেয়, যা দেখলে মন খুশি হয়ে ওঠে? জানলায় মাথা রেখে সেদিকে ছবি তাকিয়ে থাকে চুপ করে।

যাত্রীরা কথা বলে—নিশ্চিন্ততার কথা।

—ওদের কি কোনও কষ্ট হচ্ছে না! ওরা কি কিছু হারায়নি? কে জানে। কিন্তু ছবি যেন কি হারিয়ে এসেছে!

কি? নিজেও তা বুঝতে পারছে না ঠিক করে কিন্তু একটা কথা বুঝছে—এই শেষ! আর কোনও দিন এখানে আসতে পাবে না সে।

চলন্ত গাড়ির চাকার ঘষায় ঘষায় যেন তার কথারই প্রতিধ্বনি হতে থাকে, আর কোনও দিন! আর কোনও দিন না! কোনও দিন! কোনও দিন না! না—না—না!

একুশ

এসে গেছে—ছবি এসেছে—, কে যেন কাকে ডেকে বলে কথাটা। ছেলেমেয়েরা কলরব করে দৌড়য় সে কথা শুনে। কাকীমা সরস্বতী দৌড়য় না কিন্তু কাজ ফেলে দ্রুতপায়ে সেও উঠে যায়।

কেবল ওঠেন না মমতা। তাঁর খুন্তিধরা হাতখানা আড়ষ্ট-শক্ত হয়ে থাকে, ইচ্ছে করলেও যেন তাকে নাড়ানো যায় না। কিন্তু সে একটা মুহূর্ত। তারপরেই আগ্রহ-ব্যাকুলতায় বুকের মধ্যে দাপাদাপি করতে থাকে, দুচোখ হঠাৎ কখন ঝাপসা হয়ে ওঠে জলে।

এসেছে। রুক্ষ চুল দোলানো, মাঠ-ঘাটে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুরে বেড়ানো, কারণে অকারণে গালাগালি আর মার-ধর খেয়েও চোখের জল মুছে ফেলে হেসে ওঠা, তাঁর সেই ছবি!

কিন্তু সত্যিই কি এসেছে? নাকি অনেক না ঘুমোন রাতের চোখের জলে মেশা ভাবনার মতোই ছায়া ছায়া হয়ে মিলিয়ে যাবে তার চেহারাটা?

সরস্বতী দরজার কাছে এসে ভেতরে তাকিয়ে বলে: ওমা, কেমন ধারা মা আপনি? এতদিন পরে মেয়েটা এল—আপনি রইলেন রান্না নিয়ে!

অনেকদিন পরে এল! কতদিন সেটা? সেই যে কবে যেতে না চাওয়া মেয়ের কান্নাভরা মুখখানাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ফিস্ ফিস্ করে বলেছিলেন, তুই আমার বড় আশার জিনিস রে ছবু!—সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন। কিসের আশায় জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন দূরে তা তিনিও জানেননি ভাল করে সেদিন, ভাবেননিও।

তারপর কতদিন—কতরাত কেঁদেছেন। প্রদীপ রাগ করে নিঃসম্বল হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে বুক ভাঙা কান্না কেঁদেছেন লুকিয়ে লুকিয়ে। গোপন করে রাখা যন্ত্রণা চোখের জলে হাল্‌কা হয়ে গেছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি কেঁদেছেন তিনি ছবির জন্যে, সে যত্নে আছে, সুখে আছে জেনেও। সে কান্নার জল বাইরে পড়েনি—জমা হয়েছে। দেখতে না

পাওয়ার দুঃখে কেঁদেছেন—কাছে পাবার আকুলতায় ছট্‌ফট্‌ করে ভেবেছেন বাজপাখি হয়ে মেয়েকে ছিনিয়ে আনবেন সুকুমারীর হাত থেকে। কিন্তু সেই আশাটা। সেই না বোঝা, না জানা আশাটা আবার থমকে থামিয়ে দিয়েছে মাঝপথে। না দেখে দেখে ওর চেহারাটকেও যেন আর স্পষ্ট করে মনে করা ভুলে গিয়েছিলেন কিছুদিন থেকে। কেবল অনুভব করতেন—কোথায় যেন একটা কিছু তাঁর জমা করা আছে। একদিন সেটা সম্পদ হয়ে দেখা দেবে। কেমন করে তা তিনি জানেন না, জানতেও চাননি।

সেই তো এসেছে! কিন্তু তবু তাকে দেখতে ছুটে যেতে পারছেন না। কি এক অলক্ষ্য আশংকা যেন মনটার ওপর চেপে বসে আছে সকাল থেকে, আসবে শোনার প্রথম আনন্দটা থিতিয়ে যাবার পরেই। সে আশংকা যেন মাঝে মাঝে তাঁর হৃদপিণ্ডটারও চলা বন্ধ করে দিতে চাইছে। ভয় পাইয়ে দিচ্ছে তাকে, চমকে দিচ্ছে! কেন তাও বুঝে উঠতে পারছেন না মমতা।

রান্নাঘরের দরজার কাছে বড়-ছোট গলায় কারা যেন একসঙ্গে কলরব করে ওঠে, হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কে যেন বলে: জ্যেঠিমা, ও জ্যেঠিমা, এই যে ছবু!

স্পষ্ট গলায়, মৃদুস্বরে কে যেন ডাকে: মা!

—কে!—এতক্ষণের সব ভাবনা ভুলে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে তাকান মমতা। দুচোখ তাঁর মুখের ওপর রেখে এক কিশোরী এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

ছবু! আমার ছবু!—একটা মুহূর্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মেয়ের দিকে, তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে ছোট শিশুকে বুকে নেবার মতো দুহাত বাড়িয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরেন। ঠোঁট দুখানা থরথর করে কেঁপে ওঠে একবার তারপরেই হঠাৎ কেঁদে ফেলেন ঝরঝর করে।

একটুখানি স্তব্ধ হয়ে থেকে, মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে জলে ভেজা চোখে মেয়ে হাসে: তোমাকে এখনও প্রণাম করিনি যে মা। দাঁড়াও আগে প্রণাম করি।

সরস্বতী বলে: যান দিদি! কতদিন পরে এলো মেয়েটা—কাছে নিয়ে একটু বসুন গে। রান্না আমি দেখবো।

ওপরে গিয়ে, কাছে বসিয়েও মমতার বিহ্বল ভাবটা যেন কাটতে চায় না। একদৃষ্টিতে তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন বোঝবার

চেষ্টা করেন। এত বড় হয়ে গেছে তাঁর ছবি। শহরে থেকে রঙটা ফর্সা হয়েছে, শহরের কায়দায় শাড়ি পরেছে, দুটো বিনুনি ঝুলিয়ে দিয়েছে কাঁধের দুপাশ দিয়ে। সারা মুখে এক নতুন শ্রী! এতো তাঁর সেই ছবি নয়—যাকে তিনি মেরেছেন, বকেছেন, ভালবেসেছেন। এই নতুন বয়সটাকে তিনি যেন চিনে উঠতে পারছেন না। তাঁর জীবনে কি আসেনি এমন বয়েস! এমন শ্রী, এমন নতুন কিছু। এত অচেনা লাগছে কেন তবে?

হঠাৎ সারা শরীর কাঁপিয়ে মনে পড়ে যায় পুরোন কথা। এসেছিল! ছবির চেয়ে অনেক সুন্দর ছিলেন তিনি—অনেক কোমল। কিন্তু সব ঢাকা পড়েছিল ঘোমটার আড়ালে, দুটো ভীরু ভীরু চোখ সেই যে মাটির দিকে নিবদ্ধ করেছিল দৃষ্টি—চোখ ফিরিয়ে প্রথমেই দেখেছিল রান্নাঘরটাকে, সেখানেই সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, কোমলতাকে বিসর্জন দিয়েছেন তিনি। কেউ তাঁকে ডেকে বলেনি তাঁর সৌন্দর্যের কথা। মুগ্ধ চোখে কেউ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে চায়নি তাঁর নতুন পাওয়া বয়েসকে, বেড়ে ওঠাকে। ছবির দিকে তাকিয়ে তাই মুগ্ধ হয়ে থাকতে হয়। যেন ও মেয়ে নয় তাঁর, যেন নিজের অতীতটাকেই দেখছেন তিনি অবাক হয়ে।

মেয়ে বলে: কথা বল মা। কতদিন পরে এলাম—তুমি একটা কথাও বলছো না।

কথা বলছো না!—এতক্ষণে চমকে সোজা হয়ে বসেন মমতা, সহজ হবার চেষ্টা করে বলেন: ঠাকুমাকে প্রণাম করে এসেছো তো? দাদুকে?

: সব! সব্বাইকে! ঠাকমা বড় কাঁদছেন মা পিসিমার জন্যে। বোমা পড়ার কথাটা না বললেই হোত—। কতদিনে যে পিসেমশায়ের বাড়ি বিক্রি হবে কে জানে। সবাই চলে গেছে কিন্তু পিসেমশাই কিছুতেই যাবেন না বাড়ি ফেলে—আর,—ছবি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। সে এখন ভাবতে শিখেছে মমতার কাছে এটাও যেন নতুন লাগে। প্রদীপও বড় হয়েছিল কিন্তু চোখের সামনে দিয়ে। সেজন্যেই যেন নতুন লাগেনি তাকে। অন্য ছেলেমেয়েরা বেঁচে থাকলেও বড় হোত। কিন্তু ছবির বড় হওয়াটা, তার ভাবতে শেখা, তার গাম্ভীর্য মমতাকে যেন অবাক করে দিচ্ছে বারে বারে। নিজের ছেলেমেয়ের মধ্যেই এত বিস্ময় লুকোন থাকে মা হয়েও আগে জানতেন না তিনি।

চাকর বাক্স-বিছানা ওপরে দিয়ে গেলে ছবি তার রুমাল থেকে চাবি খুলে মমতার হাতে দেয় : ওই ছোটো বাক্সটায় আমার জামা-কাপড় আছে মা, বড়টায় আছে বই।

—বই !—মমতা যেন চমকে সজাগ হয়ে ওঠেন : বই কেন রে ?

: উঃ মাগো ! কিচ্ছু জানো না তুমি ? আমি যে আসছে বছর ম্যাট্রিক দেব তাও জানো না তুমি ? শহরটা মিলিটারী নিয়ে নিয়েছে, আমাদের ইস্কুলটা উঠে গেল, পড়াশোনা বন্ধ। তাইতো চলে এলাম। কেন যে যুদ্ধ করে মানুষ ! শহরের একমাইল বাইরে একটা বোমা পড়েছিল, সেদিন কতদূরে থেকেও তার আলো আর ধোঁয়া দেখা গেল। রেঙ্গুন, বার্মা থেকে দলে দলে লোক পালিয়ে এসেছে ওখানে—ওখান থেকে পালাচ্ছে অন্য জায়গায়। কি যে বিচ্ছিরি জিনিস এ সব। তুমি কিছু জানো না মা ?

: তোর ভয় করত না ?

: ভয় না। আমার খুব রাগ হয় মা—দুঃখ হয়।

ভয় নেই ! প্রদীপও যাবার আগে বলেছিল : ভয় দেখিয়ে আমাকে ধরে রাখবেন ওঁরা ! ভয় আমি করিনে—কাউকেই না, কিছুকেই না। অথচ মমতা তো ভয় করেন—যুদ্ধের খবর শুনে তাঁর ভয়, এ বাড়ির সবাইকে ভয়, কেউ ভয় না পেলেও তাঁর ভয়। ছেলেমেয়ে দুটো কি তবে তাঁর নয় ?

ছবি দেখে মমতা তাকিয়ে আছেন অন্যদিকে অন্যমনস্ক হয়ে, যেখানে দেয়ালের গায়ে তার আর প্রদীপের একসঙ্গে তোলা একটা অস্পষ্ট, বিবর্ণ ছবি টাঙানো আছে। শহর থেকে গ্রামে বেড়াতে আসা কে যেন একদিন তুলে দিয়েছিল ওদের দু ভাইবোনেকে দাঁড় করিয়ে। ভালো হয়নি ছবিটা, অস্পষ্ট। তবু মমতা ওটাকে টাঙিয়ে রেখেছিলেন ওখানে।

দেখে সেই মুহূর্তেই হঠাৎ প্রদীপের কথা মনে পড়ে যায় তার, আগ্রহ ব্যাকুলতা ভরা ফিস্‌ফিসে গলায় মেয়ে বলে : মণিদার কথা তুমি তো কিছু লেখনি আমাকে ? পল্টুর কাছে শুনলাম মা—সত্যি ?

: সত্যি !—ম্লান হাসি হেসে মমতা বলেন : মিথ্যে হবে কেন ? ছোটবেলায় প্রদীপকে দেখে ভাবতাম না ও এত কষ্ট দিতে পারে আমাকে—ভাবতাম—।

মমতার কথা শেষ করতে না পারা কাঁপা ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে ছবি বলে : মণিদা কি অন্যায় কিছু করেছে ? কাঁদছো কেন মা ?

কথাটা কি ছবি বলছে! সেদিনকার ছবি! মমতা হঠাৎ সোজা হয়ে বসেন।

: অন্যায় কিনা জানিনে কিন্তু জেদ যে আছে এটা ঠিক। ম্যাট্রিকের ফল বেরুলে ছেলে বলল আমি ছবি আঁকা শিখবো আর কলেজে পড়বো। তোমার বাবা বললেন, টাকা কোথায় যে তোমাকে শহরে রেখে পড়াবো? ঠাকুরদা বললেন, বাপ্ যা বলবে তাই করবে। ছেলে ঘাড় শক্ত করে রইল, ব্যবসা সে করতে পারবে না, সে ছবি আঁকবে, সে পড়বে। শেষে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। কে জানে এখন কেমন হচ্ছে তার ছবি আঁকা, তার পড়া।

ছবি সব শুনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে: মণিদার কিন্তু খুব সাহস মা।

: সাহস! কিন্তু আমার জন্যে কি একটু মায়া হোল না তার? কাঁদবার পর্যন্ত জো নেই আমার। বেশি অসহ্য হলে লুকিয়ে অধীরের ঘরে গিয়ে কাঁদি, —বলে মমতা চোখ ছাপিয়ে আসা জল মুছে ফেলেন আঁচলে।

: অধীরকা! কাকা তবে ফিরে এসেছে? কই বলনি তো তুমি? কবে ফিরেছে অধীরকা। আগে দেখা করে আসি।

: দাঁড়া,—প্রায় ছুটে যাওয়া মেয়ের হাত চেপে ধরেন মমতা, অমন করিস নে। যাবি যেন কেউ দেখতে না পায়। নতুন দিদিমা ছাড়া কেউ প্রায় ঢোকেই না ও ঘরে আর আমি লুকিয়ে-চুরিয়ে যাই। বেশি যেতে নেই।

দুচোখে ভীতি-বিহ্বলতা নিয়ে মেয়ে প্রায় কেঁদে ফেলে: কেন মা?

: মরবার ইচ্ছে হলে মানুষ যা করে। জেল থেকেই ফিরেছিল কঙ্কাল-সার চেহারা নিয়ে। তাই নিয়েই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে শুরু করল ছেলেটা। খাওয়ার ঠিক নেই, ঘুমোনর ঠিক নেই—কৃষক সমিতি করছে। ওর মা কত কাঁদতো, কত বলেছে সবাই। শুনে হাসতো। ঘোরা আর পড়া—এ দুটোকেই ওরা বলে কাজ! সারাদিন ঘুরে আবার প্রায় সারারাত পড়তো। কোনদিন রাত তিনটের আগে আমি ওর চিলেকোঠার ঘরের আলো নিভতে দেখিনি। অত অত্যাচার সয় কখনও। আজ কিছুদিন হোল একেবারে শয্যাশায়ী, মাঝে মাঝেই গলা দিয়ে রক্ত পড়ে। ও বলে, সব ওর জেলের পুঁজি করা জিনিস। ধীরেন ডাক্তার কখনও, কখনও গোপাল কবিরাজ চিকিৎসা করে। ওতে কি হবে! অনেক টাকা ঢালতে পারলে হয়তো

বাঁচানো যেত কিন্তু কোত্থেকে আসবে? খাওয়াই জোটে না দুবেলা— জমি যা ছিল একটার পর একটা বিক্রি হয়ে গেছে। এখন তোমার হরিদাদুও কেমন আধপাগল হয়ে আছেন—শুধু চুপ চাপ বসে থাকেন। যত জ্বালা হয়েছে নতুন দিদিমার। ওই তো একটা মাত্র ছেলে! ঘাড়ের ওপর আছে আবার লতুটা। কপাল কেমন! বিয়ে থা দিয়েও কি শান্তি আছে? হাবা-বোকা বলে শেষ পর্যন্ত জামাই ওকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার একটা বিয়ে করেছে সেদিন।

একটা পুরো সংসারের ধ্বংসের কাহিনী শুনিয়ে মমতা চুপ করলেন। শেকল বাঁধা অধীরকার বিরাট দেহটার পাশে পাশে চলা টুপি পরা দারোগাকে পর্যন্ত কতটুকু মনে হয়েছিল সেদিন ছবির। আজ যেন তা স্বপ্নের মতো লাগে —ভাবাও যায় না। কেমন করে সে দেখতে যাবে কাকাকে। শুনেই যে কান্না পাচ্ছে—কথা বলবে সে কেমন করে!

চোখভরা জল নিয়ে ছবি বলে: ধ্যোৎ, ভালো লাগছে না কিছু। মণিদা নেই, অধীরদার ওই অবস্থা। মনটা বড্ড খারাপ লাগছে মা, কেন যে যুদ্ধটা বাধলো! নইলে তো সুধাদিও জেলে যেত না—নিলুটাও.... কথা শেষ না করেই মায়ের দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জিত মুখে হেসে মেয়ে বলে দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে: তোমার জন্যেই বড্ড মনটা কেমন করত— নইলে আর কি। অনেক লেখা-পড়া শিখে একদিন হঠাৎ এসে তোমাকে অবাক করে দিতাম। কিন্তু সব আমার উল্টো হয়ে গেল। এসেও কিছু মিলছে না ছোটবেলার সঙ্গে। বাবাকে দেখতেই পেলাম না, গঞ্জে আছেন শুনলাম। জুতো-মোজা পরে ঢুকতে দেখে দাদু বকলেন মেমসাহেব সেজেছিস? আর তুমি?—তুমিও যেন বুড়ো হয়ে গেছে এই কটা বছরেই, সামনের চুল সাদা হয়ে গেছে কতগুলো। কেমন যেন লাগছে আমার, ভয় করছে, কান্না পাচ্ছে! কেন বল তো?

কেন তা কে জানে! মমতা তার উত্তরও দেন না। কেবল মেয়ের বিনুনি খুলতে খুলতে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কি মনে করে চমকে ওঠেন মা—

:কালীর কথা মনে আছে তোর?

: পণ্ডিত মশাই? খুব মনে আছে। আজও পাঠশালা তেমনি চলছে মা?

: চলছে কিন্তু কালী আর নেই রে। ওই আর একটা মানুষ। যা তার পুঁজি ছিল মেরে-ধরে সারাজীবন ধরে শিখিয়ে গেছে সব্বাইকে অথচ মানুষটা মরে গেল বিনা চিকিৎসায়। কি পেয়েছে জীবনে! না পয়সা-কড়ি, না শ্রদ্ধা-সম্মান! কতদিন এসে এসে তোর খোঁজ নিয়েছে—বেঁচে থাকতে। আহা···,দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা চুপ করে রইলেন।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো কতদিনের পুরোনো ছবি—শীর্ণ, খোঁড়া চেহারার মাস্টারমশাই—সেই টেবিলের টানা ড্রয়ারে রেখে দেওয়া বেতখানা। ছবিকে কিন্তু কখনও মারতেন না কালী পণ্ডিত। সেই কতদূর থেকে এখনও যেন গলা ভেসে আসছে—যা, খেয়ে আয়। এসে কিন্তু ভূগোল আর শ্রুতিলিখন দিবি ;—কত স্মৃতি সেই ভাঙা পাঠশালাটার—অল্পশিক্ষিত মানুষটার। সে সব কথা কেইবা মনে করে, কেইবা মনে রাখবে—ছবি নিজেও তো ভুলে যাবে একদিন। ওঁরা তো সিঁড়িতে ওঠার প্রথম ধাপ—ওপরে উঠে ভুলে যায় সবাই।

ছবি বলে : পিসিমা আসবার সময় কয়েকটা টাকা দিয়েছেন—আজই গিয়ে আমি পণ্ডিতমশাই-এর বউকে দিয়ে আসবো, নেবেন না মা ?

: থাকলে কি আর নিত না—নিত। কিন্তু দিবি কাকে তুই ? বউটা দিনকয়েক কষ্টে-স্বষ্টে কাটিয়ে দিনকয়েক হোল তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। তারপর কি আছে ভাগ্যে কে জানে !

ভাল লাগছে না কিছু। এ কোথায় যে এলো ছবি।



বাইশ

দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়, সেই ছোট-বেলার মতো করে আর যেন ঢোকা চলে না। দরজাটা ধরে একটু দাঁড়িয়ে ছবি আগে ঘরের ভেতরের অবস্থাটা বুঝে নিতে চায়। বই-এর আড়ালে অধীরকা এখনও দেখতে পায়নি তাকে কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছে তার শুকনো, সরু সরু আঙুল-গুলো, তার রুগ্ন মুখের একটা পাশ।

আশ্চর্য সজাগ কান অধীরের। পায়ের শব্দ সে ঠিক শুনতে পেয়ে বলে : কে রে? কে ওখানে? ঘরের মধ্যে আয় তো দেখি।

ছবিকে দেখে সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না, চিনতেও পারে না হয়তো প্রথমে। হাতের বই নামিয়ে রেখে সে উঠে বসে বিছানায়, খুশি মুখে বলে : তুই ছবি না? সেই ছোট্ট ছবি! কত বড় হয়ে গেছিস রে? প্রথমে যে চিনতেই পারিনি।

কাছ ঘেঁসে বসতে গেলে সে হাত ধরে পাশের টুলখানার ওপর বসিয়ে দিয়ে বলে : শুনিসনি আমার কথা? কাছে বসতে নেই।

সে কথা শুনে কেবল কান্নাই পায়, কথা বলা যায় না। কাকা তো কালো ছিল, কবে আবার এমন সাদা ধবধবে রঙ হয়ে গেল তার! মস্তবড় ফোলানো চওড়া বুকে তো ডাম্বেল-মুগুর ভাঁজাতো এই চিলেকোঠারই ছাদে সকালে-বিকেলে। কোথায় গেল সে বুকখানা! সেই লোহার মতো শক্ত চাওড়া হাত-পা!

ছবির অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা মুখখানাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে অধীর তার সেই শান্ত হাসি হাসে : আমার জন্যে তোর কষ্ট হচ্ছে, ছবি? চোখে জল কেন তবে? আচ্ছা বোকা মেয়ে তো!

ছবি জল মুছে ফেলে বলে : জেল থেকে অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেই কেন অমন করে খাটতে গেলে অধীরকা? একটু বিশ্রাম নিলে না কেন?—তারপরই তার মনে হয় সুধাদির কথা। সুধাদিকেও কি ওরা ওমনি করে ছেড়ে দিয়েছে। কে জানে।

অধীর জোরে হেসে বলে : নিলে হয়তো হোত। কিন্তু তাতে আমি বাঁচতাম, কাজ বাঁচতো না। তোর কি ধারণা ছবি, এখনও তোর অধীরকা সেই পিস্তলের রাজনীতিই করে ?

: তবে কি ? লজ্জিত মুখে ছবি জানতে চায়।

সুধাদিকে অবশ্য গল্প করেছিল অধীরকার কথা। সুধাদি বলেছিল, সে দিন চলে গেছে ছবি। দু-দশটা ইংরেজি মেরে কিছু হবে না, দেশের জন্যে রক্ত দিতে হবে, ইংরেজকে তাড়াতে হবে দেশ থেকে—নিজের শক্তিতে না হয় অন্যভাবে………। —গভীরভাবে সে কথায় বিশ্বাস করতে করতে জেলে চলে গিয়েছিল সুধাদি। অধীরকাও কি ওমনি একটা কিছু বলবে !

কিন্তু অধীরকা বলে অন্য কথা, অন্যমনস্ক হয়ে আপন মনে। সে কথাও ছবি ভাল বুঝতে পারে না কিন্তু শুনতে চায়।

অধীর বলে : বুঝতে পেরেছিলাম ভুলটা কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। জেলখানাটা আমার শাপে-বর হয়েছে ছবি। নইলে কি যে হোত… উঃ! একটা ভাঙা-চোরা মন নিয়ে ফিরে এসে কেমন হয়ে যেতাম কে জানে। ফিরে এসে অরুণ, প্রসন্ন ধীরেনকে দেখলাম কিন্তু চিনতে পারলাম না। কেমন যেন হয়ে গেছে সবাই—। কিছু একটা করতে চায়—জানতে চায় কিন্তু পারছে না। আর কি বসে থাকা যায় ? অত খেটেছিলাম বলেই সবায়ের চেষ্টায় কত বড় সমিতি গড়েছি জানিস ? এখন আর আমার কোনো ভয় নেই, একটা সত্যিকার বিশ্বাসকে এতদিন বুঝিনি কেন ভাবলেই বরং অবাক হয়ে যাই।

কি সে বিশ্বাস কে জানে—যার জন্যে প্রাণটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে। ছবি অত কথা ভাবতে পারবে না। অধীরকার জন্যে বড় জোর সে কাঁদতে পারবে—লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে যাবে। আর কি করবে ? তার নিজেরও কি কম ভাবনা !

সে ভাবনাটা সুধাদিকে বোঝান যায়নি। সুধাদি থাকতো আপন মনে—মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলতো যা ছবির মতো কিশোরী মেয়ের মনটা ছুঁয়ে যেত মাত্র, কিন্তু ভাবতে পারতো না। ছবি আবার মেতে যেত লুকিয়ে উপন্যাস পড়ায়, নয়তো ভাবতো সব অদ্ভুত কথা। সুধাদির জন্যে দুঃখ ছিল, ভাবনা ছিল কিন্তু তার বেশি নয়। সুধাদি তাকে শেখাতে

চায়নি, শোনাতে চেয়েছিল—তা ছবির মন স্পর্শ করেনি। তাই উষ্কার মতো জলজ্বলে সুধাদি যোয়ান অব আর্ক পড়াতে পড়াতে নিজে জ্বলে উঠতো কিন্তু ছবিকে জ্বালাতে পারেনি—শেষে একদিন উল্কার মতোই ছিটকে চলে গেল কোথায়।

অধীরকাও আর একজন। চিন্তা করতে গেলেই ছবির মনে ভেসে উঠতো এক বিশাল চেহারা। সত্যি অধীরকা যা নয় তাই ভাবতো ছবি। একটা অসম্ভব কিছু করবে একদিন অধীরকারা ছবি জানতো। কিন্তু সে অসম্ভবটা কেমন তা সে ভাবতে পারতো না—এমন অদ্ভুত ছিল তার ধারণা। সেই কাকারাই যখন ফুরিয়ে গেছে—একটা বিশাল দৈত্য যখন বন্দী হয়ে গেছে এতটুকু গণ্ডীতে? তখন আর আশা কিসের! তার ভাবনাটা সে আর তাই কাউকে বলতে চায় না—কেউ বুঝবে না। দুচোখে টলটলে জল নিয়ে সে শক্ত হয়ে বসে থাকে।

অধীর বলে: চলে তো এলি, এখন কি করবি? যেন প্রশ্নটা ছবি বলে একটা হতাশ হওয়া, ভয় পাওয়া মেয়েকে করা হচ্ছে না, হচ্ছে এ বাড়ির কোনো ছেলেকে। যেন ইচ্ছে হোলেই কি করবে সে ভেবে বলতে পারে।

প্রায় কেঁদে ফেলে ছবি বলে: এলাম কি সাধে? এই যুদ্ধই যে সব শেষ করে দিল আমার। এখন বিস্তি পিসির মতো আমারও একটা বিয়ে দিয়ে দাও তোমরা, আর কি হবে।

—ছবি! অধীর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে: কাঁদছিস তুই? কাঁদবি কেন? মনে জোর নেই?

: মনের জোর দিয়ে আমি কি করবো বল? লতু পিসি নয়তো বিস্তি পিসি ছাড়া আমার ভাগ্য কি অন্যরকম হবে তাতে?

: মেনে নিবি কেন তুই? জানিস ছবি, আগে আমারও কেমন মনে হোত এই বোধহয় ওদের ভাগ্য। ওই সুকুমারী, লতু, বিস্তিদের দেখতাম আর কি অবজ্ঞার ভাবই না ছিল মনে। আসলে আমাদের সমাজের মেয়েরা সবাই এক একটা অত্যাচার বইবার যন্ত্র—এই কথাটা বোঝা চাই, বোঝান চাই। তা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা চাই। ওদের অবজ্ঞা করলে মাথা হেঁট হবে তোমারই, ওদের ফেলে গেলেও তোমার এগুনো হবে না।

ছবি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে।

অধীর বলে : বুঝলিনে? জাপানী যুদ্ধের ভয়ে তো পালিয়ে এলি কিন্তু এলি কোথায় সেটা ভেবে দেখেছিস? এরি মাঝে পথ চিনে দিতে হবে পাড়ি। ভয় পেলেও চলবে না, চোখের জল ফেললেও কিছু হবে না। বুঝতে পারছিস?

ছবি বলে : সবটা নয় কাকা, কিছুটা।

: কিছুটা বুঝেছিস তো—আচ্ছা তাতেই হবে। আস্তে আস্তে বোঝাই ভাল! এখন অন্য কথা বলি। শহরে তো ছিলি—গান গাইতে পারিস?

লজ্জায় মাথা নামিয়ে বসে থাকে ছবি। গান সে একটু একটু জানে কিন্তু কাউকে শোনানো যায় নাকি তা আবার?

কিন্তু অধীর ছাড়ে না। তার কোটরে বলা চোখদুটো জলজল করে, বলে : যদি জানিস তবে একটা গান শোনা ছবি। কি যে ভাল লাগে আমার গান। লোক ভাবে হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর ছেলে আমরা। আমাদের বুঝি সুখ-দুঃখের অনুভূতি নেই। যদি দেশটা অন্যরকম হোত তবে দেখাতাম জীবনটাকে কেমন করে সুন্দর করতে হয়—কেমন করে বাঁচতে হয়। গা ছবি।

সেই উৎসুক আকুল জলজ্বলে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে ছবি না গেয়ে পারে না। সে খুব আস্তে আস্তে গায় : মনের গহনে তোমার মুরতিখানি ভেঙে ভেঙে যায়, মুছে যায় বারে বারে। বাহির বিশ্বে তাই তো তোমারে টানি—ওগো সুন্দর!

গান শেষ হলে অধীর চোখ খোলে : আরও জানিস? আমাকে মাঝে মাঝে শুনিয়ে যাবি ছবি? জানিস, আমার যদি টাকা থাকতো আমি একটা গ্রামোফোন রাখতাম—যদি টাকা থাকতো তাহলে গান শোনবার জন্যেই বেঁচে উঠতাম।

ছবি বলে : আমি কিছু পারিনে কাকা। একটা ছেল ছিল—সাধন তার নাম—সে জানতো। খুব ভালো গাইতে পারতো। ওটা ওর গাওয়া গান—আসবার আগে কেন যে আর গাইলো না, কত বলতাম।

ছবির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অধীর বলে : ও কি তোকে ভালবাসতো ছবি?

এই প্রথম কথাটা এমন করে শুনতে পেয়েছে ছবি—তার মুখ হঠাৎ

বিবর্ণ হয়ে ওঠে, সে সজোরে মাথা নেড়ে বলে: যাঃ, তুমি যেন কি কাকা!

অধীর হো হো করে হেসে উঠে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে দুহাতে ছবির কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়: লজ্জা পেয়েছিস? লজ্জা কিসের? হয়তো তুই তা জানিস নে—যেমন মায়া ভাবে আমি বুঝি কিছুই বুঝিনে। কিন্তু তুই যে বড় ছোট ছবি। একটু তাড়াতাড়ি বুঝে নে। মরবার আগে অন্তত একটা মেয়েকেও দেখে যেতে পারি, যে ভয় পায় না, মুখ থুবড়ে পড়ে না যন্ত্রণায়।—কি এক আবেগ চাপতে চাইছে অধীর কিন্তু পারা যাচ্ছে না। সেদিনকার দেখা ছোট্ট ছবির সামনেও থেকে থেকে নানাভাবে তা বেরিয়ে পড়ছে—ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়।

বাইরে একটু আগে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু সে শব্দ ঘরে ঢোকেনি। দরজার বাইরে তা থমকে থেমে আছে। আধীর ডাকে: এসো মায়া, আমি ছবির সঙ্গে কথা বলছি।

রোদের ঝাঁঝে লাল হয়ে যাওয়া মুখ, থান পরা মায়াদি। আরও রোগা হয়ে গেছে, আরও করুণ। ছবি খানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে পুরোন সেই দিনগুলোকে ভাববার চেষ্টা করে। সেই যে-কান্না চাপতে চাপতে বিন্তি পিসিকে না দেখেই অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিল মায়াদি তারপরে এই তাদের প্রথম দেখা। তখন মায়াদি কুমারী ছিল, আজ দেখেই বোঝা যায় সে বিধবা হয়েছে কিন্তু অধীরকার ঘরে এসেছে, কেন? তাও চোরের মতো চুপি চুপি—ঠিক দুপুরবেলায়। কেন এসেছে মায়াদি?

মায়া বলে: তুই এসেছিস আমি জানি ছবু। কত বড় হয়ে গেছিস রে?

অধীর হাসে: কতগুলো বছর গেল সে খেয়াল আছে? তুমি এর মধ্যে স্বামীর ঘরে গেলে, স্বামীকে খেয়ে আবার ফিরেও এলে আমাকে জ্বালাতে, আর ছবুর বড়ো হওয়া আশ্চর্য? ও কেবল বড়ই হয়নি—শহরে থেকে লেখাপড়াও শিখেছে খানিকটা। তোমাদের মতো মুখ্যু নাকি?

মায়া হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে: বেশ! মুখ্যু কি আমি ইচ্ছে করে? চিরকাল তো পরের গলগ্রহ হয়ে রইলাম—কত তো দেশোদ্ধার

করা ছেলেরা ছিল, আমাকে উদ্ধার করে বিদুষী করে নিলেই পারতো।

তার কান্না দেখে অধীর হাসে : রেগো না মায়া কিন্তু একটা সত্যি কথা বল। একজন তো বাপু তোমাকে গলগ্রহ ভাবেনি, গলার মালা করেই নিয়ে গিয়েছিল। তাকে কি করে খতম করলে? সত্যি কথা বল তো, খাবারে বিষ-টিস মেশাও নি তো?

মায়া শক্ত হয়ে মেঝেতে বসে আঙুল দিয়ে আঁচড় কাটে। কথা বলে না কিন্তু বোঝা যায় রেগে গেছে। তবু অধীর ছাড়ে না : বিধবা যুবতী মেয়ে, ঠিক দুপুরে একটা ছেলের ঘরে পালিয়ে আস কেন শুনি। ছবি দেখে রাখ, মামীর কাছে হরদম মার খাচ্ছে অতবড় মেয়ে, লোকজন যা-তা বলে তবু আমার কাছে আসা বন্ধ হবে না ওর। তাও এমন ছেলে—যার সাধ্য নেই এতটুকু। যে আজ বাদে কাল মরবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাসটা কখন আপনা থেকেই বেরিয়ে গেছে অধীর তা টের পায়নি কিন্তু আর একটা কথাও বলে না সে। ছবিরও বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে ওঠে কান্নায়—। কাকার হাসি ভরা চোখের পেছনে কোথায় যেন কান্নার পাহাড় লুকোন আছে কিন্তু তাকে দেখতে দেবে না অধীর, তার সামনে কাউকে সে কাঁদতেও দেবে না।

তবু মায়া কাঁদে। চৌকির ওপর মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে ভারি গলায় বলে : সব সময় এক কথা আমার ভাল লাগে না—পায়ে পড়ছি আপনার, আমি না হয় চলে যাচ্ছি।

কিন্তু মায়া উঠবার আগে ছবি ওঠে। তার এখানে থাকতে লজ্জা করছে, হঠাৎ বুকের ভেতরটা কেমন করছে। যন্ত্রণাভরা এই দৃশ্যটা থেকে সে সরে থাকতে চায়।

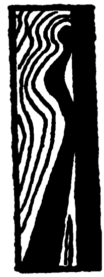
ঘর থেকে বেরিয়ে এসেও কিন্তু একেবারে চলে যেতে পারে না। চোরের মতো চুপি চুপি সে ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকে। অধীরকা হাত ধরে মায়াদিকে কাছে বসিয়ে দু'হাতে তার মুখ তুলে ধরেছে উঁচু করে। ছবির বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ওঠে। কাকা বলছে : অত কাঁদ কেন মায়া?

: তোমার কথা ভেবেই—তুমি জান না আমাকে? দশ বছর ধরেও চিনলে না?

: তোমার যে ক্ষতি হবে মায়া !

কাকার বুকের মধ্যে মুখ রেখে কি যেন বলছে মায়াদি—কি ? ছবি তা শুনতে পায় না কিন্তু পরমুহূর্তেই শক খাওয়া মানুষের মতো সে চমকে ওঠে। ওকি! মায়াদির মাথাটা বুকের মধ্যে নিয়ে তার জলে ভেজা চোখে, ঠোঁঠে কাকা তার রক্তহীন, ফ্যাকাসে ঠোঁট চেপে ধরছে বার বার। মায়াদি কাঁপছে থরথর করে—এখান থেকে ছবি তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কিন্তু পালিয়ে আসছে না কেন মায়াদি তবু! কেউ যদি দেখে ফেলে ওদের! যদি কেউ—! মুখে আঁচল দিয়ে ছবিই ছুটে পালায় সেখান থেকে—সেই মুহূর্তে। নতুন এক অনুভূতিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার সমস্ত শরীর। এখানে আর থাকলে চীৎকার করে উঠতে হবে তাকে।

তেইশ



অন্ধকার কেবল সারা বাড়িটা জুড়েই নয়—সারা গ্রাম জুড়ে। অন্ধকার ছবিরও মনে।

ছাদের কার্নিশে ভর দিয়ে সে একদৃষ্টে ওপরের তারা-ভরা আকাশের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি ফেরায়। মস্তবড় জীর্ণ কঙ্কালের মতো বিরাট ভাঙা-চোরা বাড়িখানা তাদের। তার প্রতিটি জীর্ণ রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্ধকারের বাসা। তার ভাঙা ছাদে বসে দুটো ভূতুম পেচা ঝগড়া করছে—তুই খুলি, মুই খুলি। ছাদের ওপাশের নারকেল গাছটার পাতায় বাতাসে ঝরঝর শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে।

এত অন্ধকারের সঙ্গে পরিচয় অনেক দিন পরে এই প্রথম। হয়তো এত ভাবনার সঙ্গেও। শহরটা তার মনে ছাপ ফেলেছে—সেখানে আলোর সমারোহে সে ভুলে গিয়েছিল অন্ধকারের কথা। সেখানেও অবাক হয়েছে মিনুকে দেখে, পরীবানু তাকে নাড়া দিয়েছে, নিলু তাকে স্তম্ভিত করেছে, সাধন তাকে কি বলতে চেয়েছিল না বুঝেই সে এসেছে। পিসিমার অজ্ঞতা আর কুসংস্কার ছবির মনে রেখাপাতও করেনি। কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড মুক্তির স্বাদ ছিল—কেমন একটা আনন্দ ছিল অন্য জগতের। যেখানে সমস্যার রূপ ছিল আলাদা।

এখানে!

মাকে সে চিনেও চিনতে পারছে না, কিছু বোঝাতে পর্যন্ত পারছে না। এখানে নতুন কিছু বলতে যাওয়া বৃথা। কেউ তার কথা শুনবে না। কেউ বুঝবে না, ছবি ওদের ভাবনার মধ্যে ধরা দেবে না। ছবি তা পারে না। এখানে সে কথা বলা নিষেধ, ভাবা নিষেধ। সেফু তার প্রমাণ।

তার চেয়ে মাত্র একবছরের ছোট সেফু এখনই যেন কেমন হয়ে গেছে। সারা চোখে-মুখে এরই মধ্যে কেমন বিষাদ আর ক্লান্তি নেমে এসেছে।

ছবি বলেছিল: পড়িস নে সেফু?

: পড়বো বড়দি? এ বাড়িতে ও কথা তোলা বারণ। শুনতে

পেলে ঠাকুমা কি বলে দেখো না। তোমার জন্যে জেঠিমাকে কি কম কথা শুনতে হয়েছে ?—বলে সেফু আবার নিজের কাজে লাগে। বিরক্ত-মুখে ভাই-বোনগুলোকে মারে, বকে, খাওয়ায়। ঠাকুমার ফরমাস্ খাটে, ছোট ভাই-বোনগুলোর জামা কাপড় কাঁথা পরিষ্কার করে আর কাকীমার সঙ্গে থেকে থেকে ঝগড়া করে বলে : পারবো না—কিছু করতে পারবো না।

শুনে ঠাকুমা বলে : বড় তেজ মেয়ের। ঘর-সংসারের কাজ করবি না তো কি করবি শুনি ?

সেফু তার উত্তর দিতে পারে না কিন্তু ছবির বুকের ভেতরটা জ্বলে জ্বলে যায়। তার অবশ্য সেফুর মতো ছোট ভাই-বোন নেই কিন্তু আরও তো কত কাজ আছে সংসারের—তাকে যে কোনো মুহূর্তে সেই সব কাজে বসিয়ে দেবে হয়তো। বিন্তি পিসির মতো লণ্ঠন মুছে, পান সেজে, কাকীমার মতো ভয়ে ভয়ে থেকে, মা'র মতো রান্নাঘরের হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে একদিন চোখ মুছতে মুছতে সে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে।

সে তা যাবে না। কিন্তু কি করবে সে ? সেদিন অধীরকার ঘর থেকে লজ্জায় পালিয়ে আসার পরে আবার কাকার কাছে যেতে হয়েছে তাকে। কাকাই ইচ্ছে করে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে মায়াদির কথা। ছবি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেনি মায়াদিকে। তার চোদ্দ বছরের কিশোরী মন হাতের মুঠো শক্ত করে শুনেছে কথাগুলো—ভালবাসাই আসল। সেখানে জাত নেই, ধর্ম নেই, কুমারী-বিধবার প্রশ্ন নেই। আন্তরিক ভালবাসা একজন ছাড়া দুজনকে দেওয়া যায় না। মায়া যে অধীরকে ভালবাসে তাতে বাধা তার বৈধব্য—তার কোন মূল্য নেই ! এমন কথা অধীরদের বিশ্বাস তাদের শেখায়নি। অধীর ছবির মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছে : ছবি তুই অন্তত বুঝতে শেখ জিনিসগুলো। তোর কাছে আশা আছে আমার—, সে কথা শুনতে শুনতে ছবির হাতের মুঠো ক্রমে শিথিল হয়ে গেছে। ক্রমে সে নিজের ইচ্ছেটাও খুলে বলেছে কাকার কাছে, সে এ বাড়ির কোনো মেয়ের মতো হয়ে থাকতে চায় না।

অধীর তাকে আশ্বাস দেয়নি, সান্ত্বনাও দেয়নি—খানিক চুপ করে থেকে বলেছে : তোর ছোটবেলার বন্ধুদের খোঁজ-খবর নিয়েছিস ছবি ? যা আগে ওদের দেখে আয়, ভালো করে দেখে নে আগে। তারপর

আবার আসিস্! মন খারাপ করলে চলবে না। শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে।

ছবি তাই তার ছোটবেলার বন্ধুদের খোঁজ করতে গিয়েছিল। বাসন্তী ওদের বাড়ির চাকরের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল বছর দুই আগে, এখন সে শহরে থাকে। তার নাম বাড়িতে কেউ করে না। উমার বিয়ে হয়ে গেছে, ছবি পিসিমার সঙ্গে যাবার বছর দুই পরে—ষোল বছরের উমা এখন তিনটে ছেলে-মেয়ের মা। সে ছবিকে দেখে চিনতে পারেনি—ছবিও পারেনি কংকালসার রক্তশূন্য চেহারার যুবতী মেয়েটাকে চিনতে। চিনতে পারার পরে ছবি ভেবেছিল উমা হয়তো কাঁদবে তার কাছে, নিজের কথা বলে। সে তার ধার কাছ দিয়েও যায় না—বরং ছবির কবে বিয়ে হবে এইটাই তাকে ভাবিয়ে তোলে।

শুধু দুর্গা ছবির হাত ধরে কেঁদেছে। পাঠশালার সবচেয়ে সরল আর সুন্দর মেয়েটা। ওর বিয়েটা ভালোই হয়েছিল—স্বামী চাকরি করতো বিদেশে। অনেক স্বপ্ন দেখেছিল দুর্গা, স্বামীর সঙ্গে বিদেশে যাবার—ঘর বাঁধবার। কিন্তু তারপরই তার সব শেষ হয়ে গেছে।

: জানিস ছবি, মরে যাবার একমিনিট আগে ঘরে কেউ ছিল না—ও আমার হাত ধরে কি বলে গেছে? তুমি আবার বিয়ে কোরো দুর্গা—' কথাটা বলতে বলতে দুর্গা হাঁফায়, শেষ করে চোখের জল মোছে আর শিউরে ওঠে।

: খুব ভাল লোক তো, ছবি বলে!

: ভাল, হ্যাঁ খুব ভাল ছিল। কিন্তু তা কি হয়? বল্ ছবি—তা কি হয়?

: কি হয় না?

: ওই যে বলল গেল? কিন্তু আমারই বা কি হবে বল্ ছবি? এ বাড়িতে আমাকে ওরা একাদশী করায়, ঠাকুর পূজো না করে জল খাইনে। মা'র যখন কষ্ট হয় কাঁদে আর রাগ হলে বলে, মর্ মর্। আমার ঠাকুমা এখনও সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে মাছ খায়, আমি হবিষ্যি করি। এরকম করে আমি কদ্দিন বাঁচবো বল? বিয়ে তো আমার মাত্র দশমাস হয়েছিল—স্বামীর সঙ্গে থেকেছি দশদিন। আমার সব ফুরিয়ে গেল কেন?

ছবি বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থেকেছে। সবচেয়ে সরল মেয়ে দুর্গা কিন্তু

সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন তার। তাও আবার নিজের ভাবনায় হাবুডুবু খাওয়া ছবির কাছে।

দুর্গা বলে: এরকম করে আমি কখনও থাকবো না, ছবি দেখিস। আমি কিছু একটা করতে চাই কিন্তু বিদ্যে নেই—বুদ্ধি নেই আমার। ছবি, তুই তো অনেক লেখা-পড়া শিখবি, বড় হবি, তুই আমাকে একটা পথ করে দিতে পারবিনে ?

ছবি ম্লান হেসে বলে: আমি অনেক বড় হব কে বলেছে তোকে ?

স্থির বিশ্বাসে মাথা নেড়ে দুর্গা বলে: আমি জানি।

দুর্গার ছটফটানিটা যেন এতদিন মধ্যরাত্রির কান্নায় চাপা ছিল—ছবির কাছে সেটা জ্বালা হয়ে ঝরে পড়ে কখনও—কখনও জল হয়ে। ছবির এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। সেও কাঁদে।

এখনও তার চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে কার্নিশের ওপর মিশে যাচ্ছে। দুর্গার মতো থান পরিয়ে কেউ তাকে একাদশী করাচ্ছে না এ বাড়িতে, কিন্তু নিঃশব্দ একটা নিষেধের দেওয়াল তুলে তার সব ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর কে যেন ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে। সে দেওয়ালটা ধরে নাড়া দেওয়া হয়নি এখনও—অভিমান করে চুপ করে আছে বলে।

তার বইগুলো সেই যে বাক্সে বন্ধ পড়ে আছে, আজ পর্যন্তও তা বার করা হয়নি। কেউ সে কথা একবার বলেও না। বলে না যে ছবি পড়তে বোস্। ছবিরও সামনের বছর পরীক্ষা দিতে হবে—তৈরি হতে হবে।

ঠাকুমা পন্টুকে তাড়া দেন্; দাদু বলেন: পড়তে বসগে যা, ইয়ারকি মেরে বেড়ানো হচ্ছে।

সেফু পড়ে না। পড়া তার কাজ নয়—বাড়ির কাজ করা তার কাজ। তাকেও সেফুর দলে ফেলেছে সবাই, পড়াটা তারও কাজ নয়।

সবচেয়ে অভিমান হয় তার মা'র ওপর। পড়াশোনার কথা বললে মা এমন করুণ চোখে তাকায়, এমন ভীতু হয়ে পড়ে যে সে ভয়টা সঞ্চারিত হয় ছবির মধ্যেও।

নিচে রোয়াকে সেফু সুর করে ছোট বোনটাকে ঘুম পাড়াচ্ছে। ঠাকুমা ঘ্যান্ ঘ্যান করে নাছোড়বান্দা দুই নাতিকে রূপকথা শোনাচ্ছেন।

সন্ধ্যেবেলা মা'র পেছন পেছন সে রান্নাঘরে ঢুকতে গেলে মা বলেছিল: বড় গরম ওখানে। তার চেয়ে ঠাকুমার কাছে গিয়ে বোস্ গে।

কাকীমাও সায় দিয়ে বললেন : হ্যাঁ, রান্নাঘর তো সারাজীবনের। যে কদিন পারো বাইরে বাইরে থাকো।

এর বেশি কি কিছু বলা যেত না! আবার কান্না পাবার আগেই হঠাৎ কানে আসে বড়কাকার গলা। নিচের ঘরে বসে বড়কাকা তাঁর দুই ছেলেকে পড়াচ্ছেন। পন্টুকে বোধহয় যোয়ান অব আর্ক পড়াচ্ছেন। মানে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ওই গল্পটা খানিকটা পড়িয়ে সুধাদি চলে গিয়েছিল আর আসেনি। দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়া কিশোরী যোয়ানের গল্প।

ছাদ থেকে ছবি ঘরে এসে ঢোকে। কমানো লণ্ঠনটা বাড়িয়ে বাক্স খুলে বইগুলো বার করে, আঁচল দিয়ে মুছে মুছে সেগুলো মেঝেতে গুছিয়ে রাখে। তারপর কান পেতে শোনে নিচে থেকে ভেসে আসা বড়কাকার উচ্চকণ্ঠ— She startled France and England too; she struck dismay to the hearts of kings and lifted up the hearts of common people, she led armies into battle and gained great victories; she raised her country up from misery and gave it hope and confidence and as a reward they took this matchless girl and put her in the fire, and sat round her while she burned—, শুনতে শুনতে চোখ ভরে জল আসে। সেও বার করে জায়গাটা। মাথা নিচু করে লণ্ঠনের আলোয় বিড়বিড় করে পড়তে থাকে—

> Nothing could keep Joan back—she saw her path and followed it. Her father would rather down her in the Mense, he said, than see her riding with soldiers, and when she went to the captain of the town···the captain told her friend to box her ears and send her home—,

পড়তে পড়তে তার বুকের মধ্যে শির শির করে। হাতের মুঠো শক্ত হয়ে আসে অদ্ভুত এক আনন্দ মাখা বিশ্বাসে। তার সব ভাবনা-যন্ত্রণা যেন কমে যেতে থাকে এক অনির্বচনীয় আনন্দে। শুধু পড়তে চাওয়া নয়—শুধু মাথা কোটা নয়, নিষ্ফল হতাশাও নয়, আরও একটা বিরাট আনন্দ যেন কোথায় লুকিয়ে আছে। মরে যাওয়ার ভয়টা সেখানে কিছু নয়।

সেই আনন্দ কি অধীরকারও? শুধু কি মায়াদি, তাকে অত ভালবাসে বলেই অত কষ্টের মধ্যে শান্ত হাসি হাসতে পারে কাকা? নাকি আরও একটা কিছু আছে যেখানে পৌঁছলে মৃত্যুও মানুষের আনন্দ হয়ে যায়? কি সেটা! কি?

> ....She must have thought of her home at Domremy and the great days at Orleans and Troye and Rheims She must have thought with tears of the common people who wept with joy to welcome her........
>
> The fire was lit . Joan looked out through her tears for the last time on a world she had filled for ever with glory and pride, and the heart that failed at the thought of all this, was lifted again by powers beyond this world.

: ছবি!

চমকে বই বন্ধ করে পেছন ফিরে দেখে মমতা একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন! তাঁর নাম ধরে ডেকেছিলেন কিন্তু যে কথা বলতে এসেছিলেন তা যেন ভুলে গেছেন হঠাৎ।

খানিক চুপ করে থেকে বলেন: নিচে তোমার বাবা এসেছেন, দেখা করে এসো।

খুশি মুখেই উঠে দাঁড়ায় ছবি: বাবা এসেছেন? কই আমাকে তো ডাকেননি?

ম্লান গলায় মমতা বলেন: ব্যবসা ছাড়া আর কি চিন্তাই বা আছে আজকাল?............বই-পত্তর তুলে রেখে যাও মা, কে কোথায় দেখবে আবার!

ছবি বলে: তুমি একটু তুলে রাখো মা, আমি আগে বাবাকে প্রণাম করে আসি।

মমতা পাতা উল্টে ইংরিজী বইখানা দেখেন, অন্য বইগুলোকেও নেড়েচেড়ে দেখে সেগুলোকে আবার বাক্সটায় তুলে রাখেন একখানা একখানা করে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়ে হঠাৎ।

কতদিন যে ছবি দেখেনি তার বাবাকে! শান্ত মুখের স্নিগ্ধ হাসি হেসে বাবা তাকে আড়াল করে রাখতেন মমতার উদ্যত প্রহার থেকে, গালাগালি থেকে। ঠাকুমার ঝাঁঝ মেশানো কথায় মা রেগে যেতেন কিন্তু বাবা হাসতেন।

বাড়িতে থাকলে, দুপুরবেলায় শুতে গিয়ে ডাকতেন: ছবুমা কোথায়?

জানা ছিল ছবির। মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার, পাকাচুল বাছবার ডাক এটা। ছবি বসতো পাশে কিন্তু তখনই উঠে পালিয়ে যাবার জন্যে মনটা ছটফট্ করতো অন্য প্রলোভনে। কুঠিবাড়ির কাছের একসার নারকেল গাছের তলায় বসে কাঁচা আম খাওয়ার ডাক থাকতো, মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ানোর লোভ থাকতো। তাকে জয় করা কঠিন। বাবাকে চোখ বুজে থাকতে দেখে ঘুমিয়েছেন মনে করে নিঃশব্দে উঠতে গিয়ে হঠাৎ দেখতো তার দিকে তাকিয়ে বাবা মৃদু হাসছেন। অমনি অপ্রতিভ হয়ে বসে পড়তো সে।

বাবা হাসতে হাসতে বলতেন: পালাবার মতলব তো? আচ্ছা যাও আজকের মতো কিন্তু বেশি রোদে ঘুরো না।

তখন খুব খারাপ ছিল সংসারের অবস্থা—ক্রমশই খারাপ হচ্ছিল। বাবাকে খুব খাটতে হোত। একদিন রাগতে দেখা গিয়েছিল বাবাকে, দাদুর মুখের ওপর বলেছিলেন: শেষ চেষ্টা করে তো দেখলেন জমিদারী দিয়ে। লাভের মধ্যে কেবল মামলা-মোকদ্দমাই সার হোল। এবার আমি চেষ্টা করি। গঞ্জে দোকান দিই একটা। নইলে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে গুষ্টিশুদ্ধ।

দক্ষিণারঞ্জন বলেছিলেন থমকে দাঁড়িয়ে: কি বললে? চৌধুরী বংশের ছেলে দোকান করবে? কি বললে তুমি?

তারপরের খবর ছবির জানা ছিল না। দোকান কিন্তু হয়েছিল। টাকা ছিল না। পূর্ণশশী তাই যত্নে তুলে-রাখা শাশুড়ীর অনন্তজোড়া বার করে দিয়েছিলেন, দেখাদেখি মমতা দিলেন তাঁর গয়না, সরস্বতীও।

দোকান আরম্ভ হবার দিন কি একটা পুজোও হয়েছিল বাড়িতে।

পুজোর শেষে ঠাকুর ঘরে মাথা ঠুকে ঠুকে পূর্ণশশী বলেছিলেন : মুখ রেখো ঠাকুর।

দেখাদেখি মাও গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করেছিলেন, কাকীমাও।

মমতা বলেছিলেন : সর্বস্ব গেল তো, এখন কি হবে কে জানে ?

রায় কত্তা নাকি হেসেছিলেন ব্যবসা করার কথা শুনে—ব্যঙ্গের হাসি। তার ছেলে অনিলও। আর দক্ষিণারঞ্জন সেই যে রাগে কথা বন্ধ করেছিলেন, অনেকদিন পর্যন্ত কথা বলেননি বড় ছেলের সঙ্গে, বৈঠকখানায় যাননি রায়দাদুর হাসির ভয়ে।

তারপর আবার কেমন করে সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল কে জানে। জমিদারী থেকে ব্যবসায়ে নেমে গিয়েছিল দক্ষিণারঞ্জনের এই বংশটা।

পূর্ণশশীর ঘরের মেঝেয় বসে কুলদারঞ্জন হাত-পা নেড়ে উত্তেজিত মুখে কি যেন বোঝাচ্ছেন। দক্ষিণারঞ্জন আর সুখদা পাশে বসে শুনছেন। একটু দূরে দরজার কাছে পূর্ণশশী বসে আছেন গালে হাত দিয়ে।

গায়ের জামা খুলে পাশে রেখেছেন বাবা। রোগা হয়ে গেছেন আগের চেয়ে অনেক। আগের মতো মাথা থেকে পাকা চুল আর বেছে বেছে তুলতে হবে না, চুলের রঙ ধূসর হয়ে এসেছে। এত বুড়ো হয়ে গেছেন বাবা ! এত তাড়াতাড়ি এত বুড়ো !

কথা বলতে বলতেই কুলদা একবার চোখ তুলে তাকান। প্রণাম করা ছবির মাথার ওপর নিজের হাতখানা একবার ছুঁইয়ে এক মুহূর্তের জন্যে থামেন। সেই একটা মুহূর্তকেই কেবল স্পর্শ করে নেয় ছবি। তারপরেই বাবা ডুবে যান অন্য কথায়। আর সেই মুখখানার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হয়—কেন তা সে নিজেও বোঝে না—টাকা হয়েছে, ভাল হয়েছে সংসারের অবস্থা কিন্তু শান্তি নেই, আনন্দ নেই ! কেন কে বলবে !

: তাই বলছিলাম,—আগের কথার জের টেনে কুলদা বলে চলেন : এখন থেকেই স্টক করতে পারি যদি তাহলে দ্বিগুণ লাভ তো হবেই। বার্মা থেকে আসা তো কবেই বন্ধ হয়েছে, গভর্নমেন্ট তো এরই মধ্যে স্টক করছে। ব্যবসায়ীদের সবায়েরই এক কথা, অন্তত তিন-চার গুণ নাকি হয়ে যাবে

দাম! চাষী-গেরস্থের কাছে যে লোকে কিনবে—পাবে কোথায়? গভর্নমেন্ট আইন করে আদায় করে নিচ্ছে দেখে লোকে আগে ভাগেই বেশি দামের লোভে দিচ্ছে বেচে,—কথা শেষ করে কুলদা তাকান সুখদার দিকে, তারপর দক্ষিণারঞ্জনের দিকে; তখনও বলে চলেছেন: শুধু কি তাই? লোহার জিনিস, বিলিতি জিনিস-পত্তর, ওষুধ-বিসুধ তো বাজারে নেই-ই। তারপর আছে কাপড়,—আমি সব দিক সামলাই কি করে! একটু ভালোমতো সাহায্য দরকার। আমি বলি কি সুখো-ও আসুক আমার সঙ্গে। এতদিন তো ডাকিনি, মাস্টারী করছে করুক। কিন্তু সত্যিই যদি করতে হয়তো এই বেলা। ও তিরিশ টাকার মাস্টারী গেলেও কিছু এসে যাবে না। আরে, রায়বাড়ির অনিল পর্যন্ত গঞ্জে গুদাম করেছে জান, সময়মতো নেমে পড়বার ভরসায়। অথচ হেসেছিল ওরাই বেশি। ব্যবসাই তো এখন ভরসা—সময়মতো করেছিলাম বলে এ বাজারে দুবেলা দুমুঠো জুটছে যা হোক। কথা শেষ করে বাবা তাকান দাদুর দিকে, দাদু মাথা নিচু করে আছেন। বোঝা যায়, বাবার শেষের কথাগুলোকে আজ আর তিনি অস্বীকার করতে পারছেন না। বাধা দিয়েছিলেন বলেই হয়তো লজ্জা পাচ্ছেন আজ বেশি করে।

কিন্তু বড়কাকা মাথা নিচু করেননি। মুখটা কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে লণ্ঠনের অত কম আলোতেও। মা, বাবা আর ভাই-এর জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি পড়েছে সুখদারঞ্জনের মুখের ওপর, তিনি যেন লজ্জার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন, বলবার মতো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটেন খানিক তারপর গলা পরিষ্কার করে নিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলেন থেমে থেমে: আমি পারব না দাদা। ব্যবসা জিনিসটা বড় খারাপ—টাকার লোভে নেশা ধরে যায়, তখন আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না, আর তাছাড়া ব্ল্যাকমার্কেট,—কথা শেষ করে তখনি উঠে চলে গেলেন—সবাইকে অবাক করে দিয়ে।

দক্ষিণারঞ্জন বিপন্নমুখে তাকিয়ে আছেন অন্যদিকে। কুলদার মুখ থমথমে হয়ে উঠেছে: হুঁ, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না! সে জ্ঞান থাকলে এ বাজারে আর গুষ্টিশুদ্ধুর মুখে যে ভাত উঠতো না। ব্যবসা করতে পারবে না—খারাপ জিনিস। কিন্তু এত বড়ো সংসার চলে কি করে

সেটা ভেবেছ ? তোমার ছেলের পড়া আছে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে ছদিন পরে। মাস্টারীর আয়ে তো এ সংসারের তেলের খরচটাও ওঠে না।

বড়কাকা বোধহয় একেবারে চলে যাননি, বোধহয় পূর্ণশশী তাকে দেখতে পাচ্ছিলেন তখনও দরজার বাইরে। তাড়াতাড়ি উঠে এসে এবার তিনি বড়ছেলের পিঠে হাত রেখে ভাঙা কাঁপা গলায় বলেন: ও কি কথা রে কুলদা ? অমন করে বলছিস—ও যদি বউ ছেলে-মেয়ের হাত ধরে চলে যায় বাড়ি ছেড়ে ? একটু ভেবে কথা বলিস। তুই না হয় রোজগার বেশি করিস কিন্তু ও—ও তো ছেলে-মেয়ের বাপ হয়েছে—মান সম্মান আছে।

কুলদা অস্থির গলায় বলেন: যায় যাবে। তোমার কাছ থেকে শুনে তবে কথা বলবো নাকি ? ঠ্যালা সামলাতে হলে বুঝতে মা।

বিরক্তমুখে দক্ষিণারঞ্জনও বলেন পূর্ণশশীকে: সব তাতেই তোমার কথা বলা চাই। মেয়েমানুষ ! মেয়েমানুষের মতো থাকলেই হয়। তা পারবে কেন—।

পূর্ণশশীর কুঞ্চিত মুখে এক যন্ত্রণার আলোড়ন খেলে যায় হঠাৎ, ক্ষুব্ধ কান্না ভরা গলায় চেঁচাতে থাকেন: কি বললে ! বলছো কি তোমরা বাপ-ছেলেতে ? সবাই আমার কাছে সমান। দশটা ছেলে-মেয়ের মধ্যে চারটেতে এসে ঠেকেছে, কারুর কষ্ট আমি সইতে পারিনে। কুলদার কষ্ট আমি বুঝি কিন্তু ওর মনে আজকাল ও সব কি ঢুকেছে—এঁ্যা ?

দক্ষিণারঞ্জন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগেও বিড় বিড় করে বলে যান: জ্বালা না বাড়ালেই হয়। এসব গুরুতর ব্যাপারে তোমারই বা কথা বলা কেন !

এবার পূর্ণশশী একেবারে হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠেন: তা ঠিক, তা তো বলবেই। আমি যে এ বাড়ির দাসী-বাঁদী ছাড়া কিছু না। ন' বছরে এ সংসারে ঢুকেছিলাম, আজ চৌষট্টি বছরেও আমার কথা বলার সময় হোল না।

টস্ টস্ করে ঠাকুরমার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছে গাল বেয়ে। কান্নায় বেঁকে যাওয়া কুঞ্চিত মুখ, কাঁদলে আরও বেশি খাঁজ পড়ে যায় সে মুখে।

কান্না-চেঁচামেচি শুনে মা এসেছিলেন, হাত ধরে সরিয়ে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন। কাকীমাও একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে অপরাধীর মতো।

পূর্ণশশী এবার চোখভরা জল নিয়ে হঠাৎ সরস্বতীর দিকে তাকিয়েছেন। তীব্র গলায় বলে ওঠেন: তোর জন্যেই তো যত কিছু। বাপ-মা খাগী, বছর-বিয়োনী বউ। বলবেই তো কুলদা। তার কি? দুটো মাত্তর ছেলেমেয়ে তার, সে এত খাটবেই বা কেন এক গুষ্টির জন্যে।···অমন পেটে আগুন জ্বালিয়ে দিই........।

কাকীমা সে কথা শুনে থরথর করে কেঁপে উঠে কেঁদে ফেলে, প্রায় ছুটে পালিয়ে যান সেখান থেকে।

মমতা লজ্জিত মুখে বলতে থাকেন: ছি ছি মা, ছি ছি! অমন করে বলে? ছেলেমেয়ের মা, তার পেটে আগুন জ্বালাচ্ছেন। বালাই ষাট! ওর কি দোষ?........ছিঃ, স্বচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে কি সুখ-শান্তিও বিসর্জন যায় সংসারের।······এই যুদ্ধ লাগার পর থেকে ওঁর মাথাটাও যেন কেমন ......ছিঃ।

পূর্ণশশীর চোখ দিয়ে আরও জল গড়ায়। সমস্ত মুখখানাই ভাসতে থাকে চোখের জলে।

সেফু এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে, এবার, সে হঠাৎ ছুটে ঠাকুমার সামনে গিয়ে কান্নাভরা চাপা চাপা গলায় বলে: ইস্—বুড়ি কোথাকার। কেন তুমি আমার মাকে বলবে অমন করে!

মমতা গম্ভীর মুখে তাকে ধমক দেন: সেফু—তুমি কেন সব কথায়? যাও এখান থেকে।

সে গ্রাহ্যও করে না, তেমনি ফুলতে ফুলতে বলে: ইস্, কেন যাব? ও কেন আমার মাকে ম্না-তা বলবে! কেন?



চব্বিশ

কে যেন কথা বলছে অধীরকার সঙ্গে। অরুণকা, প্রসন্নকা, ধীরেনকাদের মধ্যে কেউ নয়—নতুন কেউ। ছবি তাই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। সে বলছে : মেদিনীপুর আমি দেখিনি অধীরদা কিন্তু কোলকাতা তো দেখেছি আর যা দেখেছি তারও কোনো তুলনা খুঁজে পাইনি। এতটুকু ছেলেগুলো বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিয়ে বলে, মারো। গুলি করো। তাদের কথা কি ভোলা যায় ?

অধীরকা বলছে : তাদের মিথ্যা ভালবাসা, বীরত্বকে কোনোদিন দেশ ভুলবে না, তমাল !

: সেই প্রাণ দেওয়া দেখে এসে এখন আর মন বসান যায়, কোনোমতে প্রাণগুলোকে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টায় ?

: তবু করতে হয়, তমাল !

ছেলেটা এবার আবার জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছে : লোকে বলে গোলায় ধান থাকতেও কাড়া হবে না কেন, দোকানে কাপড় থাকতেও লোকে বিবস্ত্র হয়ে বেড়াবে কেন ? কেন আমরা এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে সব লুটপাট করে নিই না—কেন আমরা ভেতর থেকে প্রচণ্ড জোর দিয়ে ওই পশুগুলোকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দেব না ?

: পারলে এত ভাল হোত তমাল, যে আমার মতো মরমর একটা রোগীও হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়তো সেই মুহূর্তে। কিন্তু পারছি কি আমরা ? ঝাঁপিয়ে একদিন তো পড়তেই হবে কিন্তু তারও সময় আছে রে ! এলোপাতাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ে রাগের মাথায় খুঁচিয়ে দিলে সেখানে খানিকটা ক্ষত হতে পারে কিন্তু হিংস্র জন্তুটা মরে না তাতে। আসল ঘা দেবার একটা পথ আছে, তার জন্যে অনেক ভাবতে হয়, প্রস্তুত হতে হয়—হঠাৎ হয় না।

: কাজ করতে এসেছি অধীরদা—করবও। কিন্তু গ্রুয়েল কিচেন

করে মানুষগুলোকে বাঁচাতে হবে? ওই সরকারের হাত থেকেই নিয়ে? গঞ্জে চাল ব্যবসায়ীদের ঘরে জমা হবে অথচ তার জন্যে কাজ হবে আইন করে বার করে আনার—লুট করার নয়?

অধীর বলে: যদি নিয়ম মানিস, দৈবে বিশ্বাস না করিস তবে এও সহ্য করতে হবে, তমাল। জানিসনে, কতবড় অপবাদের যন্ত্রণা সহ্য করে আমরা চলি—? তার চেয়েও কি বেশি জ্বালা আছে? শুধু কি শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অপবাদ? নিজের দেশ ছেড়ে আরও একটা দেশের দিকে তাকিয়ে থাকার অপবাদ নেই?

অধীরের ঘরের দেওয়ালে একখানা পৃথিবীর ম্যাপ টাঙানো আছে—তার জায়গায় জায়গায় লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া। সেখানকার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে যেন স্বপ্ন দেখে ওঠে: আমি গাঁয়ের মানুষ, আমার সমস্ত চিন্তাটাও এই গাঁয়ের মতো। চাষা-ভূষোর সঙ্গে আমার কথা, চিন্তাও তাদের মতো। তোদের শহরের চিন্তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হয়তো পারিনে—তেমন করে বোঝাতেও হয়তো পারিনে কিন্তু একটা কথা বুঝি তমাল। মানুষের গতি বদলে দিয়েছে সারা পৃথিবীতে ওই একটা মাত্র দেশ—তার হারা-জেতার ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। আধমরা মানুষের চোখের মণির মতো একটা আদর্শ তার অস্তিত্বের একটা পরীক্ষা হতে চলেছে—আমরা তাকিয়ে থাকব না সেদিকে? সেই বিরাট আদর্শটা সামনে আছে বলেই তো ছোট ছোট কাজগুলোকেও হাসিমুখে করা যায়—ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

ছবি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, পায়ের তলাটা রোদে ঝলসে যাচ্ছে। এগিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়ায় সে।

তখনও ছেলেটা বলছে: বেশ, যতদিন আছি কাজ করব আমি। সে গোলা থেকে আইন করে ধান-চাল বের করাই হোক, রিলিফ কিচেন-ই হোক আর গান গেয়েই হোক। দুর্ভিক্ষটাকে যদি তাতে ঠেকানো যায়—রাজি আছি। বলে সে হেসে ফেলে: দিন কাজ অধীরদা।

হঠাৎ অধীরের চোখ যায় বাইরে অপেক্ষমান ছবির দিকে। চেঁচিয়ে ডাকে: ওরে, তুই বাইরে কেন রে চোরের মতো? ঘরে আয় না।

ছবি ঘরে ঢুকলে সে এবার হেসে ছেলেটার কথার উত্তর দেয়: দিন কাজ বলে হাত পাতলে কি কাজ পাওয়া যায় পাগল। তোরা শহুরে মানুষ—এখানকার কাজ সেখানকার মতো তো নয়। এখানে তোমার ওই লুটোন কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে কাদা ভাঙতে হবে। দরকার হলে সাঁতার কেটে এ গ্রাম ও গ্রাম করতে হবে, মাইলের পর মাইল পথ হেঁটে পাড়ি মারতে হবে, তাদের সঙ্গে খেতে হবে মোট চালের ভাত আর লঙ্কাপোড়া—তাও যদি ওদের জোটে তবেই। কি বলিস ছবি—এঁ্যা? শহুরে বাবু এসেছেন গ্রামে কাজ করতে—ও তো পালাল বলে!

জড়ানো সংকুচিত পায়ে ঘরে ঢুকে ছবি একপাশে দাঁড়িয়েছিল, এবার সে চোখ তুলে ছেলেটাকে একবার দেখে নেয়—কালো আর লম্বা একহারা চেহারার একটা সাধারণ ছেলে, চশমার ফাঁকে দুটো সাধারণ চোখ, মাথায় কোঁকড়ান চুলগুলো পেছনে টেনে আঁচড়ানো। ছেলেটা এতক্ষণ উত্তেজিত হয়ে গরম গলায় তর্ক করছিল কিন্তু ছবিকে দেখে সেও কি ভেবে চুপ করে থাকে। ছবি বারে বারে এ-কোণ ও-কোণ থেকে ওর শহুরে-পনাটাকে আন্দাজ করবার চেষ্টা করে কিন্তু অদ্ভুত লাগে না কিছু। বরং সাধন ওর চেয়ে অনেক বেশি শহুরে ছিল—চলায়-ফেরায়, পোশাকে।

অধীর বলে: ওকে চিনিস, তমাল? আমাদের কুলদাদার মেয়ে ছবি। দেখিসনি আগে?

তমাল খানিক ভেবে মাথা নাড়ে—সে মনে করতে পারছে না কোথায় ছবিকে দেখেছে। হয়তো খুব ছোটবেলায় দেখে থাকবে যখন তারা গ্রাম ছেড়ে যায় কিংবা হয়তো একেবারেই নয়। কে ছবি? একশো গণ্ডা গ্রামের মেয়ের মতোই আরও একটা নাম। সহজভাবে সে বলে: হবে। আমি চিনি না।

চেনে না বেশ, তার জন্যে কিছু না। কিন্তু অমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছাড়া কি সেটা বলা যায় না। শহর কি ছবি দেখেনি—নাকি সে সহরটার শহুরে-পনার কোন দাম নেই? কোলকাতাটাই সত্যিকার শহর?

অধীর বলছে: ওকে জানিসনে তমাল, ও একেবারে খাস বোমা-পড়া শহর থেকে ফেরা মেয়ে—সামনের বছর ম্যাট্রিক দেবে। তোর

চেয়ে অনেক ভাল রাজনীতির সঙ্গে ওর পরিচয় আছে, ওকে জিজ্ঞেস কর। ও তোকে আরও ভাল করে বুঝিয়ে দেবে বাঁচতে চাওয়া কাকে বলে।

: যাঃ,—ছবি একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে যায়, কি যে করে কাকাটা। দেখ তো কাণ্ড! সে কি বোঝে ছাই—তাও আবার ওই ছেলেটার সামনে অমন করে বলা, যে চোখ তুলে তাকায়নি পর্যন্ত তার দিকে।

অধীর এবার হাসে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে: তমালকেও আবার তাই বলে যা-তা ভাবিসনে ছবি। কোলকাতার কলেজে ও বি. এস-সি. পড়ে।

সে কথা শুনে ছবি এবার ভাল করে তাকায় তার দিকে। বি. এস-সি. পড়ে। সেটা যে স্বপ্ন ছবির কাছে—তার কল্পনার স্বপ্ন, কত আর বড় হবে তার চেয়ে, না হয় চার বছর, না হয় পাঁচ বছর—এর মধ্যেই বি. এস-সি পড়ে!

দুবার উঠে চলে যেতে গিয়ে অধীরের বাধায় ওঠা হয়নি—কিন্তু এবার তমাল আর শোনে না। সত্যি সত্যি উঠে যায়।

ছবি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে একটা মুহূর্ত তারপর হঠাৎ চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখে অধীর তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে এবার রাগ করে। দপ করে অধীরের পাশে বসে বলে: উঃ কি লজ্জাটাই তুমি দিতে পার কাকা? বললে, আমি নাকি কত কি বুঝি! কি বুঝি? ছাই!

অধীর বলে: বুঝবি, বুঝবি।

: ছাই! চাইনে বুঝতে। আমি চেয়েছিলাম লেখা-পড়া শিখতে। বাড়ির সামনে দিয়ে কলেজের ছেলে-মেয়েদের যেতে দেখে ভাবতাম আমিও তো যাব একদিন ওমনি করে। এম. এ, বি. এ. পাশ করব, চাকরি করব। কি হোল? কিছু না।

: শুধু কি তোর? মানুষের যে সবই শেষ হতে চলেছে ছবি—ঘর-সংসার, আশা-ভরসা—সেটাও বোঝ্।

: কিন্তু বুঝে আমার কি হবে তাই বল না? আমি তো আর পড়তে পাবো না, আমি তো যা হতে চাই, হতে পারব না।

: কি হতে চাস বল ?

: কি চাই !—ছবির খানিকটা সময় লাগে ভাবতে, সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে : কাকা আমি বাসন্তী, দুর্গাদের দেখে এসেছি, অন্য মেয়েদের দেখলাম, সেফুটাকে, নতুপিসিকে দেখছি আর আমার কান্না পাচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে আমি তো ওদের কারুর মতো হতে চাইনে—কিন্তু কি যে করব তাও তো বুঝতে পারছিনে।

সে কথা শুনে পরম স্নেহে অধীর তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলে : কাঁদিসনে ছবি, কেঁদে তো কিছু হয় না। যন্ত্রণার ভেতর দিয়েই তো পথ করে নিতে হয়—নিজের শক্তিতে বিশ্বাস রাখতে হয়, বিশ্বাস নিতে হয়। ছাখ তো আমাকে, উঠতে পারিনে, হাঁটতে পারিনে কিন্তু তবু বিশ্বাসের জোরে বেঁচে আছি। জানি তার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক আর যা বিজ্ঞান তার মৃত্যু নেই।

: সেই বিশ্বাসটা আমি পাব না—যা থাকলে সব কষ্ট সহ্য করা যায়।

অধীর হেসে বলে : পাবিই তো, কিন্তু তাকে অর্জন করতে হবে—চেতনা দিয়ে, চিন্তা দিয়ে। যেমন দেখ, তোর ঠাকুমা। নবছর বয়সে বিয়ে হয়ে এসে এখন বুড়ো হয়ে গেছে—কিন্তু কি করেছে সারা জীবন? কিছু না। ছেলে-মেয়ে মানুষ করেছে, রান্না করেছে, চোখের জল ফেলেছে। কিংবা তোর মা, কি আমার মা। জিজ্ঞেস কর—কি পেলে? বলতে পারবে না। কি আবার পায় মেয়েমানুষ—এ ছাড়া? এইভাবে ওরাই যে জন্ম জন্ম ধরে মানুষ হয়ে এসেছে—প্রশ্ন জাগেনি, কারও নি। সেইজন্যে এর ব্যতিক্রমটাও ওদের কাছে অদ্ভুত। তোকে সেটা বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে।

অধৈর্য হয়ে ওঠে ছবি : কিন্তু কেমন করে সেটা বলো না।

: লেখা-পড়া কর—জানতে শেখ, নিজেকে গুটিয়ে রাখিসনে। তোর বাবা তোকে বেঁধে রাখতে চাইবেন, দাদু হুংকার ছাড়বেন, মা-ঠাকুমার চোখের জল তোকে ভাসিয়ে দেবে কিন্তু ভয় পাসনে, ছবি। ভয় পেলে তো চলবে না। ভাবছিস লেখা-পড়া শিখলেই বুঝি মুক্তি? চাকরি করলেই বুঝি সম্মান? কিন্তু এদেশে তার কোনোটা নেই। তবু ছবি, তোকে আমি ভয় দেখাবো না। ক্রমশ আসল গলদটা

যেদিন ধরতে পারবি সেদিন পৃথিবীতে ভয় পাবার আর কিছু থাকবে না। অনেক ছুদিন পার হতে হবে, হয়তো প্রাণটাও দিতে হবে সে মুক্তি আনবার জন্যে, কিন্তু তবু আনন্দ তাতে। সেই মুক্তির আনন্দেই হাসতে হাসতে প্রাণ দিচ্ছে আজ অনেক দেশের মেয়েরা....।

অনেকক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে অধীর চোখ বুঁজে চুপ করে থাকে এবার। ঘর থেকে বেরোতে পারে না, ভালো করে হেঁটে চলে বেড়াতে পারে না বলেই বোধ হয় অধীরের মধ্যে এত যন্ত্রণা। ও কেবল বলতে চায়, নানাধরনের কথা আর খাঁচায় পোরা একটা ছটফটে পাখির মতো মাঝে মাঝে দূরের গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওদের সে চেনে, ওদের কথা শুনেছে, ভাষা বুঝেছে—বুঝি প্রাণের মধ্যে নতুন আলোও সে-ই জ্বালিয়ে দিয়েছিল একদিন। কিন্তু শক্ত আর সে ওদের মধ্যে যেতে পর্যন্ত পারে না। এখন তার মনে হয় আগে জানলে আরও বেশি করে সে খাটতো, ঘুরতো, একটুও বিশ্রাম না নিলে কি হোত তার? না হয় বড় বেশি তাড়াতাড়ি মরতে হোত, হয়তো কোন গ্রাম থেকে ফেরবার পথে মুখ থুবরে! কিন্তু এমন পঙ্গু হয়ে তো থাকতে হোত না তাকে, দিনে দিনে যন্ত্রণা সহ্য করতে হোত না।

অরুণ, প্রসন্ন আছে। ওরা খাটে, মানুষগুলোকে এক করতে তারা জানে, বোঝাতে জানে, কিন্তু তাতে কি! তাকে ওরা টাকা তুলে ভাল করে চিকিৎসা করাতে চায় কিন্তু পারছে না। মাঝে মাঝে সেটা বোঝা যায় নতুন কোনো শহর থেকে আসা ডাক্তারকে দেখে, ওষুধের রঙ বদল দেখে, খাবার ব্যবস্থায় সুখাদ্য দেখে, শহর থেকে ফিরবার পথে হঠাৎ কারোর এনে রাখা কিছু ফল এসে মাথার কাছে জড়ো হলে। ওরা চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না সেটা জানাতে চায় না কিন্তু অধীর তা জানে। মাঝে মাঝে সে আবেগে হাত চেপে ধরে অরুণের, নয়তো ধীরেনের, নয়তো প্রসন্নের। ওরা তখন মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে চোখের জল গোপন করে—অধীর তাও বোঝে।

কিন্তু আবেগ যখন থাকে না—তখন? তখন মনে হয় আর কত-দিন সে এমন করে দূরের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে মায়ের কান্না

দেখবে, মায়ার কান্না দেখবে, লতুকে চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখবে! সামনে যে করাল ছায়াটা নেমে আসছে দুর্ভিক্ষের—কেমন করে তার হাত থেকে বাঁচবে গাঁ-গুলো—মানুষগুলো।

অরুণরা বলে তারা নাকি একটা মানুষকেও শহরে গিয়ে মরতে দেবে না, না খেয়ে মরতে দেবে না কিন্তু সে কেমন করে? কেমন করে!

অসহ্য চিন্তায় যখন মাথাটা ফেটে যেতে চায়, অবরুদ্ধ শক্তিটা যখন তাকে ভেতর থেকে খুঁচিয়ে মারে তখন সে সব ভুলে গিয়ে হঠাৎ হাত-পাগুলোকে জোরে নাড়া দিয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে চায় কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আবার যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়ে বিছানায়।

ছবির হাতখানা তখনও অধীরের হাতের মুঠোয় ধরা ছিল, এবার সে ছেড়ে দেয়। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছবির কান্না পায়, আস্তে আস্তে বলে: গান শুনবে কাকা? গান শুনতে তুমি যে ভালোবাস।

: গান!—চোখ খুলে অধীর বলে, গান ভালোবাসি ছবি, কিন্তু এক এক সময় তাও ভালো লাগে না। জানিস, তিনটে রাত পরপর আমি ঘুমোতে পারিনি, এই অসুখে একে তো ঘুম হয়ই না তারপর এমন সব চিন্তা। তুই সব হয়তো বুঝবিনে কিন্তু কেউ যদি বুঝতো—কেউ! কেউ যদি তেমন করে লিখতে পারতো আমাদের কথা! তুই গোর্কির 'মা' পড়েছিস ছবি?

ছবি মাথা নাড়ে—সে পড়েনি। অধীর আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়, বলে: পড়, জানতে শেখ, বুঝতে শেখ। কেবল কেঁদে, কেবল ভেবে কিছু হয় না। জেনে বুঝে বড় হ। তোরা যদি বাঁচিস নতুন করে, আমাদের মরাও সুখের হবে।

ছলছলে চোখে ছবি বলে: অমন করে বোলো না কাকা। ও কথা শুনলে আমার বড়ো মন কেমন করে। আমার যদি টাকা থাকতো আমি তোমাকে ভাল করে তুলতাম—।

: তমালও তাই বলে গেল: ও নাকি এবার কোলকাতায় ফিরেই আমাকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেই যেমন করে হোক। পাগল আর কি! যা ছবি, অনেকক্ষণ এসেছিস। রোগীর ঘরে বেশি থাকতে নেই।

তারপর তার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায়, একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলে : প্রদীপটা নাকি এ্যারেস্ট হয়ে গেছে—শাস্তিও হয়েছে বছরখানেকের। কিছু জানতাম না এতদিন, বিমলের চিঠিতে জানলাম।

: মণিদা? মণিদা জেল খাটছে?—ছবির চোখ ছাপিয়ে জল আসতে চায়।

: মন খারাপ হোল তো? ওই আর এক ছেলে, তোর মতোই ছটফটে স্বভাব। পড়বে, আঁকা শিখবে অথচ বাড়িতে কেউ রাজী না। শেষে আমার কাছে এসে হাজির, কাকা তোমার কোনো চেনা লোকের কাছে চিঠি দাও যেন অন্তত গিয়ে উঠতে পারি। কে ঠেকাবে তাকে? বিমলের কাছে চিঠি দিয়ে দিলাম বাধ্য হয়ে।

ছবিকে যেতে দেখে অধীর ডাকে : শোন্ ছবি, তোর মাকে বলিসনে এখুনি। একে তো বাড়িতে যন্ত্রণার শেষ নাই তারপর হয়তো শুনে কান্নাকাটি করবেন।

—না! মাকে বলা যাবে না। প্রদীপের কথা উঠলেই মমতার চোখ ছলছল করে। মানুষ যাকে বেশি ভালোবাসে তার নামটা যেমন বেশিবার বলে না, সেটাকে সযত্নে লুকিয়ে রাখে, নিজের মনে মনে উচ্চারণ করে, মমতাও তেমনি করে যেন ছেলের নামটাকে লুকিয়ে বেড়ান। বাড়িতে তার প্রসঙ্গ উঠলেই সরে যান সামনে থেকে। তাই মাকে বলা যাবে না।

বইগুলোকে আঁচলের তলায় ঢেকে নিঃশব্দ পায়ে নেমে এসে কোনোমতে নিজেদের রোয়াকের ওপর গিয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত যে ভয়টা থাকে মনে মনে, আজ হঠাৎ সেটাই ঘটে যায়। একেবারে বড়কাকা সুখদার মুখোমুখি পড়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। সুখদা নিঃশব্দে কঠিন দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপরেই দৃষ্টিটা বদলে যায়। কাছে সরে এসে মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করেন : কোথায় গিয়েছিলি রে ছবি?

উত্তর দেবে কি! বই-ধরা হাতখানা তার আঁচলের তলায় আড়ষ্ট

হয়ে থাকে। সে যে লুকিয়ে প্রায়ই অধীরের ঘরে যায় এটা মমতা ছাড়া বাড়িতে কেউ জানে না। এ বাড়ির প্রত্যিটি ছেলে-মেয়ের ওপর নিষেধের বেড়া আছে, সে বেড়া ডিঙোতে পারা কঠিন। ছবি দুদিন শহর থেকে এসেই যে সে বেড়া ভাঙবে এটা দাদু, বাবা, বড়কাকা কেউ সহ্য করবেন না। সে তাই চুপ করে থাকে।

সুখদা নিজেই তার হাত থেকে বই-গুলো টেনে নেন, উল্টে-পাল্টে দেখেন তারপর হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো বলেন: বলবো কোথায় গিয়েছিলি? অধীরের ওখানে—তাই না? ও ঘরে বেশি যেতে নেই ছবি, রোগটা যে বড় খারাপ।

বড়কাকা রাগ করেননি, রাগ করলে মানুষ অমন করে কথা বলে না। ছবির হঠাৎ ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়—তার চারপাশে ভিড় করে আসে আরও অনেক স্মৃতি। কিন্তু বড়কাকা তাদের মারছেন এমন একটা ঘটনাও মনে করতে পারে না। আসলে বড়কাকাকে ছবি ভাল করে চেনেই না—আজ পর্যন্ত না। আজ কথা বলতে গিয়ে সে প্রথমে অধীরের কথা বলে: অধীরকা কি আর বাঁচবে না বড়কা? তোমরা কেউ একটু দেখ না, কাকার তাই ভাল করে চিকিৎসা পর্যন্ত হয় না। কাকা তো নিজের জন্য জেল খেটে অসুখ করেনি, কাজ করেছে দেশের জন্যে। কেন সবাই এখন বাঁচাবে না অধীরকাকে?

কোনোদিন অধীরের কথা সুখদা ভাল করে ভেবেছেন কিনা কে জানে কিন্তু এই মুহূর্তটায়, ছবির ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁরও বুকের কোন্‌খানটায় যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। লজ্জিত মুখে হাসবার চেষ্টা করে সুখদা উত্তর দেন: আমার কি টাকা আছে রে পাগলী? জানিস মাস্টারীর মাইনে কত? অধীরটাকে আর বাঁচানো গেল না রে ছবি, আমিও তাই মাঝে মাঝে ভাবি! এতটুকু বেলা থেকে ওকে দেখে আসছি। আমি যেবার প্রথম জেলে গেলাম আইন অমান্য আন্দোলনে—ও তখনও স্কুলে পড়ে কিন্তু জেল খাটছে তখন থেকেই। গ্রামের আর সব ছেলেগুলোকেও তো ও-ই নামিয়েছে স্বদেশীতে।

ছবি বলে: তুমিও জেলে গিয়েছিলে বড়কা? কই বলনি তো কোনোদিন?

: বলবো কি? বলবার মতো আছে কিছু? সেই একবার জেল খেটেই সব শেষ। কিন্তু অধীরের কথা আলাদা। বড়ো ভালো ছেলে ওরা। লোকে বলে, বাউণ্ডুলে, মা বাপকে দেখে না। তা হয়তো সত্যি, তাকে আমিও মানি না কিন্তু মন ওদের খাঁটি। ওদের নাকি পথ বদলেছে—ওরা নাকি ইংরেজের টাকা খেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে দেশের সঙ্গে। কিন্তু আমার কি মনে হয়, ছবি জানিস?

: কি?—ছবি আগ্রহ নিয়ে সুখদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

: আমার মনে হয় কথাটা মিথ্যে—একদিন না একদিন সেটা প্রমাণিত হবে। সোনাকে ছাই দিয়ে ঢাকা যায় না।

ছবিরও কি মনে হয়, নিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলে: তাই কাকা। নিশ্চয়ই মিথ্যে। দেশকে কি ভীষণ ভালোবাসে অধীরকা জান? আর কি ভীষণ বিশ্বাস করে মানুষকে। এত যে অসুখ, তবু এতটুকু দুঃখ নেই কাকার—এখনও হাসে, কত কথা বলে।

সে কথা শুনে সুখদা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যান। নিজের মনে বিড় বিড় করেন: পারে, ওরাই তা পারে কারণ যাহোক একটা বিশ্বাসকে পেয়েছে ওরা। কিন্তু আমি কি করেছি এতকাল! কিই বা করলাম! এখন সবাই বলে চোরা-কারবার করতে—তাতে টাকা আছে, তাতে—!

ছবি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সুখদা নিজেকে সামলে নেন, ফিরে আসেন সম্পূর্ণ অন্য কথায়: বউদি বলছিল, তোর নাকি খুব পড়বার ইচ্ছে, ছবি? কিন্তু এ বাড়িতে—। যদি সত্যিই ইচ্ছে থাকে আমার কাছে আসিস। সকালে আমি পল্টুদের নিয়ে তো বসি-ই, তুইও পড়বি! আসিস্—অন্যমনস্কের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বড়কাকা চলে যান।

এমনিতে খুব স্বল্পভাষী বড়কাকা। মাস্টারী করতে করতে ভাবনা চিন্তাগুলোও তাঁর ছাত্রদের কেন্দ্র করেই। যে ছেলেকে যখন দেখেন গ্রামার আর ট্র্যানস্লেশনের প্রশ্ন করেন, অন্য কথা বলবার আগে। কারুর ভুল ইংরিজী বলা, ভুল লেখা সহ্য করতে পারেন না। পড়াশোনা বলতেও স্কুলের বইগুলোই নাড়াচাড়া করেন আর বাকি সময়টুকু চুপ করে থাকেন।

বাড়িতে ঠাকুরদাকে মাঝে মাঝে বলতে শোনা যায়: রায়বংশের হোল তাল—এক ছেলে গরু ঠেঙায়, এক ছেলে তেল-নুন মাপে।

তবু ফুলদা'র যেন মর্যাদা আছে, কথার মূল্য আছে,। ঠাকুরদা তার কথা মন দিয়ে শোনেন, কিন্তু বড়কাকার সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা মেশানো থাকে তাঁর ব্যবহারে, কথায়।

নিঃশব্দ বাড়িটায় সবাই এখনও ঘুমোচ্ছে হয়তো, নয় শুয়ে আছে চুপ করে। উঠোনের ওপর বিকেলের ছায়া পড়ে আসছে। সেই ছায়া-ছায়া জায়গাটায় গোটাকয়েক শালিক কিচির-মিচির করে ঝগড়া করছে। বড় দিদিমাদের ভাঙা ঘরের মাথার ওপর থেকে একটা কাক কর্কশ স্বরে ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে। মাথার ওপর রোদে ঝলসানো আকাশে গোটাকয়েক চিল ঘুরপাক খাচ্ছে—তারও ছায়া পড়েছে উঠোনে।

এমনি পরিপূর্ণ নৈঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে বড়কাকার কথাটাই কেবল ভাবতে থাকে ছবি। বড়কাকার সেই 'ব্যবসা করতে পারবো না' বলে উঠে যাওয়া, ক্লান্ত ম্লান মুখে অসুখী মানুষের মতো ঘুরে বেড়ানো, সব যেন ভেসে ওঠে চোখের সামনে। বড়কাকারই তো ছেলে-মেয়ে বেশি। তাঁর মাস্টারীর আয়ে এ বাড়ির তেলের খরচটাও নাকি ওঠে না—বাড়িতে অনেক লোক, বাবা তাই রাগ করেন, ব্যঙ্গ করেন।

বড়কাকা বোঝেন সব। তাই কিছুই তাঁর ভাল লাগে না। এ সব কিছু চানও না—কি যে চান তিনি। কিছু একটা। যেন যা চেয়েছিলেন তা পাননি—পাবার উপায় নেই। তাই অসুখী আত্মার মতো অনেক ছেলেমেয়ের বাবা, এক গেঁয়ো স্কুলের গেঁয়ো মাস্টার বড়কাকা ঘুরে ঘুরে বেড়ান। মা, দুর্গা, মায়াদির মতো বড়কাকাও যেন মাথা ঠুকছেন না-বোঝা একটা কষ্টের দেওয়ালে!

পঁচিশ



কি কাজে একবার সকালেই ওপরে উঠে আসছেন, হঠাৎ সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়াতে হয় মমতাকে একরাশ বই-খাতা নিয়ে ছবিকে নেমে আসতে দেখে : কোথায় যাচ্ছিস ? ঠাকুমা তখন থেকে যে নাড়ু পাকানোর জন্যে ডাকাডাকি করছেন তোকে।

সে কথায় কানও দেয় না মেয়ে, বলে : পড়তে যাচ্ছি মা বড়কার কাছে বৈঠকখানায়। পল্টুর সঙ্গে দেখো, আমিও কেমন পাশ করি।—কথা শেষ করে উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় মেয়ে।

ফ্যাকাসে মুখে, আতঙ্কিত গলায় পেছন থেকে নাম ধরে ডেকে ফেরাতে গিয়েও আবার থেমে যেতে হয় মমতাকে—মেয়ে চলে গেছে। অসহায়ের মতো খানিক দাঁড়িয়ে থেকে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রান্নাঘরে ঢোকেন।

পল্টু ছাড়া রোজ সকালে আরও যে দুজন ছাত্র পড়তে আসে সুখদার কাছে তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ছবির দিকে। পল্টু খুশিমুখে বলে : বাবা, ছবি পড়তে এসেছে।

অঙ্ক মেলান বন্ধ রেখে সুখদাও খানিকটা অবাক হয়ে তাকান : চলে এলি তাহলে ? আয়, বোস্।

বই খুলে ইংরিজী একটা প্যাসেজ দেখিয়ে বলেন : এটার বাংলা কর তো।

ছবি করে ফেলে। দেখে বলেন : বা বেশ।

বই খুলে এবার তিনি ইংরিজী কবিতা বুঝিয়ে দিতে থাকেন। ছবি অবাক হয়ে শোনে। সুধাদি চলে যাবার পর থেকে নতুন পড়াগুলোর সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ ছিল না, কতদিন যে শোনেনি এমন করে পড়া। কতদিন সে পড়তে পায়নি। বড়কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দে মনটা পূর্ণ

হয়ে যায়। পড়তে পাওয়ারও যে একটা আনন্দ আছে এটা সে নতুন করে বুঝতে পারে।

উঠোন পেরিয়ে কাকে আসতে দেখে পড়াতে পড়াতেই চশমাটা চোখে দিয়ে সুখদা ভাল করে দেখে খুশি মুখে বলেন : যাক, তমাল এসে গেছে। পণ্টু, অঙ্কগুলো তোমরা তমালের কাছ থেকে বুঝে নাও আমি ততক্ষণ হরেনদার দোকান থেকে কাগজখানা পড়ে আসি। কবিতার বাকি অংশটুকু গাড়িয়ে হবে।

তমাল হাসিতে মুখ ভরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। হাতে তার খানকয়েক বই। ছবি একবার তাকিয়েই বুঝতে পারে বইগুলো সে অধীরকাকে ফেরত দিতে যাচ্ছে।

সুখদা বলেন : তমাল, তুমি অঙ্ক কটা একবার দেখিয়ে দাও বাবা, আমি এই ফাঁকে একটু ঘুরে আসি। ছবি, কই, বসে আছিস কেন, খাতা-পেন্সিল নিয়ে বোস্, তমাল যা করায় করে ন্যাল।

ছবির মাথায় অঙ্ক ঢোকে না এটা তার মতো ভাল আর কেউ জানে না। তাও বড়কাকা হলে লজ্জা ছিল না, বারে বারে বুঝে নেওয়া যেত, ভুল হলেও লজ্জার কিছু থাকতো না কিন্তু নতুন লোকের কাছে করতে তার ইচ্ছে করে না। তাও আবার কালকের দেখা সেই ছেলেটা—যে শহুরে কায়দায় ঠোঁট উল্টে বলেছিল, হবে, আমি দেখিনি।

মাথা নিচু করে সে শক্ত হয়ে বসে থাকে। ছেলেরা অঙ্ক কষতে সুরু করলে পণ্টু বলে : তুই কষবিনে ছবি ?

: না।

: কেন রে ? তমালদা করাচ্ছে বলে ? জানিস তমালদা বি.এস-সি. পড়ে কোলকাতার কলেজে ?

ছবি মাথা নেড়ে জানায় যে সে জানে তা।

তমাল এবার হো হো করে হেসে ওঠে হঠাৎ, বলে : আমি বুঝেছি পণ্টু, আসলে ছবি অঙ্ক পারে না—তাই অমন করছে। এই নিয়মটা বুঝি জান না ছবি—না ?

এতক্ষণে ছবি মাথা তোলে। লজ্জায়, অপমানে তার চোখ ছলছল হয়ে উঠেছে। সে ইতিহাস পারে, ভূগোল পারে, বাংলা, ইংরিজী তার প্রিয় জিনিস কিন্তু অঙ্ক দেখলেই কেন যে তার কান্না পায়।

: তাতে কি, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখবে কিছু কঠিন না,—তার হাত থেকে পেন্সিলটা টেনে নেয় তমাল, আরও একটু কাছে সরে এসে বুঝিয়ে দেয় কিন্তু ছবি শক্ত হয়ে বসে থাকে।

তমালের হাতে একবার তার হাতখানার ছোঁয়া লাগতেই ছবি আরও শক্ত হয়ে যায়। কয়েকটা চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে তমালের কপালের ওপর, তার নিচু হয়ে থাকা মুখখানা ছবির মুখের পাশে কিন্তু তমালের বোঝান তার মাথায় ঢুকছে না। নিয়মটা বোঝান শেষ করে সে ছবির হাতখানা টেনে খাতার ওপর রাখে : কষ্ট এবার কর।

উঠোনে চটির শব্দ করতে করতে কে যেন এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে। তারপর সেই থমকে দাঁড়ান মানুষটাই আবার বৈঠকখানার ঘরে ঢুকে পড়ে।

পল্টু বলে : নষ্ট এলেন। গোঁফ গুলেন আমাদের। জানিস ছবি, তুই তো ছিলিনে, এর মধ্যে আবার মার খেয়েছে অনিলকাকা। এবার আর কাছারি থেকে ফেরা নয়, রাত্তিরের অন্ধকারে বাসুদেবপুরের কোন্ প্রজার ঘরে গিয়েছিলেন তার কোন্ বোনের কাছে—মাথা কামিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে গিয়েছিল কুঠিবাড়ির জঙ্গলে। হি, হি, সে এক দেখবার জিনিস তিনমাস আর ঘর থেকেই বেরোয়নি অনিলকাকা। এখন বাসুদেবপুর দিয়ে আর কাছারিতে যেতে দেয় না রায়কত্তা তার ছেলেকে, নিজেই যায় ঘোড়ায় চেপে। অনিলকাকা নাকি গঞ্জে ধান-চালের আড়ৎ করেছে। অথচ জ্যাঠামশাই যখন প্রথম দোকান করলেন—ওই অনিলকাকাই তখন কত কি বলে বেড়াত। আবার যদি কেউ তেমনি করে মাথা কামিয়ে··· জানিস, বাবার দেখাদেখি যে গোঁফটা রাখত না—সেটাও ওরা অর্ধেক কামিয়ে··· হি হি,—মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসে পল্টু, তার দেখাদেখি অন্য ছেলে দুটোও। কেবল তমাল গম্ভীর হয়ে ধমক দেয় : পল্টু কি হচ্ছে ওসব ? মাস্টারমশাই না অঙ্ক কষতে বলে গেলেন ?

পল্টু মিনতি করে : তুমিও আর বোকো না তমালদা। ইস্কুলে মাস্টার মশাইদের কাছে, বাড়িতে মাস্টার-বাবার কাছে পড়ার জন্যে বকুনি তো লেগেই আছে—তারপর তুমিও যদি—। আমার ভাল লাগে না পড়তে—সত্যি বলছি। বলি তো পড়াশোনায় ইতি দিয়ে আমাকে জ্যাঠামশাইয়ের ব্যবসাতে লাগিয়ে দিক, দেখবে কি করি। ওই রায়কত্তা এখন খুব বাছুর

সঙ্গে ভাব করতে আসেন—আমি কি বুঝিনে ভেবেছ। আমি গেলে ওদের ব্যবসা ছদিনে দেখতে তুলে দিতাম। পড়ে কি হয় বল তো? টাকা! টাকাটাই আসল........।

ছজোড়া জুতোর শব্দ কখন যেন ঘরের ভেতর থেকে বাইরে এসেছে। ছজন মানুষ। একজন দক্ষিণারঞ্জন, আর একজন রায়দাছ। রায়দাছ পেছনে আসছেন।

কাছে এসে দক্ষিণা থামেন। ক্রুদ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার তাকান। ছেলেগুলোর দিকে, তমালের দিকে, তারপর সে দৃষ্টি গিয়ে আটকে যায় ছবির মুখে। মিনিটখানেক নিস্তব্ধ হয়ে থেকে হঠাৎ চাপা গলায় গর্জন করে ওঠেন দক্ষিণা: তুমি এখানে যে?

ছবি মাথা তোলে, আস্তে আস্তে বলে: বড়কাকা বলেছিলেন আসতে।

: সুখদা!—ব্যঙ্গের হাসি হেসে দক্ষিণা বলেন: সে তো বলবেই। কিন্তু ও সব মেমসাহেবী শহরে যা করেছ করেছ, এখানে চলবে না। সংসারের কাজ করগে যাও। মেয়েমানুষের পড়া! পড়ে কি জজ্ ম্যাজিস্ট্রেট হবে?

দক্ষিণার গলার স্বর বাড়তে থাকে, জোরে বলেন: যাও, উঠে যাও।

তাঁর চড়ান গলার আদেশের সুরটা থমথম করে নির্জন নাটমণ্ডপের দেওয়ালে যেন প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে। পেন্সিল ধরা হাতখানা আগেই আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল ছবির। তমালের একখানা হাতও তার একটু দূরে শিথিল হয়ে পড়ে আছে।

: ও কেন উঠে যাচ্ছে না—কেন? ওই শহুরে ছেলেটা কি মনে করে এখনও বসে আছে।—ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে ছবিও বসে থাকে। এবার সহ্য করা কঠিন, রাগে দক্ষিণারঞ্জনের সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে, এবার প্রায় ছুটে আসেন চিৎকার করে: গেলে না এখনও। এ বাড়িতে ছেলেরা আজ পর্যন্ত আমাকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি—তুমি .....। ভাল চাও তো উঠে যাও।

লজ্জার গ্লানিতে মাথা মুখ তোলে ছবি, তমালের চোখের দিকে তাকায় একবার। সে চোখে তো হাসি নেই, মজা নেই! সে দৃষ্টি কি যেন একটা বলতে চাইছে—কি?

ততক্ষণে উঠোনের ওপর লোক জমে গেছে। কি যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলাবলি করে। অবাক হয়ে, এদিকেই তাকিয়ে আছে তারা।

বই-খাতা গুছিয়ে নিয়ে ছবি এতক্ষণে উঠে দাঁড়ায়। অদম্য কান্নার বেগটা লজ্জার পাহাড়ে ঢাকা পড়ে গিয়ে এখন সারা মনটায় একটা জ্বালাভরা কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে। হাতে-পায়ে, সমস্ত শরীরে যেন চেতনা নেই তার, সে যেন একটা স্প্রিং-এর পুতুল, দম দিয়ে কেউ তাকে চালাচ্ছে।

সদর দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে যখন ঢোকে, কাকীমা সরস্বতী একেবারে অবাক হয়ে বলে : ও কিরে ছবি ? চোখ-মুখের অমন ভাব করে কোথা থেকে এলি ? শাড়িটা মাটিতে লুটোচ্ছে কেমন করে ; দেখ, হ্যাঁরে, পড়ে-টড়ে গিয়েছিলি ?

ছবি নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। সে মাথা-নাড়া দেখে সরস্বতী দ্রুতপায়ে মমতাকে ডাকতে যান।

সেফু এসে ছবির হাত ধরে : দিদি, কালকের সেই গানটা ? আজ আর একবার দেখিয়ে দেবে না ?

সেফু রাগে, কাঁদে, ঝগড়া করে। বুড়োদের মতো পাকা পাকা কথা বলে ওইটুকু মেয়ে। পড়াশোনার কথা ভুলেও বলে না, হয়তো তার স্বাদ জানে না বলেই কিন্তু আশ্চর্য সুরেলা গলা ওর। ছবিই সেটা আবিষ্কার করেছে। তার নিজের গলা ভাল না—গাইতে ইচ্ছে করার চেয়ে শুনতে তার ভাল লাগে। সে গান ভাবে বেশি, তার মনের মধ্যে গান ঘুরে বেড়ায়। দুঃখের গান তার ভাল লাগে। সে সবটুকু উজাড় করে সেফুকে শেখায়। কাকীমা বলে : শিখিয়ে দে মা, অন্তত দেখতে আসলে যেন গাইতে পারে।

ছবি বলে : তোকে আমি রবিঠাকুরের গান শেখাব সেফু—বুঝেছিস ?

সেফু হাঁ করে থাকে।

ছবি তাকে সাধনের গাওয়া গান শিখিয়ে দিয়েছে—আমি রূপসায়রে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি· · · ·।

সেফুর খুব ভাল লেগেছে সেটা। ঘরের দরজা বন্ধ করে সে গান করে। হারমোনিয়ামের শব্দ শুনতে পেলে ঠাকুরদা রাগ করেন। তেড়ে এসে বলেন, এটা কি বেশ্যালয় ? বলি নাট্যশালা নাকি এটা ?

হারমোনিয়াম একটা কেনা হয়েছিল যেন কবে, কিন্তু সেটা তোলা থাকে। তাতে মাকড়শার জাল আর আরশোলার বাসা বোঝাই।

যেদিন প্রথম তমালকে দেখল ছবি, সেদিন এসে সে সেফুকে নতুন আর একটা গান শিখিয়েছে—তোমার মোহনরূপে কে রয় ভুলে... .... !—কেন শিখিয়েছে, কেন ও গানটা গাইতে ইচ্ছে হোল সে তা নিজেও জানে না কিন্তু বড় কঠিন তার সুর আর কঠিন বলেই বোধহয় ওটার কথা মনে হয়েছিল।

সেই গানটার কথাই বলতে এসেছিল সেফু কিন্তু ছবি মাথা নেড়ে তাকে ফিরিয়ে দেয়।

ওপরের ঘরে গিয়ে শক্ত হয়ে বসে থাকে। একটা সময় যেন অনন্তকাল। বুকের মধ্যে পাথরের মতো যন্ত্রণাটা কমছে না কিছুতেই। যন্ত্রণায়, আত্মগ্লানিতে মনটা যে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে তার। কি হবে! কি হবে!

দরজার কাছে ক্ষীণ নিঃশব্দ পায়ে ছায়ার মতো কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে।

: মা!—আর্তকণ্ঠে উচ্চারণ করে ছুটে গিয়ে সে দুহাতে শক্ত করে মমতাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মাথা রেখে ফোঁপায়: আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে মা। পড়াটা আমার কাজ নয়!

: জানি—শান্ত গলায় মমতা বলেন: পণ্টু বলেছে।

তারপর ছবির মুখখানা উঁচু করে তুলে ধরেন: ছেলেদের সঙ্গে পড়তে গিয়েছিলি সে তো আছেই, বোসদের তমালও নাকি সেখানে ছিল······ কেনই বা গিয়েছিলি তুই! আমি বুঝিনে···আমার ছেলেকে-মেয়েকে—বুঝিনে আমি··· কেন যে যায়। কেন যাস!

কেন যায়!—ছবিও তা জানে না। কিন্তু যাবে সে, আবারও যাবে। তাকে যে যেতেই হবে···।

ছত্রিশ



ছবি যেন অসাধ্য সাধনায় মেতেছে। যেদিন সকাল বেলায় দক্ষিণারঞ্জন ওকে মণ্ডপের পড়ার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়েছিলেন তারপর থেকে ওর চোখ জ্বলছে, ছটফট করে বেড়াচ্ছে। ওর ছোটবেলার সেই ঘাড় বাঁকানো স্বভাব যেন আবার ফিরে এসেছে। মাঝখানের কটা বছর সেই উদ্ধত স্বভাবের ওপর খানিকটা পালিশ দিয়েছে কিন্তু মুছে দিতে পারেনি।

ঘরের একটা কোণে পড়ার ব্যবস্থা ও নিজেই করে নিয়েছে। দক্ষিণা ঠাকুরঘরে পূজো করতে যাবার সময়ে ছবির পড়ার শব্দ তাঁর খড়মের আওয়াজকে পর্যন্ত ডুবিয়ে দেয়। হয়তো একবার থমকে দাঁড়ান দক্ষিণা— কি যেন বলবেন মনে করে এগিয়েও আসেন কিন্তু ঠিক আবার তেমনি করে ফিরে চলে যান।

কোনোদিন জানতে পেরে মমতা এসে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকেন। কি একটা শংকায় তাঁর বুকটা কাঁপতে থাকে গরদের কাপড় আর নামাবলি গায়ে দেওয়া খড়মের শব্দ করে চলা শ্বশুরকে দেখে। ঠিক এই মুহূর্তটাতে সমস্ত নিঃশব্দ ঔদ্ধত্য ভুলে গিয়ে তিনি ভীতু হয়ে যান।

কিন্তু মেয়েটা ভয় পায় না। বরং দরজা আগলে দাঁড়াতে দেখলে রেগে ওঠে: সর মা, বলছি সরে যাও। আমি তো অন্যায় কিছু করছিনে।

: অত চেঁচাস কেন? না শোনালে কি চলে না যে পড়া-শোনা করিস তুই?

: চেঁচিয়ে পড়া তো আমার অভ্যেস নেই, আমি তো ইচ্ছে করে এই সময়টা চেঁচাই—পড়ি নাকি?—মেয়ে হাসে। মমতা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন।

পূর্ণশশী ডাকেন: ও ছবি, আমসত্ত্বের গোলাটা হাতে হাতে করে দে না দিদি।

ওমনি মমতা আসেন তাড়াতাড়ি: আমাকে দিন মা, আমি করে দিচ্ছি।

ছবির পড়ার শব্দটা কান পেতে শুনে পূর্ণশশী বলেন: মেয়ে পড়ছে বলে তুমি ছুটে এসেছ? ও! কিন্তু ও তো ভাল না বউমা, ও কি ভাল?

কি ভাল না সেকথা মমতাও বোঝেন না, পূর্ণশশীও বলেন না।

আজকাল সুখদা ডাকেন না কিন্তুবেপরোয়ার মতো ছবি নিজেই বৈঠকখানার বারান্দায় পড়তে যায় বই-খাতা নিয়ে।

পন্টুকে একা পড়তে দেখে বলে: বড়কা কোথায় রে?

: বাবা আজ পড়াবেন না বলেছেন, কাজ আছে।

এদিক-ওদিক তাকায় ছবি: তমালদা আর আসে না, নারে?

: আসে মাঝে মাঝে। দেখা হলেই তোর কথা জিজ্ঞেস করে, বলে, ছবিকে বলিস পড়া যেন বন্ধ না করে।

: আহা। আমার জন্যে তমালদার না ভাবলেও চলবে বলে দিস। আচ্ছা যা, দেখা হলে আমিই বলে দেব।

অধীরের ওখানে দেখা হলে কিন্তু মাথা তুলে কথাই বলা যায় না। সেই কতদিন আগের ঘটনাই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠে মাথা নিচু করে দেয় তার।

অরুণ, প্রসন্ন, ধীরেন, আরও কারা সব অধীরের কাছে এসেছে খবর শোনাতে, কথা বলতে। তমালও এসেছিল ওদের সঙ্গে, হঠাৎ ছবিকে বসে থাকতে দেখে সে চুপ করে যায়। একটা কথাও বলতে পারে না, মাঝে মাঝে ছবির মুখের দিকে তাকায়। ছবি একমনে সবায়ের কথা শুনছে, বোঝার চেষ্টা করছে।

সবাই চলে যাবার পরেও তমাল ওঠে না। কি যেন সে বলতে চায় মেয়েটাকে কিন্তু অধীরের রুগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায়, ব্যক্তিগত কথা বলার জায়গা নেই এখানে। এই মুহূর্তে ওই রোগ-পাণ্ডুর মুখটা চিন্তিত হয়ে ভাবছে অনেক কথা। সে ভাবনা বাড়ির নয়, ঘরের নয়, মায়ের চোখের জলের কথা নয়, এমন কি মায়ার কথাও নয়।

ছবির হঠাৎ মনে হয়—মায়াদি কিন্তু আর আসে না। সেই হঠাৎ একদিন সে দেখেছিল মাত্র, তারপর আর একদিনও দেখেনি। কেন আসে না? সে বলে : কি ভাবছ কাকা?

: ভাবছি।—অধীর যেন চমকে ওঠে ঘোর ভাঙে : বড় ভাবনার কথা ছবি। দুর্যোগ সুরু হয়ে গেছে, মস্ত বড় দায়িত্ব এখন। এই সময়টায় একবার যদি উঠে দাঁড়াতে পারতাম ছবি—আঃ।

আফ্‌সোসের সুরটা তমালের কানে লাগে কিন্তু আজ আর সে কোনো আলোচনায় মন দিতে পারছে না, তর্ক করতে মন চাচ্ছে না। আজ অন্য কথা বলতে ইচ্ছে করছে, শুনতে ইচ্ছে করছে।

একটা নতুন কিছু আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাকে, সে শহরে-থাকা ছেলে। কত মেয়েকে দেখেছে। কলেজে পড়া মেয়ে, না পড়া মেয়েদের দেখেছে। মিশেছে, দূর থেকেও দেখেছে। কিন্তু ছবিকে সে বুঝতে পারেনি। ফর্সা রঙের রুক্ষ চেহারার সাধারণ একটা গেঁয়ো মেয়ে তাকে হঠাৎ অবাক করে দিয়েছে।

সে ইচ্ছে করে পল্টুদের পড়াতে আসে ছবিকে দেখবে বলে। অধীরের এখানে এসে বসে থাকে, তর্ক করে আর বারে বারে দরজার দিকে তাকায়। রাস্তা-ঘাটে চলতে চলতে তমাল আশা করে থাকে হয়তো দেখা হয়ে যাবে হঠাৎ।

তাই ছবি বেরিয়ে এলে, অধীরের কি একটা বলা-কথার মাঝখানেই সে হঠাৎ উঠে যায়।

সিঁড়িতে নামবার আগে দুজনেই দাঁড়ায় একটু। একটা মুহূর্ত মাত্র। মাথার ওপর জলতে থাকে রোদে ঝলসান একখণ্ড আকাশ—কোথাও তাতে মেঘের করুণা নেই।

: তোমার জন্যে আমার যাওয়া বন্ধ হোল ছবি, জান?—তমাল বলে।

ছবি এদিক-ওদিক তাকায়। বুকের মধ্যেকার রক্ত চলাচল যেন এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। আরক্ত মুখে বলে : আমার জন্যে কেন?

: থাকব বলে এলেও চলেই যাচ্ছিলাম কিন্তু তুমি……। পড়াশোনা করছ তো? পল্টুর কাছে প্রশ্নের উত্তর আর খাতা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—পেয়েছে?

ছবি মাথা নেড়ে জানায় সে পেয়েছে।

: তুমি পাস করবেই ছবি—যেমন করে হোক। নইলে আমারও ভাল লাগবে না।

: কেন ?

: কেন !—তমাল অদ্ভুত একটুখানি হাসে কোনো কথা না বলে, তারপর তরতর করে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে।

আশ্চর্য, অভিভূত হয়ে খানিকক্ষণ কাঠের মতো সেই আগুন-ঝরা রোদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে ছবি। তমাল তার জন্য যাওয়া বন্ধ করেছে, সে পাস না, করলে তমালের ভাল লাগবে না ! কেন ?

এই 'কেন' তাকে যেন পাগলের মতো ভাবায়। অসহ্য দাহ নিয়ে সে ছটফট করে বেড়ায়। পড়ার বই খুলে আবার বন্ধ করে দেয়, সঞ্চয়িতা খুলে দুটো একটা কবিতা পড়ে—আবার রেখে দেয়। গুন্ গুন্ করে গান গায় নিজের মনে আর ভাবে, কেন !

এক অব্যক্ত যন্ত্রণা তাকে থেকে থেকে কষ্ট দিচ্ছে কেন ? নিজেকে বড় ছোট মনে হয় তার, কিছু জানে না সে, কিছু বোঝে না। মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, বাইরে-দূরে-চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করে, ছেলেমানুষের মতো মনের খুশিতে, আনন্দে, চঞ্চলতায় ছুটোছুটি করতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু তখনই যেন উমার পান খাওয়া মুখখানা মনে পড়ে যায়, তোরও বিয়ে হবে রে, হবে—ফ্যাকোস মুখ নেড়ে হাসবার চেষ্টা-করে-বলা কথাগুলো।

দুর্গা যেন এসে দাঁড়ায়, তা আর হয় না ছবি, নারে ?

কি হয় না ? বিয়ে ! বিয়ে !

সেজুর ওই ম্লান মুখ করে ঘুরে বেড়ান কেবল একটা মাত্র প্রতীক্ষায়, লতু পিসির চোরের মতো ঘুরে বেড়ান সেই জীবনের ব্যর্থতায়। মা ! কাকীমা ! দিদিমা !—কে নয় ! সুকুমারী পিসিমা, বিন্তি পিসিমার চোখের জল কি ছবি দেখেনি ?

ছবি মানতে পারবে না ওই ভবিষ্যতকে !

কিন্তু কি করবে সে ? কি করবে !

জ্ঞান হবার পর থেকে সে শুনছে সে ছেলে নয়, মানুষও নয়—সে মেয়ে। মেয়েদের জোরে কথা বলতে নেই, হাসতে নেই, পড়তে নেই। আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই।

নেই? সত্যিই কি নেই? কিন্তু এসব যে কিছুই মানছে না তার মন। অধীরকা তাকে অন্য কথা শিখিয়েছে, অন্য ভাবনা ভাবতে দিয়েছে।

পড়ার বই, সঞ্চয়িতা একপাশে সরিয়ে রেখে সে খুলে বসে আর এক কাহিনী। আশ্চর্য মুক্তি পাওয়া এক দেশের মেয়েদের কথা আছে তাতে। সেই মুক্তির আনন্দে তারা প্রাণ দিচ্ছে, প্রাণ নিচ্ছে।

আমাদের অমন হয় না? কবে হবে? কেন হয় না?

চুপ করে থাকলে অনেক পুরনো কথা মনে হয়। একবার ছাদে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে উঠোনের রোদ দেখে। ইস্—এখনও মা, কাকীমার খাওয়াই হয়নি! দুপুরে বাড়িশুদ্ধ লোক খেয়ে যায় তবু রান্নাঘর ছেড়ে আসতেই পারে না মা আর কাকীমা। কতদিন ভাত কম পড়ে গেলে আবার রেঁধে নিতে হয়, তরকারী-ঝোল কিছু থাকে না। ঝোলের থালায় ভাত মেখে খেতে হয়!

ছোটবেলায় যা দেখেছে, এখনও তাই। মাকে দেখতো রান্নাঘর থেকে ক্লান্ত মুখে বেরিয়ে এসে উনুনে হাওয়া দেবার ভাঙা পাখাখানা নিয়ে হাওয়া খেতে, কাছে দাঁড়ালেই বলত: সরে যা ছবু, হাওয়া ছাড়।—নয়তো বলত: কটা ঘামাচি মেরে দিবি?

সে মা'র ঘামাচি-ভরা পিঠ দেখে শিউরে উঠলে মমতা বলতেন: কি করব? সারাদিন রান্নাঘরে আগুনের আঁচে থাকি—দেখিস নে?

: কেন থাক সারাদিন?

মমতা তখন হাসতেন: ঘরে ঘরেই তো এই মেয়েদের বিধিলিপি—বড় হ বুঝবি।...তোর ঠাকুমার কথা জানিস? ন বছরের গৌরীদান করা মেয়ে। শ্বশুরবাড়িতে অতটুকু মেয়েকে বড় বড় হাঁড়ি-কড়াই নিয়ে রান্না করতে হোত। কতদিন নাকি ভাতের হাঁড়ি পায়ের ওপর পড়েছে, জোরে কাঁদবার পর্যন্ত উপায় ছিল না—বউ যে! স্বামী দাবা খেলে, তাস-পাশা খেলে রাত দুটোর আগে বাইরে থেকে ফিরতেন না। বউকে তো খেতে নেই স্বামীর আগে, মেয়েটা বসে বসে

ঢুলতো তারপর হয়তো একসময় ঘুমিয়ে পড়ত। অতটুকু মেয়ে! সারাদিন খেটেছে। তোর ঠাকুরদা এসে ডাকাডাকি করেছেন,ঘুম ভাঙেনি। শেষে শাশুড়ী পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে বউ-এর ছোট ছোট ঝাঁকড়া চুল ধরে, প্রদীপের আলোয় সে চুলের গোছা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তার চেয়েও করুণ ইতিহাস ছিল বাবার পিসিমা ফুলমণি দিদিমার ইতিহাস। ছবি জ্ঞান হয়ে তাঁকে দেখেছে, থুত্থুরি বুড়ি। ঠাকুমার ঘরের একপাশে দিনরাত শুয়ে থাকতেন, মাথাটা ঠক ঠক করে কাঁপতো। বিয়ের দুবছর পরেই বিধবা হলে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে—। তারপর সারাজীবন ভাই-এর গলগ্রহ হয়ে কেটেছে বুড়ি দিদিমার।

এবার ফিরে এসে আর ছবি দেখতে পায়নি সেই অসহায় মানুষটাকে। জানতে চাইলে মমতা বলেছিলেন: বুড়ি মরে বেঁচেছে। শেষের কটা দিন যা কাণ্ড—কথা বন্ধ, হাত-পা অসাড়। তবু প্রাণটা কি সহজে যায়!

যেন মরার জন্যেই দীর্ঘ জীবনটা প্রতীক্ষা করে থাকা!

গল্প শেষ করে মমতা বলতেন: এ কাল তো তবু ভাল রে।

তবু ভাল! কিসে ভাল? সেকালে ফুলমণি দিদিমারা ছিল। একালে আছে উমা, দুর্গা, বিন্তিপিসি, লতুপিসি....সুকুমারী পিসিমার সব থেকেও কিছু নেই। কাকীমা ঘোমটাটা উঠিয়ে দেখতেও ভয় পায়, ঠাকুরমার তোবড়ান গাল বেয়ে জল গড়ায়, অধীরকার মা নতুন দিদিমা নির্বাক হয়ে থাকে। আর তার মা মমতা!

কাল রাতে ঘুম ভেঙে সে মা আর বাবার কথা শুনতে পেয়েছিল।

মা বলছে: তুমি কি আর সে মানুষ আছ—ব্যবসা ব্যবসা করে সব ভুলেছ। একটা বেলাও থাক কি থাক না—তোমার আর কি। রাগ, মেজাজ এই হয়েছে সম্বল।

বাবা বলছেন: কিন্তু শুধু শুধুই কি অমন করি বড় বউ? কত যে কষ্ট করি সে তোমরা কি বুঝবে? দিনরাত খাটি বলেই এই প্রতিযোগিতার বাজারে দুটো খেয়ে সুখে আছ তোমরা।

: সুখ! দুটো খেতে পরতে পেয়ে সুখী হওয়া দাসী-বাঁদীই তো আমরা। তুমি কি বুঝবে······থাক্।

তীব্র ঝাঁঝ মেশান গলায় বাবা বলেন : না, বড় দুঃখ তোমার! কিন্তু আমার কথা ভেবে দেখেছ কখনও? ভাই বলেন তিনি ব্যবসা করবেন না, ছেলে গেলেন শহরে—সেখানে গিয়ে জেল খাটছেন স্বদেশী করে—সে খবর রাখ ?

: জানি,—স্থির গলায় মমতা বলেন।

: জান তো বোঝ না কেন ? ব্যবসা করতে নেমে কি বিপদ ঘাড়ে নিয়েছি জান ?.......যন্ত্রণা কি আমারই কম!

না! যন্ত্রণা কারুর কম না। বাবার ন', মা'র না। ছবির আশেপাশের মানুষগুলোর, চেনা-জানা কারুর যন্ত্রণা কম নয়। বাবা মা'র মতোই, বলতে না-পারা—হয়তো বুঝতে না পারাও। কিন্তু তা সবায়ের।

মা আর কাকীমা মৃদুস্বরে কথা বলছিলেন ভাত মাখতে মাখতে। ছবিকে দেখে মমতা ডাকেন : আয় ছবি। খাবি নাকি আমাদের সঙ্গে দুটো।

ছবির যেন অনেকদিন আগের দিনগুলোয় আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে—মা'র সঙ্গে পাঠশালা থেকে এসে দুপুরে একসঙ্গে খাবার স্মৃতিটা মনে পড়ে যায়। সে ধপ করে বসে মায়ের পাশে, হেসে হাঁ করে : তুমি খাইয়ে দাও।

কাকীমা ভাতের গ্রাসটা গিলে ফেলে একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলে : যাক বাবা, এতদিন পরে মেয়ের মুখে হাসি দেখলাম। এখনকার মেয়েরা সব বদলে যাচ্ছে।···আমাদের সময়—!

: দিনরাত বুঝি হাসতেই কেবল ?

: তা জানিনে, কিন্তু তোরা!—কেমন অন্যমনস্ক হয়ে কাকীমা ঘাড় নাড়তে থাকেন : তোরা তাই বলে অমন হয়ে যাবি কেন? সেজুটা দিনরাত বিরক্ত' হয়ে থাকে, তুই দিনরাত চুপ করে থাকিস। কি অত ভাবিস রে?···কি জানি, আমরা হয়তো বুঝিনে।

কে জানে কি ভাবে ছবি। কিন্তু মাকড়শার জালবোনার মতো দিনরাত কোনো একটা সঞ্চরমান জিনিস তার মাথার মধ্যে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। সেটা যদি দুঃখ হয় ছবি তবে অসুখী, সেটা যদি ভাবনা হয় ছবির তাই সহচর। কিন্তু সে কথা কাকীমাকে এখুনি বোঝান যাবে না—ছবির ক্ষমতা নেই।

হঠাৎ নাকী স্বরে উঠোনের ওপর থেকে কার যেন ডাক ভেসে ভেসে এল একবার—মাঁ। সেই ডাকটাই একেবারে দরজার কাছে এসে ছায়া ফেলেছে।

সেদিকে তাকিয়ে কাকীমা বলেন: ওই দেখুন, মেয়েটা আজ আবার আরও গোটা দুইকে সঙ্গে করে এনেছে। বোস্, বোস্ ওখানে।

তাকিয়ে ছবি যেন সাপ দেখার মতো চমকে ওঠে—একি! একি! মানুষ নয় নাকি ওরা! ও কারা শীর্ণ কঙ্কালের মতো হাত বাড়িয়ে কাকীমার দেওয়া ভাত আর ফেন নিচ্ছে? দু'চোখের জলজলে দৃষ্টি ঠিকরে পড়ছে!

হাতের গ্রাস পাতে আছড়ে ফেলে ছবি উঠে আসে। কাকীমা ফিস্ ফিস্ করে বলছেন: যা, পালা সব পেছন দরজা দিয়ে। কেউ দেখলে দেখবি মজা!

ছবির ব্যকুল মুখের দিকে তাকিয়ে মমতা বলেন: এখনও মান-লজ্জার ভয়ে চাষী-গেরস্থরা কেউ ভিক্ষেয় বেরুতে পারছে না কিন্তু একেবারে যাদের কিছু নেই........। পশ্চিমপাড়ার পাঁচু পালের ছেলে-মেয়ে ওরা, স্বামী-স্ত্রীতে ছেলে-মেয়ে দু'টোকে যে কদিন পেরেছে খুদ-সেদ্ধ, শেষ চাল কটা সেদ্ধ করে খাইয়ে নিজেরা বুঝি কদিন কেবল কাঁচা কুমড়ো সেদ্ধ খেয়েছিল। গেল তো দুটোই একসঙ্গে।...এখন ছেলে-মেয়েগুলো ভিক্ষে করছে।

ক্ষুধার এমন প্রেতমূর্তি ছবি দেখেনি কখনও। পনের-ষোল বছরের মেয়েটা—ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ান শরীরে কঙ্কালের মতো হাত বাড়িয়ে ফেন খাচ্ছে—যেন তা পাঁচু পালের মেয়েটা নয়, ছবি নিজে।

কাকীমা কি যেন বলছেন! কি বলছেন কাকীমা বিড় বিড় করে: সুরু হয়ে গেছে!

সেই সুরটা আজকাল সানুনাসিক স্বরে যখন তখন চেঁচায়—চাড্ডি দেও গো, ফেন দেও মা।

রায়দাদুদের উঠোনে আজ একদল ভিড় করেছে। ওদের হিন্দুস্থানী

চাকরটা চেঁচাচ্ছে, লাঠি তুলে ভয় দেখাচ্ছে তবু যাবে না—ওদের রাঁধুনি ঠাকুর এক গামলা ফেন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে ওদের দৃষ্টি।

কয়েকজনকে দিতে গিয়ে সেটুকুও ফুরিয়ে গেছে—গামলা উল্টে দেখিয়ে ঠাকুর হাসতে সুরু করলেও ওরা সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। দুটো মেয়ে কাড়াকাড়ি করছে একটা মাটির পাত্র নিয়ে। একজন আর একজনের গায়ে ঢিল ছুঁড়ছে, আঁচড়ে কামড়ে একে অন্যের কাপড় ছিঁড়ে দিচ্ছে, রুক্ষ চুলের গোছা টেনে ধরেছে। চাকরটা লাঠি হাতে মারতে এলে দুজনেই কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। একজন আর একজনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে হা হা করে কেঁদে ওঠে: ও-যে আমার মেয়ে! আমারে মার তোমরা, মার!

ভাঙা পাত্র দুটোর দিকে তাকিয়ে মা মেয়ের চোখের জল মুছিয়ে দিল। চলে গেল হাত ধরে।

উদ্গত চোখের জল গোপন করে ছবি সরে আসে জানলা ছেড়ে কিন্তু তার পড়া হয় না, ভাবা হয় না। দু'কান ভরে কেবল ঝমঝম করে বাজতে থাকে সানুনাসিক স্বরগুলো।

অধীরকার অসুখ আজ কদিন খুব বেড়েছে, সেখানে ঢোকা বারণ। আর কারুর বারণ হলে ছবি তা মানতো না কিন্তু বারণটা অসুস্থ মানুষটার নিজেরই। দরজার বাইরে তাকে দেখেই হাত নেড়ে অধীর আসতে বারণ করেছে।

অরুণকা', ধীরেনকা', প্রসন্নদের কাছে গেলে হয় কিন্তু কোথায় ওদের পাওয়া যায়? সেও তো গ্রাম পেরিয়ে, সবায়ের চোখের সামনে দিয়ে জানতে যাওয়া। সে অধিকার তো তার নেই। কিন্তু তার যে জানতে হবেই। কি করছে কাকারা! বড় যে বলেছিল, একটা লোককেও মরতে দেবে না, গ্রাম ছাড়তে দেবে না! সব কি বাজে কথা—আসলে মানুষ মরবে মানুষের হাতে তৈরী করা বিপর্যয়ে!

একটা কিছু তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, বুঝে মনটাকে শান্ত করতে হবে। নইলে মানুষগুলো সব এমন করে বেড়াবে!

কখন দিশেহারার মতো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে ছবি। কাকীমা কেবল একবার পেছন থেকে ডেকেছিলেন: ও ছবি, কোথায় যাচ্ছিস—ছবি, দাদু দেখতে পেলে কিন্তু বকুনি খাবি।

সে সেকথায় কান দেয়নি। আমবাগানের পথ ধরে পুকুরের পাড়ের ওপর এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। চোখ মেললেই তো দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। মাঠ—রুক্ষ, ধূ ধূ করা! প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে যেন হাঁ করে আছে। আর তার বুকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষ। ঘুরছে, ফিরছে, একবার মাথা নিচু করছে, আবার তুলছে মাথা—কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা! বুঝি যন্ত্রণায় ফেটে যাওয়া মাটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, জননী ধরিত্রীর পায়ে মাথা কুটছে, চোখের জলে অভিষিক্ত করছে? পরমুহূর্তেই মনে পড়ে গেল শালুক খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা, জলের ধারে ধারে কলমী শাক তুলছে, গুগলি-কাঁকড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে।

খোলা মাঠের বাতাস এসে ছবির চুল এলো-মেলো করে দিচ্ছে। নেমে এসে সে ঘাটে পাতা কাঠখানার ওপর পা ডুবিয়ে অনেক দূর দূর গ্রামগুলোর অস্পষ্ট হয়ে আসা গাছ-পালাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে, প্রেতকঙ্কাল মানুষগুলোর দিকে—আর কতদিন আগের একটা ছবি ভেসে উঠতে থাকে চোখের সামনে। একটা মেয়ে ফ্লানেলের ছেঁড়া ফ্রক বাতাসে উড়িয়ে, রুক্ষ চুল দুলিয়ে ছুটেছিল একদিন শিশুমনের ক্ষোভ নিয়ে। আটবছর পরে আজ যেন আবার সে অনুভব করতে পারছে সেই মুহূর্তগুলোকে। চোখ বুঁজে সেও যেন অনুভব করতে পারছে একটা ধাবমান জীবনকে। সে ছুটেছে প্রশ্নের পেছনে—জীবনের সঙ্গে সঙ্গে। কে সে! সে কে? বুকের মধ্যে থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কে যেন বলে উঠছে ও কথা—ওমনি চমকে উঠে চোখ খুলে তাকায় ছবি। ঘাটের ধারে পাতা যে কাঠখানায় সে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, জলের গতির সঙ্গে মনে হচ্ছিল কাঠখানার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা তার পা দুখানাও বুঝি ওমনি অস্থির হয়ে ছুটছে। কেন যে এমন হয়!

হঠাৎ সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে গিয়ে ছবি অবাক্ হয়ে দেখতে থাকে অজস্র মানুষের এগিয়ে আসা লাইনটাকে! মৃদু একটা গুঞ্জন উঠছে মানুষগুলোর মধ্যে থেকে। ওদের মধ্যে থেকেই একজন তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে সামনে দাঁড়ায় তার—তমাল!

: ছবি তুমি? এখানে একা দাঁড়িয়ে আছ, বকুনি খাবে না?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ছবি জানতে চায়: কোথায় যাচ্ছে ওরা—অত মানুষ!

: ওরা রিলিফ কিচেনের দাবি নিয়ে চলেছে এস্, ডি. ও-র কাছে। সামনে যে ভীষণ বর্ষা, একটা কিছু তো করতে হবে।

: শুধু তাইতে বাঁচবে মানুষ ?

বিমর্ষ মুখে তমাল হাসে: আপাতত তো বাঁচুক, তার মধ্যে দিয়ে অনেক কাজ করান যাবে। গঞ্জে ব্যবসায়ীদের ঘরে মজুত করা ধান-চাল আছে—আইন করে সেগুলোকে আদায় করা না যায় অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

ছবির ঠোঁট কাঁপতে থাকে: কিন্তু এ কি সহ্য করা যায়, তমালদা ? আমি ওদের ভিক্ষে চাওয়ার কান্না একেবারে সইতে পারিনে।

তমাল বলে: সমিতির কৃষকরা মরে গেলেও ভিক্ষেয় বেরুবে না।—ও যাদের দেখছ তারা অন্য গাঁয়ের, সমিতির বাইরের। চেষ্টা আমরাও করছি কিন্তু এরই মধ্যে পূবপাড়ার গোপাল মাঝি, নটবর, দিনু গলায় দড়ি দিয়েছে ভিক্ষে করার লজ্জায়। মিছিল করতেও চায়নি প্রথমে, বলে, যদি না শোনে। বলে, ভিক্ষের খাওয়া খেতে পারব না। মেয়েদের বিপদ—কাপড় নেই, ঘর থেকে বেরুতে পারে না। অথচ গঞ্জে দেখ গে চোরাই ব্যবসা কেমন ফেঁপে উঠেছে। রায়কর্ত্তারা পর্যন্ত জমিদারী ছেড়ে চালের ব্যবসা ধরেছে—কাপড়ের, ওষুধের—যে সব জিনিস ছাড়া মানুষের চলে না।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও তমাল আবার থমকে দাঁড়ায়: অধীরদাকে খবরটা দিতে যাচ্ছিলাম, ভালই হোল। আমি এদের সঙ্গে যাচ্ছি, ছবি তুমি একটু খবরটা দিয়ে দেবে—বলবে যে মোটামুটি সব লোককেই আমরা বের করেছি মিছিলে। বলবে একটু ?

ছবি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েও চুপ করে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়া দলটাকে দেখতে থাকে। তাকে কেউ ডাকেনি যাবার জন্যে—কেবল খবরটা পৌঁছে দেবার কাজ তার।

মাথার ওপর দিয়ে শব্দ করে উড়ে যাচ্ছে অনেকগুলো এরোপ্লেন। অন্যমনস্কের মতো একবার চোখ তুলে তাকায় সে কিন্তু অন্যদিনের মতো গোনে না। অনেকগুলো—কি হবে গুনে ?

মাথার ওপর শব্দ করে এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে, আর নিচে নিরুদ্ধ যন্ত্রণার একটা চাপা শ্বাস উঠছে এদিক থেকে—ওদিক থেকে। যে মানুষগুলো

এইমাত্র চলে গেল দাবি জানাতে তাদের পদচিহ্ন থেকে, চাপা ঠোঁটের নিচে থেকে, বুকের মধ্যে থেকে।

কি যে মনে হয় কে জানে! বাড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়েও ছবি হঠাৎ ফিরে দাঁড়ায়—সামনে চোখ রেখে হেঁটে চলে, ছোটবেলার মতো দৌড়তে পারে না কিন্তু পারলে ভালই হোত।

রায়কত্তাদের বৈঠকখানার ওপর দিয়েই চলে গেছে অতবড় মিছিলটা, কাজেই সেটা ছোটখাট ব্যাপার নয় যে চোখে পড়বে না। ঘোমটা-টানা বউদের পাশে পাশে নিজেকে লুকিয়ে গেলে হবে কি—ছবিকে দেখতে কারুর ভুল হয়নি।

তবু কথাটা যেন বিশ্বাস করা যায় না। সারা বাড়ি তোলপাড় করে দক্ষিণারঞ্জন ঘুরপাক খেতে থাকেন। কুলদা অবিশ্রান্ত পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন উঠোনের ওপর—তাঁর আজ গঞ্জে যাওয়া বন্ধ হয়েছে ছবির জন্যে।

পূর্ণশশী নিজের মনে বক বক করে চলেছেন: কত বলি, বউমা, মেয়েকে ঘর-সংসারের কাজে লাগাও। না! মেয়ে পড়বে, জেদ ধরেছে! মেয়েমানুষের আবার জেদ কি? হাঁড়ি-হাতা ধরলেই কোথায় যাবে লেখাপড়া—কোথায় থাকবে জেদ!

কুলদা একখানা সরু কঞ্চি হাতে করে সামনে বসে আছেন কিন্তু ছবি যখন ফিরে আসে তখন বেলা দুপুর। তার মুখে ক্লান্তির ছাপ, মুখের দু'পাশে একরাশ রুক্ষ-চুল উড়ে বেড়াচ্ছে, পা ভরা ধুলো কিন্তু দু'চোখ উজ্জ্বল।

ওদের সঙ্গে সেও যখন চেঁচাতে চেঁচাতে গিয়েছিল তখন পাড়ার মানুষদের অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতে দেখে, মেয়েদের ফিস্ ফিস্ করতে দেখেও কিছু মনে পড়েনি তার।

কিন্তু এখন ঠিক দুপুরবেলায় তার জন্যে অসহ্য রাগ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকা অস্নাত, অভুক্ত বাবা, ঠাকুর্দার দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে হঠাৎ হাতুড়ির ঘা পড়ার মতো মনে হয়—কিছু একটা অদ্ভুত কাজ বুঝি সে করে ফেলেছে।

কুলদা গর্জন করে কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে কেবল হাতের কঞ্চিখানাকেই সজোরে আছড়ে ফেলেন উঠোনে। দক্ষিণা ব্যঙ্গের হাসি হাসতে থাকেন, পূর্ণশশী অবাক হয়ে ছবির খুশি খুশি মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

মমতা এতক্ষণ দরজার আড়ালে অপেক্ষা করছিলেন মেয়ের শাস্তিটা দেখবার আশায়। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে হিড় হিড় করে টেনে ছবিকে সুখদার ঘরের মধ্যে টেনে আনেন : কি ভেবেছিস তুই বল ?—

মা কাঁদছে !

মেয়ে তাকায় মায়ের মুখের দিকে। এ মুখের সঙ্গে সেই সাত-আট বছর আগের দেখা মুখের খুব মিল, একটু শীর্ণ হয়েছে, একটু কুঁচকে গেছে কিন্তু যন্ত্রণার ছাপটা তেমনি আছে। তখনও মমতা তাকে মারতেন, বকতেন আর নিজেই কেঁদে ফেলতেন।

চোখের জল মুছে ফেলে মমতা বলতে থাকেন : তোর পড়ার জন্যে কম কথা শুনতে হয় আমাকে ? তবু যা হোক পড়াটাকে মেনে নিয়েছে সবাই, এখন আবার এসব কি ? কি বলে তুই অতবড় মেয়ে চাষা-ভূষোদের সঙ্গে ছুটলি ? শুনলাম প্রসন্ন, ধীরেন—আরও নাকি ছেলেরা সব ছিল। কি ভেবেছিস তুই ? আমি যে স্বপ্নেও একথা ভাবতে পারিনি ছবি, এত সাহস তোর হবে।

: থাকতে পারলাম না মা !—অনেক চেষ্টায় ছবি এটুকুর বেশি বলতে পারে না।

মমতা তার কথায় কানও দেন না, বলে চলেন : এই করে করে অধীর প্রাণটা শেষ করেছে। ছেলে কোথায় লড়াই না কি করে জেল খাটছে। না হয় মানলাম তারা ছেলে—বাধা দিলে মানে না। কিন্তু তুই! .. .... ভেবেছিলাম পাসটা করলে তোর খুব ভাল বিয়ে দেব ছবি···আমার জীবনে যে ইচ্ছে পূর্ণ হোল না, তোর হবে। সব মিথ্যে করে দিবি ?

কি ইচ্ছে মা'র জীবনে ? কে জানে মিথ্যে হবে কিনা। ছবি ব্যথিত মুখে চুপ করে থাকে, মমতাও আবার কি বলতে গিয়ে থমকে থেমে গিয়ে বাইরে আসেন।

কার কান্না বোঝা যায় বাইরে এসে—লতু পিসির আর অধীরকার মা নতুন দিদিমা।

এ বাড়ির আর ও বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে শান্ত, কম কথা বলা মানুষটা আজ সবচেয়ে সরব হয়ে উঠেছে।

কি হয়েছে? কি?

অজস্র কান্নায় ভেঙে পড়ে কথা বলতে পারছেন না নতুন দিদিমা। ঠক্ ঠক্ করে রোয়াকে মাথা কুটছেন। কি হয়েছে কি! ও কাকীমা—মমতা দু'হাতে জোরে নাড়া দিতে থাকেন।

: লতু! লতু!

: কি? কি হয়েছে তার?

নতুন দিদিমা কেবল হাত দিয়ে খিড়কির পুকুরের দিকটা দেখিয়ে দিতে ছবি আর সেফু ছোটে সেদিকে।

খিড়কি পুকুরের উত্তর দিকে নতুন দিদিমাদের একটা ঢেঁকি ঘর আছে। তার উঁচু বাঁশের সঙ্গে দড়ি বেঁধে একটা কোণে লতু পিসি ঝুলছে।

সেই পরিচিত দৃশ্য! সভয়ে চোখ বুঁজে ছবি থরথর করে কাঁপে।

হায়রে কপাল! আজ কি সকাল থেকে কেউ আসেনি এদিকটায়—কেউ দেখতে পায়নি আগে-ভাগে। তাহলেও হয়তো বাঁচানো যেত মেয়েটাকে।

কিন্তু কি হবে বাঁচিয়ে? একটা বোকা, কালো-কুচ্ছিত মেয়ে! বুদ্ধি কম বলে যাকে শ্বশুর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে নতুন দিদিমাই বা কত আর রেখে ঢেকে চলতে পারেন! যখন জীবনটা তাঁরও যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে—মৃত্যুপথযাত্রী ছেলেটাকে সময়মত একটু পথ্য দিতে না পেরে। যখন বুড়ো স্বামী কাঁপতে কাঁপতে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছেন—তখন মেয়েটাকে বিষের মতো লাগে। অত বড় মেয়ে খিদে পেলে কাঁদে, তাঁর ছেলের চিরকালের শত্রু ওই রায়কত্তার বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে আসে পেটের জ্বালায়।

নতুন দিদিমা তাই ওকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন: মর মর, গলায় দড়ি দিয়ে মর।

মরেছে মরেছে, কিন্তু চুপ! চুপ! এযে কলঙ্ক!

অর্ধমূর্ছিত নতুন দিদিমাকে ধরাধরি করে ঘরে তুলে দিয়ে আসা হয়। কাঁদবে কিন্তু আস্তে!

থানা-পুলিশ হবেই কিন্তু তাকে গড়াতে দেওয়া হবে না বেশিদূর।

আজ বাবা, দাদু, হরিদাদু সবাই এক জায়গায়—একসঙ্গে পরামর্শ করছেন। এ সময় দূরে দূরে থাকলে চলে না।

বারান্দায় খেতে দেওয়া হয়েছে তিনজনকেই। হরিদাদুর হাত কাঁপছে থরথর করে—ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে পারছেন না। বাবা আর দাদু খুব গম্ভীর। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ। এখন ছবির ব্যাপারটা ভুলে গেছে সবাই।

কেবল নতুন দিদিমার চাপা-চাপা কান্নার একটা রেশ থেকে থেকে ভেসে আসছে।

এ বাড়ির একটা মেয়ে মরেছে। হাবা, বোকা, কালো-কুচ্ছিত শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া একটা মেয়ে!

তার অন্য কোন অনুভূতি ছিল না কিন্তু একটা কিছু ছিল—ক্ষুধা! সে জ্বালায় জ্বলে যাওয়া মানুষগুলোর পেছনেই তো আজ ছুটেছিল ছবিও।



সাতাশ

শুরুতে যাকে ছেলেমানুষী বলে উপেক্ষা করা গিয়েছিল—একটু বকুনি, দু'একবার গর্জন আর খানিকটা ভয় দেখানর পরই যে ইচ্ছেটা চলে যাবার কথা, সেটাই এখন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সে প্রসন্ন, ধীরেনদের সঙ্গে দু'একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে চলে যায়।

যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেছে কিংবা না খেয়ে মরেছে তাদের হাঁ-করা খালি বাড়িগুলো দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। বলে : ছাই সমিতি আপনাদের, ধীরেনদা। চলে যাওয়া ঠেকাতে পারেননি!

যেখানে অনেকগুলো মাথা গোল হয়ে বসে, মানুষ জমে, সেখানেই ঠেলে-ঠুলে জায়গা করে নিয়ে ছবিও হাঁ করে শোনে।

চেঁচামেচি, হৈ-চৈ করেন দক্ষিণারঞ্জন। ছবির সম্পর্কে নিত্যনতুন এক একটা খবর জোগাড় হয়ে তাঁর কানে আসছে কিন্তু কি করা যায় কেউ ভেবে পায় না।

সরস্বতীর বড় ভয় সবাইকে। সে ফিস্‌ফিস্ করে ভয়ে ভয়ে বলে : তালা দিয়ে রাখলে হয় না দিদি?

: হয়! কিন্তু রাখবে কে?

যা বলা যায় তা সব সময় করা যায় না।

ছবি! ছবি!—ছবি বাড়িতে নেই। কখন কোন্ এক ফাঁকে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে, আর হয়তো ফিরবে সন্ধ্যের অন্ধকারে।

গালাগাল দাও—ভয় দেখাও—মেয়েটা হাসতে শিখে গেছে।

এ কি সাহস! এ দুঃসাহস পেল কোথায়? ঝুলে পড়া ভুরুর নিচে এখনও চোখ জ্বলে ওঠে মাঝে মাঝে দক্ষিণারঞ্জনের! মনে পড়ে আগের দিনগুলোর কথা। বাইরে থেকে ভেতরে আসতেন তিনি, তাঁর চটির শব্দ পেয়ে মেয়ে-বৌরা যে যেখানে পারত ছুটে পালাত, ছোট ছেলেরা কান্না

থামিয়ে চুপ করে যেত। প্রৌঢ়া পূর্ণশশী পর্যন্ত ভাল করে গায়ের কাপড় আর ঘোমটা টেনে দিতেন।

সেই তিনিই তো এখনও আছেন। এখনও গর্জন করে উঠলে বাড়িশুদ্ধ সবাই ভয় পায়—কেবল কুলদার মেয়েটা।

সবাইকে শুনিয়ে বলেন: কেউ পারবে না তো, আমিই ও মেয়েকে শায়েস্তা করব।

কিন্তু শায়েস্তা করা যায় না।

ভিটে-খাকীর মাঠের পশ্চিমদিকের যে পোড়ো দালানটা এতদিন শেয়াল-খাটাশের রাজত্ব হয়ে ছিল তা সরিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করেছে ছেলেরা।

সমিতির দাবি অনুসারে রিলিফ কিচেন খুলতে একজন সরকারী কর্মচারী এসেছেন। তাঁকে ওই বাড়ির ভাল ঘরখানা ছেড়ে দিতে হবে।

প্রসন্ন বলে: ঘর দেওয়া যাবে না। আমরা দুটো ঘরে হাসপাতালের বেড পাতব, একটাতে করব স্কুল, আর একটাতে ওদের হাতের কাজ থাকবে, বাকীটাতে রান্না হবে।........সরকারী টাকা বরাদ্দ আছে—তাঁবু খাটিয়ে থাকুন গে আপনি, মস্তবড় উঠোন তো আছেই।...কিন্তু এই সব লোকজনকে আপনার ফাই-ফরমাশ খাটাবেন না কখনও।

সরকারী কর্মচারী চটে যান খুব, তিনিও বলেন: ওসব সমিতি-টমিতি বুঝিনে। আপনাদের কাজ তো লোক খেপানো—খাওয়াবেন সরকারের, উস্কাবেন আবার তার বিরুদ্ধেই।

ধীরেন, প্রসন্নর বয়স বেশি, তারা সে সব কথা শুনে রাগে না, হাসে। রাগে তমাল। তমালের বয়সী ছেলেরা। বলে: বাজে কথা বলবেন না। কাজ করতে এসেছেন করে যান। সরকারী খাওয়া খাওয়াচ্ছেন কিন্তু ধান-চাল কি সরকার ফলায়? যাদের জিনিস তাদেরই দান করে বদান্যতা! যত চোট-পাট তো এই আধমরা মানুষগুলোর ওপর—বড় বড় মজুতদারের কাছে তো জোড় হাত......।

চেঁচামেচি, হৈ-চৈ। রিলিফ কিচেন প্রায় বন্ধ হয়। সরকারী কর্মচারী

ওপরে লিখে পাঠান—এই সব কর্মীদের হাতে তিনি কাজ ছেড়ে দিতে পারবেন না।

তখনও ছুটোছুটি করতে হয় ধীরেনদেরই। গাঁয়ের গণ্য-মান্য লোকদের নিয়ে কমিটি তৈরী হয়েছে, সুখদাকে তার সভাপতি হতে হবে।

সুখদা বলেন: আমি?……হতে পারি……কাজ তো ভালোই কিন্তু আমাকে কেন?……আমি?

ছবি হাসিমুখে বলে: হ্যাঁ কাকা, তুমিই। অধীরকা তোমার কথাই বলেছে—হতেই হবে তোমাকে।

শুনে দক্ষিণা খানিক অবাক হয়ে থাকেন তারপর বিড় বিড় করেন পাগলের মতো: এবার কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে…দেখো। ঠিক বেরুবে।

সাপ বেরোয় না কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। ছবির ওপর ভার ছিল রিলিফ কিচেনটার, মায়া এসে জুটেছে কবে যেন। সেও কাজ করবে। আজকাল সে আর অধীরের ঘরে ঢুকতে পায় না, নতুন দিদিমা একদিন দেখতে পেয়ে যা-তা বলেছেন। এখানে আসে বলে বাড়িতে তার শাস্তির সীমা নেই, মামীদের মারধরও চলে কিন্তু কিছু গ্রাহ্য করে না মায়া।

ছবি জানতে চাইলে চোখের জল মুছে ফেলে হাসে: বলুক গে, মারধর কিছুই আমার গায়ে লাগে না। নতুন কাকীমা বলেছেন—বিধবার নিঃশ্বাসে নাকি অধীরদার ক্ষতি হবে…বলুক। না হয় যাব না, শুধু কেমন থাকে তুই মাঝে মাঝে জেনে এসে জানাস।

মায়াদির মুখের দিকে তাকিয়ে দুর্গার কথা মনে পড়ে যায়। দুজনেরই কষ্ট কিন্তু দুটো দু'রকমের কষ্ট। দুর্গাকে সবাই প্রশংসা করে, তার কৃচ্ছ্রসাধন, তার নিয়ম-ব্রত দেখে লোকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু ছবি তো জানে, দুর্গা কি চায়? মায়াদিকে কেউ দেখতে পারে না। অধীরকাকার সঙ্গে তার ভাবের কথা সবাই জানে, কোথাও তাই স্থান নেই মায়াদির। মামীমা তাকে দিনে তিনবার করে বাড়ি থেকে বার করে দেয়। মায়া বলে: ওই মামার জন্যে, জানিস ছবি, কোথাও যে চলে যাব তার উপায় নেই। মামা বড্ড ভালবাসে।

হয়তো লতুপিসির মতো একদিন মায়াদিও গলায় দড়ি দেবে নয়তো জলে ঝাঁপ দেবে। এর বেশি আর কি করবার আছে—কি করতে পারে?

কিন্তু ঘরে-বাইরে-মনে এত যন্ত্রণা সহ্য করেও মায়া আত্মহত্যা করে না। করে অন্য কাজ। কোমর বেঁধে অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া করে বসে একদিন।

মায়ার ওপর ভার ছিল মেয়েদের কাগজ পড়িয়ে শোনানোর—লেখাপড়া শেখানোর। সেই পড়ে শোনানো কাগজখানা হঠাৎ হাত থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে অফিসার বলে: ওসব কথা এখানে বসে বলা চলবে না। এটা সরকারের খয়রাতি খাওয়ানোর জায়গা—তার পক্ষে কথা না বলতে পারেন, বিপক্ষেও বলতে পারবেন না।

: একশোবার বলব,—মায়া রুখে উঠে বলে: দিন কাগজ। কাগজটা আগে বেআইনী হোক তারপর আপনার বারণ শুনব।

: শুধু কাগজ নয়, ওসব গান-ফানও এখানে গাওয়ানো চলবে না। ওই যে—বিদেশী সরকার ঘরে, দুয়ারে দুশমন ·····, ওই সব।

মায়া বলে: একশোবার গাইবো। বিদেশী সরকারকে কি স্বদেশী বলতে হবে নাকি?

: না বলতে পারেন, এখানে কাজ করবেন না। আপনাদের কে ডেকেছে? রিলিফ কিচেনের নামে কাগজ পড়ানো, গান শেখানো, সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানি—এই তো করেন আপনারা।

চেঁচামেচি, হৈ-হল্লা শুনে ছেলেরা এসে হাজির। ছবি আসে। ফুলমণি, বাতাসী, হরিদাসী চেঁচায় অফিসারের উদ্দেশ্যে। তিনি নাকি মাঝে-মাঝেই কেউ না থাকলে ওদের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করেন, মাঝে মাঝে ফাই-ফরমাস খাটান, অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে রসালাপ করেন।

প্রসন্ন বলে: দেখুন সরকার তো ইংরেজ কিন্তু দেশটা তো আমাদের। মনে-প্রাণে অত ইংরেজ ভক্তি শেখার কি আলাদা কলেজ আছে নাকি?

অফিসার চুপ করে থাকে।

তমাল বলে: দেখুন, এরা সাময়িকভাবে রিলিফ কিচেনে খাচ্ছে বটে কিন্তু মনে রাখবেন ওরা ভিখারী নয়। ওদের পড়ানো, বোঝানো, শেখানো সব আমরা করবই।

: এখানে মিটিং হতে পারবে না।

: তাও হবে—মায়া বলে।

অফিসারের একটা মতলব ছিল সেটা পরে বোঝা যায়। তার পরোক্ষ চাপটা রায়কর্তার ওপর কি করে কাজ করে কে জানে কিন্তু রায়কর্তার বাঁধা পুরোহিত মায়ার মামা হারাণ ভট্টাচার্যের জীবিকার উপায়টুকু বন্ধ হবার উপক্রম হয়।

মায়ার আসা বন্ধ হয়—এবার হারাণ ঠাকুর নিজে তাকে ঘরে বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছেন। প্রসঙ্গ, ধীরেনের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারীকে কাজে বাধা দেবার অভিযোগ আসে. তাদের মাঝে মাঝে থানায় হাজিরা দিতে হয়।

কেবল বাদ পড়ে যায় তমাল আর ছবি। অফিসার তমালকে বলেন : ওরা না হয় গেঁয়ো কর্মী, লেখা-পড়া জানা নেই, মাথায় আছে কেবল কতগুলো বুলি—চাষা-ভুষো নিয়ে কারবার, কিন্তু আপনি তো মশাই শিক্ষিত ছেলে, কোলকাতায় থাকেন। আপনি কেন ওদের সঙ্গে।······আর উনিও··· মিস রায়ের কথা বলছি আমি। এতবড় বংশের মেয়ে, ওঁর কি এভাবে মাঠে-ঘাটে ঘুরে-বেড়ান উচিত।

গম্ভীর হয়ে তমাল বলে : হুঁ, রায়বাবুদের বৈঠকখানার মজলিশটা তাহলে বৃথা যায়নি!

ছবির মুখে সব শুনে অধীর বলে : মায়াটা তাহলে সাহস দেখিয়েছে তো। যতটা ভীতু ভাবি তা নয়। আসলে ওর নিজের অবস্থাটা ও বুঝে নিতে শিখছে······কিন্তু ওর কি হবে বলতে পারিস, ছবি?

অধীরকাকাই যখন বলতে পারে না ছবি কি বলবে? তবে তার মনে একটা দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, মায়াদি কখনও অমন আটকে থাকবে না। যতই ওরা তালাবন্ধ করে রাখুক। যেমন ছটফট করতে করতে এসে কাজে নেমেছিল, তেমনি ছটফট করতে করতেই বেরিয়ে আসবে একদিন।

অধীর বলে : তোর তবু ভবিষ্যতের পথ খোলা আছে—কিন্তু ওর কি হবে। এইসব মেয়েদেরই জ্বালা বেশি—যন্ত্রণার উপলব্ধি আছে কিন্তু উপশম নেই। যদি পারিস ওদের জন্যে কিছু ভাবিস, ছবি।

কিন্তু ছবিরই বা কি আছে?

তার কাজের নেশা আছে, বাড়ির বাধা না-মানার একটা জেদ আছে। আর মনের মধ্যে লুকনো একটা যন্ত্রণা আছে। লেখা-পড়া সে ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে-কথা ভাববার সময় নেই।

শৈল আজকাল বানান করে নাম লিখতে শিখে কাজ ফেলে দিনরাত এখানে-ওখানে তার নাম লিখে বেড়াচ্ছে। শিশুর মতো কৌতূহলে সে নিজের লেখা নামটা দেখে আর বলে: আমি দেব দিদি সগলরে শেখায়ে-পড়ায়ে। এ-দিন যখন চলে যাবি, গেরামে ফিরে আমরা ইস্কুল খোলবো—আমি হব তার মাস্টার—কি ক ও?

বর্ষার জলে ঘেরা দ্বীপের মতো এই রিলিফ কিচেনটায় আসে বটে ওরা খেতে, বসে পাত পাতে কিন্তু সমস্ত মন ওদের পড়ে থাকে গ্রামের দিকে। হৃদপিণ্ডটা যেন উপড়ে রেখে এসেছে সেখানে—সেই ভাঙা ঘরের দাওয়ায়, তেলের অভাবে আলো না-জ্বালা অন্ধকার ঘরের কোণগুলোয়।

দুবেলার খাওয়া একবেলা সেরে যায় রিলিফ কিচেনে। ওদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও জানে বাড়ি ফিরে উনুন জ্বলবে না কারোর ঘরে। ভূতের মতো, প্রেতের মতো মানুষগুলো বসে থাকবে, নিঃশ্বাস ফেলবে, কথা বলবে। তারপর ঘরে গিয়ে এককোণে ছেড়ে রাখবে পরনের গামছা-খানা কিম্বা শতছিদ্র ধুতি। এই পরেই তো আবার বেরুতে হবে কাল—তার পরের দিন—অনেক—অনেক দিন। যতদিন না থামে এই পোড়া-কপালে যুদ্ধ। যতদিন না এই মরা শরীরগুলো নিয়ে মরতে মরতেও লাঙ্গলের আগা চেপে ধরে পুরুষেরা—জোয়ান-মদ্দ ছেলেগুলো। সেই আশা আছে বলেই এখন আর বাজরা-গমের খিচুড়ী খেতে গিয়ে কেঁদে কেউ উঠে আসে না। শক্তি সঞ্চয় করে।

একবার মেয়েদের দলের মধ্যে, একবার হাসপাতালের ঘরগুলোয়—এখানে-ওখানে-সেখানে ছটফট করে ঘুরে বেড়ায় ছবি। সবায়ের মুখের দিকে তাকায়। লাঙল-ধরা হাতে গম পিষছে জাঁতায়, মাটিতে সার দেবার বদলে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চাল করতে বসেছে ও কারা? লজ্জায় যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে জোয়ান-মদ্দ ফসল ফলানো মানুষগুলো। ওরা হাসে না, গল্প করে না। কাজ থাকলে কাজ করে নয়তো চুপচাপ বসে থাকে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

ছবিরও প্রথম প্রথম ওমনি লজ্জা হয়েছিল রিলিফের নামে। এই

নাকি কাজ! কোনও মতে প্রাণগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা! খিচুড়ী খাওয়ান, কাপড় বিলি করা—ওতো সেবাশ্রমের কাজ। তার জন্যে পড়াশোনার দরকার কেন? কেন মিটিং-মিছিল করতে হয়? ভবিষ্যতের কোন্ আশা রাখা যায় সামনে?

ধীরেন, প্রসন্নদের একটা সম্মিলিত চেষ্টা ছিল ছবিকে বোঝানোর। প্রশ্নের উত্তর না পেলে, ভালো করে কিছু না বুঝলে এই ছটফটে মেয়েটা কিছুতেই কাজে মন দিতে পারে না তা ওরা দেখেছে। নানা তুলনা-উপমার মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে প্রৌঢ় প্রসন্ন, গ্রামে সারাজীবন কাটানো সাদাসিদে সরল চেহারার মানুষটা এমন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে হেসেছে যে ছবির তখন বোঝার অস্থিরতাটা বেড়ে গিয়ে চোখে জল:এসে গেছে। যদি ভাল করে বোঝাই না হোল, যদি জানতেই না পারল ভবিষ্যতের কোন্ প্রেরণা তাকে বাড়ির বাধা, বংশের বাধা ভেঙে টেনে বার করেছে—তবে কি হবে এসব করে! থাক পড়ে এসব। এখুনি সে মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটে পালাবে। খিধের জ্বালায় হতাশ্বাস মানুষগুলোর যন্ত্রণা তাকে না হয় একটু ব্যথিত করবে কিন্তু তার বেশি হবে কেন?

প্রসন্ন, ধীরেনদের কথার চেয়েও বেশি কাজ হয়েছে তমালের অভিজ্ঞতায়। বিয়াল্লিশের প্রাণ দেওয়া-নেওয়া এখনও তার চোখের সামনে টাটকা হয়ে আছে। বলতে গিয়ে এখনও তার চোখ জ্বলে, সে বোঝালে ছবি অনেকখানি জোর পায়।

জোর পেয়েছে প্রদীপের চিঠিতেও। জেল থেকে অধীরের কাছে লেখা চিঠি—তাতে নতুন উপলব্ধির কথা আছে।

আজকাল তাই আর শক্ত হয়ে থাকে না, রান্নাঘরে কাঁচা কাঠের বোঝা সে উপুড় হয়ে ফুঁ দিয়ে জ্বালানোর চেষ্টা করে। সকাল থেকে সারাদিনে মানুষগুলোর বরাদ্দ একবার খাওয়ার এই চাল-ডাল আর বাজরা-গম মেশানো খিচুড়ি—তাও দিতে দেরি হচ্ছে। বাইরে ওরা পাতা পেতে বসে আছে।

পেছন থেকে তমাল তাকে সরিয়ে দেয়, বলে: খিচুড়ি খাইয়ে বাঁচিয়ে কি হবে বলে তো খুব চেঁচামেচি করে বেড়ালে কদিন। এখন আবার উনুনের ধারে কেন? চোখ দিয়ে কেমন জল গড়াচ্ছে দেখ। সর শিগ্‌গির।

অরুণ বলে : সত্যি ছবি, রাত্তিরে ঘুমোতে পারিনিনে শেষে। চোখে এমন বিঁধবে সূচের মতো।

সেকি নতুন নাকি? পর পর কয়েক রাত তো সত্যিই ঘুমোতে পারে না ছবি চোখের জ্বালায়। সে কথা আবার বলাও যায় না কাউকে। ঘুরে ঘুরে, খেটে খেটে, তার চেহারাও হয়েছে এক দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের মতো।

খাবার পাবার আশায় যে কলরব উঠেছিল, খেতে পেয়ে মানুষগুলো হঠাৎ থেমে যায়, নিস্তব্ধ হয়ে থাকে সমস্ত উঠোনটা।

ছবি বলে : ওকি—তুমি খাচ্ছ না যে তারক?

হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে মাঝবয়সী তারক মণ্ডল, তারপর ছুট দেয়। ঘাটে বাঁধা কার না কার ডিঙি নৌকো খুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অশ্লীল গালাগালি দিতে দিতে।

কে যেন বলে : ওর মাথাডা খারাপ হয়ে গেছে। জোয়ান নাতিটার মরার শোক ভুলতি পারে নাই, কয়দিন আগে ম্যায়েডারেও কেডা বুঝি টাকার লোভ দেখায়ে শহরে নিয়ে গেছে।

তারপর আর কেউ কোন কথা বলে না, নিস্তব্ধ হয়ে যায়—গামছায় চোখ মোছে।

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেও একটা অঘটন ঘটে যায়।

সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে আজ দক্ষিণারঞ্জন নিজে চলে এসেছেন ছবিকে নিয়ে যেতে। রায়কত্তার চাকর মাণিক নৌকো বেয়ে এনেছে তাঁকে—রায়কত্তার অনুমতি নিয়ে।

একখানা লিকলিকে বেত হাতে ছিল, কিন্তু শান্ত গলায় বলেন : চল, বাড়ি চল। ছোট-লোকগুলোকে নিয়ে মাতামাতি তো অনেক করলে—আর না। গ্রামের কোন্ ভদ্দরলোকের মেয়েটা আসে এখানে যে তুমি এসেছ?

ছবি বলে : কেউ আসে না বলে যে আমিও আসবো না—তার তো মানে নেই।

: মেয়েমানুষের এ সব করতে নেই। তাছাড়া পরিবারের সম্মান আছে, আমাদের বংশে এ সব কখনও হয়নি, ওসব শহরে চলে।

: শহরে থেকে তো লেখা-পড়া শিখেছি, তাও তো আপনি করতে দেবেন না।

দক্ষিণা ভেবেছিলেন মিষ্টি কথা বলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, সহজে রাগতে তিনি চাননি। বলেছিলেন ছবিকে একপাশে ডাকিয়ে এনে—কথাও হচ্ছিল চাপা চাপা গলায়। কিন্তু আর ধৈর্য থাকে না তাঁর, উষ্ণ গলায় বলেন : মেয়েমানুষের কাজ ঘর-সংসার করা, বিদুষী হওয়াও নয়, স্বদেশী করাও নয়। তোমার জন্যে গ্রামে কত অখ্যাতি রটেছে আমাদের জানো ? তোমার বাবার ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে তা জানো ?

জানে ছবি সবই—সে চুপ করে থাকে।

দক্ষিণা বলেন : কি যাবে না ?

হঠাৎ কি মনে হয়, ছবি বলে : যাব না। এখনও অনেক কাজ আছে আমার।

এবার রাগে দিশেহারা হতে হয়, বেতখানা উঁচিয়ে বারকয়েক বাতাসে নাচান দক্ষিণা. মান-সম্মানের কথা তুমি যখন ভুলেছো তখন······।

মারবেন নাকি ছবিকে ? কাঠের পুতুলের মতো শক্ত আর আড়ষ্ট হয়ে থাকে ছবি—তার মাথা টলছে, পা কাঁপছে। এতগুলো লোকের সামনে······!

হঠাৎ সেই আন্দোলিত বেতখানাকে কেড়ে নেয় পেছন থেকে শশী মাঝি : রাখেন বুড়ো কত্তা, ও কামডা আমাগারে সামনে আর করতি দেব না। বরং আমারে তুই ঘা জুতোর বাড়ি মারেন....ওতে লজ্জা নেই।

তার কথাগুলো বিনীত কিন্তু দক্ষিণার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে অপমানে। মনে পড়ে যায়—কয়েক বছর আগে এই শশীকেই তিনি বিনাকারণে বিদ্যাসাগরী চটি দিয়ে মেরেছিলেন। সেদিনও এমনি একটা ভিড় ছিল—সেদিনও ওই মেয়েটা সেখানে ছিল।

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে তিনি নৌকোয় গিয়ে বসেন। মাণিককেও যেতে হয় কিন্তু যাবার আগে সে দাঁত বার করে হাসে, বলে : বেশ করিছ শশী। যায়ে না দিদিঠাইরেন। বললিই যাতি হবি ? সগ্‌গলেই কি মাণিক নাকি ?

রান্নাঘরে দাউ দাউ করে উনুন জ্বলছে, তাকানো যায় না। তবু তার মধ্যেই একসময় মৃদু ভর্ৎসনা করে তমাল বলে: কেন গেলে না ছবি? এমন করে বারে বারে কত সহ্য করবে?

ছবি অবাক হয়ে তাকায়। তার মুখে চিন্তা আছে কিন্তু অপমানের গ্লানি নেই, বলে: একেবারে নতুন কথা শোনাচ্ছেন তমালদা! এইটুকুতেই ভয় পেয়ে যাব? বিশ্বাসের জন্যে লোকে প্রাণ দেয় না?

তমাল বলে: আমি তোমাকে আসলে পরীক্ষা করছিলাম ছবি। তাতে দেখছি ফুলমার্ক কিন্তু..., হঠাৎ কি হয়, তমাল ছবির হাত ধরে: একটা কথা রাখবে ছবি? পড়াশোনাটাও কর, বছরটা নষ্ট কোরো না?

হেসে ফেলে সে বলে: আমার জন্যে বড্ড আপনার মাথা-ব্যথা তমালদা। কেন বলুন তো?

আগুনের তাপে কালো মুখ লাল দেখাচ্ছিল, আবার কালো হয়ে যায়। তমাল মাথা নিচু করে থাকে একটুখানি সময়। দুটো উনুনের একটা হঠাৎ নিভে গেছে, সেটা ধরাতে যাবার আগে তমাল গভীর স্বরে ডাকে: ছবি!

মাথা তুলে তাকাতেই দুজনের দৃষ্টি মিলে যায়। তার মুখ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বলে: একদিন বুঝবে তুমিই। সেদিন আর ও কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হবে না—বুঝেছ?

বুঝবে ছবি! কেন ও কথা বলল তমাল? ছবি কিছু বুঝতে চায় না, কিছু শুনতে চায় না!

সে লুকিয়ে থাকবে, পালিয়ে থাকবে—তবু বুঝে তার দরকার নেই। কেন এমন হোল তার? কেন?

দক্ষিণারঞ্জন সেদিন তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি, সেজন্যে বাড়িতে কেউ তাকে একটা কথা বলল না, এত বড় অসম্ভব ব্যাপারটাও যেন আর ভেবে দেখবার ক্ষমতা নেই তার।

দিনরাত সেই কথাটা তাকে ভাবাচ্ছে, বুঝবে ছবি!

ছবি কি বোঝেনি তা? তাহলে সে মাঝে মাঝে ফিস্ ফিস্ করে কেন

নিজের মনেই : আর ভাববো না আমি, আর যাবো না। চলে যাক…… তারপর।

কিন্তু তা হয় না। না গেলে ভাল লাগে না, না দেখলে ভাল লাগে না—এ ছবির কি হোল ? মাঝে মাঝে মনের যন্ত্রণায় সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। মাঝে মাঝে মাথা নাড়ে, নিজের মনের সঙ্গে কথা বলে, এ সব কথা ভাবতে নেই ছিঃ! যা অসম্ভব তাকে ভাবতে নেই—। এ যে লজ্জা—মনে মনে ভাবাও লজ্জা!

কি রকম লজ্জা! শহরে থাকতে বন্ধু মিনু যখন বলেছিল : তোরা হিন্দু তাই, নইলে আমার দাদার সঙ্গে তোর বেশ বিয়ে হোত…, অতটুকু মেয়ে সে, সেদিনও লজ্জা পেয়েছিল।

এ কি সেই লজ্জা ?

লজ্জা নয়—কষ্ট। একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে মারছে—মুখের দিকে সহজ করে না তাকাতে পারার, গলার স্বর শুনে চমকে ওঠার কষ্ট।

কেন যে এমন হোল তার ?

বুঝেছে ছবি! সেই বোঝাটা তার চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ওপাশের বিছানায় মমতা ঘুমোচ্ছেন পাশ ফিরে, জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বিছানায়। শ্রাবণ পূর্ণিমা বুঝি আজ! চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেলে জলের মধ্যে ডুবে যাওয়া দ্বীপের মতো গ্রামটা জেগে থাকে তার শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ নিয়ে।

এর আগেও ঘুম ভেঙে বিছানায় জেগে বসে থেকেছে সে কতদিন—কান পেতে শুনেছে জলের ওপর দিয়ে নৌকো বেয়ে যাবার ছপ্ ছপ্ শব্দ, নয়তো অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কোনো নৌকোর মাঝির ভাটিয়ালি সুর। বাইরে রাতজাগা পাখি ডেকেছে,জ্যোৎস্নার আলো-কে সকাল ভেবে পাখির বাসায় ঘুম ভাঙা পাখিরাও কলরব করে উঠেছে।

শুনেছে সে। শুনতে শুনতে ভেবেছে রিলিফ কিচেনের কথা, দুর্ভিক্ষ, দেশ, তার কাজের কথা। সব মেলানো একটা চিন্তা। তাতে উদ্বেগ ছিল কিন্তু কষ্ট ছিল না। শান্তি হয়তো ছিল না কিন্তু যন্ত্রণাও তো ছিল না।

সে এ বাড়ির একটা অবাধ্য মেয়ে। তার ঘাড় বাঁকানো জেদ আছে—সে জন্যে সে সব সহ্য করতে পারে।

কিন্তু একটা কষ্ট আছে সেটা আজ তাকে কাঁদাচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল পড়ে তার বালিস ভিজে যাচ্ছে। কেন কাঁদছে সে, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা ভারী সুন্দর বাঁশীর শব্দ তাকে কষ্ট দিচ্ছে বলে ?

নিঃশব্দে দরজা খুলে ছবি ছাদে আসে। মেঘে ঢাকা জ্যোৎস্নায় সারা বাড়িটা যেন স্নান করছে। পশ্চিম দিকের ভাঙা দালানের মাথায় যে বটগাছটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এখন আস্তে আস্তে শাখা-পল্লবে বড় হয়ে উঠেছে তার মাথা দোলানি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—নারকেল পাতার শিরশিরানি শোনা যাচ্ছে, কানে আসছে নিশাচর পাখির ডাক। বাঁশীটা হঠাৎ একসময় থেমে গেছে, কারা যেন হেসে উঠলো হো হো করে। কে ? বিদ্যুতস্পৃষ্টের মতো হঠাৎ সারা শরীরটা কেঁপে ওঠে।

জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসা •বৈঠার ছপ্‌ছপ্‌ শোনা যাচ্ছে, কে যেন বলছে : বাঁশী তো শুনলে, এবার তুমি একটা গান গাও তমাল।

ছাদের কার্নিশে ভর দিয়ে ছবি কান পেতে থাকে—সারাদিনের কাজের ব্যস্ততার মধ্যে যাদের সত্যিকার স্বরূপটাকে ধরা যায় না, মনে হয় বুঝি ওরা অকরুণ, রুক্ষ-কঠোর, বুঝি গেঁয়ো-মনটা ওদের চাপা পড়ে আছে শুধু কাজের কথায়—আর কিছু নয়।

সত্যি তা নয়, জ্যোৎস্না রাতে ওরা নৌকোয় বেড়াতে বেরিয়েছে। প্রসন্নর গলা পাওয়া যাচ্ছে, ধীরেন আছে—হাসছে, কথা বলছে। আর আছে সেই ছেলেটা—যাকে ছবি ভুলে থাকতে চায়। যার কথা ভাবলে কান্না ছাড়া কোনো পথ থাকে না।

তমাল বলে : আমি তো গাইতে জানিনে অরুণদা কিন্তু কবিতা শোনাতে পারি—শুনবেন ? অন্য কিছু নয়—রবিঠাকুরের ! শুনবেন ?

: শুনবো শুনবো—অরুণ উচ্চকণ্ঠে বলে।

: দেশপ্রেমের কবিতা কিছু জান না তমাল ? তোমরা তো শহুরে ছেলে।

আঃ প্রসন্নদা—বড় ঘ্যান ঘ্যান করেন আপনি—শুনুন না, অরুণ ধমক দেয়।

কে যেন হেসে ওঠে হো হো করে : প্রসন্নদা একেবারে গেছেন—কবিতা শুনবেন তাও এমন কিছু যাতে সময় নষ্ট না হয়। অধীরদাকে দেখেছেন তো? রবিঠাকুর বলতে অজ্ঞান। যত সব গোঁয়ো নিয়ে কারবার। বল তুমি তমাল।

অরুণ বলে : নৌকোটা খালে নিয়ে যাই দাঁড়ান, ওখানে বাঁধা যাবে।

: না না, এখানেই থাকি,—তমাল বলছে। কার্নিশের ওপর ছবি মুখটা চেপে ধরে, ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে। তার উত্তপ্ত মুখ জুড়িয়ে যায়।······

: হে কুমার হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান।

ঝনন রনন.......

চলে যাচ্ছে ওরা........দাঁড়ের ছপছপ আওয়াজটা দূরে চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসা এক একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে, টুকরো টুকরো শব্দ—ভাসা-ভাসা। চিৎকার করতে ইচ্ছে করে ছবির—চিৎকার করে যদি ওদের ফেরানো যেত!

ছাদের ওপর থেকে সদর দরজাটা দেখা যাচ্ছে ছায়া ছায়া অস্পষ্ট—ওটা খুলতে কতক্ষণ লাগে? তারপর ঘাটে গিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে ছবি—শুধু দেখবে একটা নৌকোর দূর থেকে দূরে চলে যাওয়া, শুধু শুনবে একটা কাঁপা কাঁপা রবিঠাকুরের কবিতা বলা ছেলের গলা। তাতে কি কোনো দোষ হয়?

আর যদি ছেলেটা তাকে দেখতে পায়—যদি এগিয়ে এসে সে বলে, এসো ছবি, তুমিও এসো। তাহলে?

না, ছবির কিছু নেই। সে যেতে পারে না, তার মন বলে, এ অসম্ভব! অসম্ভব!

........শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি,···

আর শোনা যাচ্ছে না। জল ভরে আসা ঝাপসা চোখ নিয়ে তবু কান পেতে থাকে,

........সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

ছবি পারছে না সহ্য করতে। সে তা প্রমাণ করেছে তার চলায়-ফেরায় অবাধ্যতায়।

কিন্তু যারা সে কথা জানাতে পারছে না—তারা? তারাও কি পারছে? মায়াদি? কোন্ ঘরে মায়াদি আছে তালা-বন্ধ হয়ে ছবি তা জানে না কিন্তু এটা জানে সে মানে না এসব।

দুর্গা? সে কেন কাঁদে?

মা কেন ঝড়ের আগের থমথমে মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়? ঠাকুমার তোবড়ানো গাল বেয়ে কেন জল গড়ায়?

সবাইকে বুঝেছে ছবি। বুঝতে পেরেছে বলেই তার এত যন্ত্রণা—নিজেকে বোঝার যন্ত্রণার চেয়েও বেশি।

আর শোনা যাচ্ছে না—অনেক দূরে চলে গেছে ওরা, ছবির শ্রবণের বাইরে। এমনি করে চলেও যাবে ছেলেটা, ছবির দেখার বাইরে, তার চোখের সামনে থেকে। কি হবে তখন!

কয়েকটা বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে-মাথায় পড়ে কিন্তু নড়তে ইচ্ছে করে না। বরং এক অদ্ভুত ইচ্ছে হয়, আঁচল বিছিয়ে সেই স্যাঁৎসেঁতে ছাদের ওপর ছবি শুয়ে পড়ে। একখণ্ড মেঘ এসে চাঁদকে আড়াল করেছে, জ্যোৎস্নার আলো কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। আরও দু'এক ফোঁটা জল পড়ে কপালে, ঠোঁটে। মাথার ওপর দিয়ে কি একটা পাখি ডেকে যাচ্ছে—প্রায় মেঘের কাছাকাছি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার একটানা টি-টি-টি ডাকটাই কেবল সব নিস্তব্ধতাকে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছে।

........হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান

ঝনন ঝনন—

বক্ষের

পঞ্জর ভেদি

অন্তরেতে হউক কম্পিত

সুতীব্র স্বনন।

হে কুমার........!

মমতা ডাকছেন ব্যাকুল গলায়: এই ছবি, ছবি....ভাখ মেয়ের কাণ্ড! সারারাত এই ভিজে ছাদে শুয়ে........তোর কি সবই অদ্ভুত?

তখনও সকাল হয়নি ভাল করে। ফুটি-ফুটি করা আলোয় ছবি সেই ঝুঁকে পড়া মুখখানার দিকে ঘুম ভাঙা চোখ নিয়ে একটা মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

মা কি জানে কথাগুলো........

সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি

দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয় ?

মমতা বলেন : তবু শুয়ে থাকবি ? ওঠ শিগ্‌গির—যা খুশি তাই তো কর, এখন অসুখ একটা না বাধালে চলবে কেন ? আমারও তো সহ্যের সীমা আছে, ছবি।

উঠে বসে ছোটবেলার মতো হঠাৎ সে মা'র বুকের মধ্যে মাথা রাখে : মা গো, আমার জন্য তোমাকে অনেক সহ্য করতে হয়, না ?

বড় ছেলে-মেয়েরা হঠাৎ জড়িয়ে ধরলে মায়ের একটা লজ্জা আছে। মমতা সেই লজ্জার হাসি হাসেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে যায় মুখ : না ! সহ্য করতে হবে কেন ? তুমি যা খুশি তাই করে বেড়াবে আর আমাকে সবাই পুজো করবে বাড়িতে ?

সে কথা ছবি জানে। কদিন আগে সেফু এসেছিল তার কাছে গান শিখতে। ছবি বলেছিল, তোকে এবার আমি নতুন ধরনের গান শিখিয়ে দেব সেফু, দেখিস !

—রবিঠাকুরের ?

—নারে, প্রতিরোধের গান। শেখাতে পারবিনে অন্যদের ?

—না বড়দি, আমি তা পারবো না। তোমার মতো সাহস আমার নেই।........তোমার জন্যে জানো জ্যেঠিমাকে দিনরাত সবায়ের কাছে কথা শুনতে হয়। সেদিন দুপুরে কেবল খেতে বসেছেন, কোথা থেকে দাদু এলেন হাঁফাতে হাঁফাতে, কত কি যাচ্ছেতাই বলে অপমান করলেন। জ্যেঠিমাকে বললেন, অহঙ্কারী নাস্তিক। জ্যেঠিমার ইচ্ছে মতোই তুমি এসব করে বেড়াও।....খাওয়া হোল না, আঁচলে চোখ মুছে উঠে চলে গেলেন।

সোজা হয়ে বসে মমতার মুখের দিকে তাকিয়ে ছবি বলে : কি করবো তুমি বল তবে ?

: কি করে সব মেয়েরা ? লক্ষ্মী স্বভাব নিয়ে ঘর-সংসারের কাজকর্ম করা ছাড়া ?

: শুধু এই ? পারবো না আমি তা, সজোরে মাথা নাড়ে ছবি।

গম্ভীর হয়ে যান মমতা : আচ্ছা, তা না হয় না পারলে—তবে লেখাপড়া কর ঘরে বসে। পল্টু কেমন পড়ছে জানো? তোমার বইগুলোয় তো ধুলো পড়ে আছে, পোকায় কাটছে।……সবই যেন নেশা। পড়তে গেলে তো পাগল হলে, এখন ঘোরার নেশা ধরেছে। আমিই বা আর কত সহ্য করবো ছবি?

আঙুলে গুণে হিসেব করে দেখে ছবি বলে : পরীক্ষাটা দিয়েই দি মা। এখনও পড়লে পারবো দিতে, দেব?—তার দুচোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ছটফট করে ওঠে হঠাৎ। যেন এক বিস্মৃত স্মৃতির কপাট খুলে গেছে। হাসি-মুখে বলে : পরীক্ষা দেব—আজ থেকেই আবার পড়তে শুরু করছি আমি দেখ। কদিন আর কোনো কাজ নয়।

তমালও বলেছিল, পড়াশোনাটা ছেড়ো না ছবি, লেখা-পড়া করলে একটা বৃহত্তর জগত…।

ছেলে-মানুষের মতো ছবি বলে : আমি পাস করলে কি দেবে বল? সোজা কথা নাকি? এ বাড়িতে কোন্ মেয়েটা পাস করেছে বল? কি দেবে?

মমতা হেসে ফেলেন : কি দেব বল্? আমার যে কখানা গয়না আছে দিয়ে দেবে।

: গয়না! ধ্যেৎ! গয়না আমি কি করবো?

: বিয়ের সময় লাগবে না? পাস করলে খু—উব ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দেব, ছবি! এ বংশের প্রথম পাস করা মেয়ে তুই…যদি পারিস!

বিয়ে! শুধু এই! বিয়ের জন্যে লেখা-পড়া! সেই স্কুলে দেখা মালতীদের মতো। ছিঃ! আর কিছু—আর অন্য কিছু ভাবতে পারে না মা! কি যেন বলেছিল সেই ছেলেটা—! বৃহত্তর জগত!

অধীরকাকা বলে, লড়াই করতে হবে ছবি!

কিসের লড়াই? লড়াই করে সেই জগতটাকে তৈরী করতে হয়, নাকি সেই জগতটার সংগেই লড়াই করতে হয়!

দেখবে সে একবার!

ছবি ছোটে প্রসন্নর কাছে: আমার পরীক্ষা প্রসন্নকা, এখন কিছুদিন আমার ছুটি। পাস আমাকে করতেই হবে।

প্রসন্ন বলে: পরীক্ষা দিবি? কিন্তু এ দিকের কাজ—থাক, তাই বলে ……, দে তুই পরীক্ষা। তমালের তাহলে কিন্তু যাওয়া হবে না—আরও কিছুদিন থেকে যেতে হবে বুঝেছ?

তমাল বলে: আমার তো এ বছরটা মাটি হোলই এমনিতে কিন্তু তাই বলে আরও থাকতে হবে? আচ্ছা…না হয় একজনের খাতিরে——।

ছবি মাথা নিচু করে থাকে।

রেগে গেছে ভেবে ধীরেন, অরুণ উৎসাহ দেয় তাকে। কেবল তমাল মিটি মিটি হাসে, শুধু ছবি শুনতে পায় এমন করে বলে: সেই কাজই করছো ছবি কিন্তু বড় দেরিতে। পাস যদি কর তো কি বলেছি——।

রেগে চটে কি করবে ছবি ভেবে পায় না। বলে: পাস আমি করবোই বলে দিলাম।

রাগে, কিন্তু তমালের মুখের দিকে তাকিয়েই কান্না পায়——ওকে ভুলতে হবে। ভুলে থাকবার এও একটা উপায়! অনেকদিন না এলে, না দেখলে আস্তে আস্তে যদি সরে যায় ছবির মন থেকে——তবে বাঁচবে সে!

বেঁচেছেন মমতাও। ছবিকে একমনে পড়তে দেখে পূর্ণশশীও খুশি। পড়তে চায় না হয় পড়ুক—মেয়ে-মানুষের লেখা-পড়া তো পদ্মপাতার জল। ধিঙ্গি নাচ তো থেমেছে।

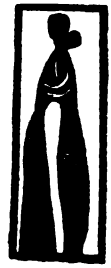
সেফু বলে: তুমি কি জজ্-ম্যাজিস্টর হবে দিদি পড়ে? দাদা তো বলে ব্যবসা করবে—পুরুষমানুষের খানিকটা লেখা-পড়া শিখতে হয় তাই। তুমি?

: আমি!—ছবি অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে থাকে।

চুপি চুপি সেফুই বলে: দাদু আর জ্যাঠামশাই তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন জানো? পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই।

তবু অন্যমনস্ক হয়ে থাকে ছবি।

আটাশ



পরীক্ষাটা যেন একটা দায়—ভবিষ্যতের দায়! আসলে বই-এর আড়ালে মুখ লুকিয়ে ভুলে থাকতে চেয়েছিল সে একটা নাম। বুকের মধ্যে ছলকে ছলকে ওঠা একটা হিম্ হিমে আবেশকে সে চাপা দিতে চেয়েছিল পড়ার গুনগুনানি দিয়ে। তমাল! তমাল!

অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বেলে জ্বেলে পড়ে সে, আর মমতা মশারীর ভেতর দিয়ে যতক্ষণ পারেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন মাথা নিচু করে গুনগুন করা ছবিকে। তাঁর নিজের মনের মধ্যেকার একটা না-ফোটা স্বপ্ন যেন ভেসে ওঠে, একটা মিলিয়ে যাওয়া ভাবনা যেন বসে বসে পড়ে। অনেক—অনেক দিন আগে, ন'বছর বয়সে মা-বাপ হারানো ভায়েদের সংসারে মানুষ হওয়া মেয়েটা বোধহয় সেই স্বপ্নটা দেখতো। তার গলা ছিল গানের কিন্তু কেউ শেখাতো না—শুনে শিখতে হোত। তার পড়াশোনার ইচ্ছে ছিল—উপায় ছিল না, দেখে শিখতে হোত। তার আর কি ইচ্ছে ছিল! আর———৷ আর কিছু না!

এ সংসারে, ও সংসারে ফেলনা মানুষের মতো ঘুরে বেড়ানো ন'বছর থেকে বড় হয়ে পোনের-ষোলো বছরের মেয়েটার অদ্ভুত ইচ্ছে আর কি থাকতে পারে? কেবল গান শিখতে চেয়ে না শিখতে পেরে, পড়াশোনার ইচ্ছেটা মনের মধ্যেই থেকে যাবার পর সেই ষোলো বছরের মেয়ে শেষ ইচ্ছেটা মনের মধ্যে লুকিয়ে বেড়াতো। একটা ভীরু ভীরু ইচ্ছে—একটা ভাল বর, বিয়ে! কেবল তাতেই রোমাঞ্চ হোত।

ছবিকে পড়তে দেখলে তাই মমতা তাকিয়ে থাকেন—যেন মুখ দেখে ওর মনের ইচ্ছেটা ধরতে পারবেন। কি ভাবছে ওই মেয়েটা পড়তে পড়তে? কি চায় মমতার চেয়ে বেশি? তাঁর হয়নি, কিন্তু ওর যেন হয়—একটা ভাল বর, খুব সুখ! হয় যেন!

ক্লান্ত শরীরে ঘুম পায়, ছবিকে ডেকে বলেন : খাটের নিচে চায়ের লিকার আছে ছবি—ঘুম পেলে কাগজ জেলে গরম করে নিস।

উত্তর দেয় না! একমনে কি যেন লিখছে মাথা নিচু করে। এই সময়টা বাড়ির কোনো ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের তফাৎটা কোথায়—দেখিয়ে দিক না কেউ তাঁকে! ওর যেন সুখ হয়—ভগবান! কপালে হাত ঠেকান মমতা বারে বারে—কিসের সুখ তারও স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই তাঁর নিজের মনেই।

ছবি পড়ছে না। মমতা এখন কাছে এসে দাঁড়ালে দেখতে পেতেন, পরীক্ষার কোনো কাজ সে করছে না। একটা খাতার পাতা সে আজে-বাজে লেখায় ভরিয়েছে, কতগুলো অক্ষর মিলে একটা নাম—তমাল! লিখছে, কাটছে, কাট-কুটির ওপর দিয়ে আবার লিখছে। লিখতে লিখতে আঙুল টনটন করছে। মা যেন কি বলল, যদি ঘুম পায়!

ঘুম তার পায় না। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে তার ভাল লাগে।—পড়ার জন্যে নয়। কে জানে সে কতটুকু পড়ে! কে জানে সে পাসই করবে কিনা! সে জেগে থাকে অন্য কারণে—নিস্তব্ধ রাতটাকে অনুভব করবে বলে।

মমতা জানেন না, তিনি ঘুমিয়ে পড়লে ছবি চুপি চুপি ছাদে আসে। চুপি চুপি কার্নিশে তার গালটা চেপে কান পেতে থাকে—।

এখন আর জ্যোৎস্নায় সারা পৃথিবী ভেসে যায় না—এখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। ছবি জানে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে নৌকোয় বেড়াতে ধীরেনদের মতো লোকেরা যাবে না—কেউ বেড়ায় না। তারা হয়তো অফিস ঘরে বসে লণ্ঠনের আলোয় নামের লিস্ট মেলাচ্ছে নয়তো প্রচারপত্র লিখছে, নয়তো কোনো সহজ রাজনীতির বই পড়ছে। আর সেই ছেলেটা—? কে জানে, সেও হয়তো ওমনি একটা কি কাজেই মেতে আছে।

জানে ছবি। জেনেও তার আশা যায় না। তবু যদি আসে—যদি! যদি সেই নিস্তব্ধ রাতের বুক চিরে কাঁপা কাঁপা গলায় কেউ বলে ওঠে,

চাব না পশ্চাতে মোরা,
মানিব না বন্ধন ক্রন্দন, হেরিব না দিক্—
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক-বিচার উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা উপকণ্ঠ ভরি—

…শত-লক্ষ জীবনের ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি…!

কিন্তু কেউ বলে না ; কেউ হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবি ছাদে থাকে, কান পেতে শোনে রাতজাগা পাখির কর্কশ ডাক নয়তো আচমকা ঘুমভাঙা কোনো শিশুর কান্না। তারপর মৃদু পায়ে ঘরে ঢোকে—লণ্ঠনের আলো স্তিমিত করে দেয়। বালিশে মাথা রেখে হঠাৎ কখন কাঁদতে সুরু করে নিঃশব্দে—ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের জল ঠোঁটে ঝরে পড়ে, গলার কাছে জমে থাকে, আর দাঁতে দাঁত চেপে সে ফিস্ ফিস্ করে : পাস করবো না ছাই! বৃহত্তর জগত!—এমন মনটা হয়েছে! কিছু হবে না আমার।

তবু কেমন করে যেন হয়ে যায় পরীক্ষাটা।

মহকুমা শহরে গিয়ে পরীক্ষা দিতে দেবেন না দক্ষিণা : এ সব কি? এসব! কোন্ মেয়েটা যাচ্ছে দেখাও।

আর এ বাড়িতে সেই প্রথম বোধহয় সুখদার উচ্চকণ্ঠ শোনা যায় : যাবে ও, আমি নিয়ে যাবই। এসব পড়াশোনার ব্যাপার—এসব কি বুঝবেন? অন্যায় একটা জেদ ধরলেই হোল।

মমতা বলেন : বাবা, এক মেয়ে হয়েছ বটে তুমি, বড়কাকাকে পর্যন্ত নামিয়েছ।

ছবি লজ্জিত মুখে হাসে : তা আমি কি করবো ব[illegible]? আমি তো পরীক্ষা না দিতে পারলে বেঁচে যাই, কিন্তু—।

পূর্ণশশী পল্টুর কপালে দই-এর ফোঁটা দিয়ে [illegible]কন : ছবি, কই—এদিকে আয়, ঠিক খুসি হয়তো নয় কিন্তু কেমন অবাক অবাক ভাব ঠাকুমার। তোবড়ানো মুখ নিয়ে ছবির মুখটার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে দই-এর ফোঁটা দিয়ে দেন কাঁপা কাঁপা হাতে, চামড়া ঝুলে পড়া হাতখানা কপালের সামনে স্থির হয়ে থাকে একটা মুহূর্ত।

এই রকম সময়টাতেই কেমন ভাল লাগে, ভালোবাসতে ইচ্ছে করে সবাইকে—খুসি করতে ইচ্ছে করে, যেন ওমনি আকাঙ্ক্ষা মেশানো শুভার্থীর মুখ বদলে না যায় কখনও। এই রকম পরিবেশে ছবি অভিভূত হয়ে যায়।

ভাল লাগে কিন্তু ভয়ও করে কারণ ছবি জানে এ মুখগুলো এরকম থাকবে না। শান্ত মেয়ে, ভাল মেয়ে হলে ওরাও ভাল, কিন্তু ছবি যখন ফিরে যাবে আবার পুরনো জীবনে, ওরাও আবার মুখের ভাব বদলে ফেলবে। মা, ঠাকুমা, কাকীমা সবাই—সবাই।

মুখগুলো বদলে গেল কিন্তু অবাক হোল না কেউ—রাগলো না।

এবার আর রাগ নয়, বকাবকি-গালাগালি কিছু নয়, এবার অন্য কিছু। অন্য পথে এবার সম্মান বাঁচাতে হবে।

রান্নাঘরের দরজায় চটির শব্দ পেয়ে মমতা মাথার কাপড় তুলে দিয়ে তাকালেন দক্ষিণার ডাকে : বউমা, কুলদা এই চিঠি লিখেছে দেখ।

ঘটির জলে হাত ধুয়ে, আঁচলে হাত মুছে চিঠিখানা হাত বাড়িয়ে নিয়ে পড়েন মমতা।

যতক্ষণ পড়েন, দক্ষিণা তাকিয়ে থাকেন মুখের দিকে। কোনোদিন ওভাবে তিনি পুত্র-বধূর মুখের দিকে তাকান না কিন্তু আজ লক্ষ্য করছেন মমতার মুখের পেশির নড়া-চড়া, গম্ভীর বিষণ্ণ মুখের স্থৈর্যকে।

পড়া শেষ হলে শান্ত গলায় বলেন মমতা : আমি কি বলবো বলুন? আপনারা ঠিক করছেন।

: বেশ!—আবার চটির শব্দ করে চলে যান দক্ষিণারঞ্জন। মতামত নিতে তিনি আসেন নি, এসেছিলেন ঘটনাটা সম্বন্ধে মমতাকে সজাগ রাখতে। কুলদা তাঁকে কত বিনয় করে চিঠি লিখেছে, ছেলে এখনও তাঁর অবাধ্য হয়নি সেটা দেখাতে।

সরস্বতী বলে : কি দিদি—কিসের চিঠি?

মমতা ম্লান হাসেন একটু উত্তর দেবার আগে : ছবির বিয়ের ঠিক করতে উনি শহরে গেছেন—সেই চিঠি।

: ভালই হবে দিদি! এবার ওকে একটু শান্ত হতে বলুন।

শান্ত হতেই তো চেয়েছিল ছবি। মনটাকে শান্ত করে ফিরে আসবার প্রতিজ্ঞা ছিল তার কিন্তু হোল না সে!

নৌকো থেকে প্রথম মাটিতে পা দিতেই যে প্রথম হেসে অভ্যর্থনা জানায় তার ভয়েইতো পালিয়েছিল সে এতদিন। ভেবেছিল বুঝি ভুলে যাওয়া যায়! কিন্তু সত্যি যে যায় না। কি করবে ছবি এখন!

তমাল হেসে বলে: কেমন হোল পরীক্ষা?

সে হাসিতে ছবির শরীরের মধ্যে শিউরে ওঠে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে তার খুসিটা লুকোবার চেষ্টা করে বলে: জানিনে যান্! আপনার তো জানাই আছে ফেল করবো।

তমাল এবার উল্টো কথা বলে: কখনো ফেল করবে না তুমি। আমার ভুল হতেই পারে না।

: তবে যে সেদিন বলেছিলেন?

: সেদিন!—হাসবার চেষ্টা করে তমাল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়: সেদিন নাকি ছবি? সে যে কতকাল! উঃ কত দিন যে তুমি আস না ছবি—কতদিন!

: কতদিন কি?—জিজ্ঞেস করা হয় না ছবিরও। আমগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভেঙে পড়া সূর্যের আলো বাঁকা হয়ে তমালের মুখে-চোখে পড়েছে, সে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছবির মুখের দিকে। অদ্ভুত! সে দৃষ্টি সহ্য করা যায় না। হঠাৎ কান্না পায়, দ্রুতপায় সরে গিয়ে মেয়েদের মধ্যে বসে পড়ে ছবি। মানুষগুলো চেনা, শব্দগুলো চেনা এখানকার। ভুলে থাকবার অনেক উপকরণ আছে এখানে—একবার কাজে লেগে যেতে পারলেই হোল।

যার ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে এদিক-ওদিক চোখ তুলে তাকাবার পর্যন্ত সাহস হারিয়েছে ছবি সেই ছেলেটা আজ নাকি চলে যাবে!

আবার সেই পুরনো দিনের মতো কষ্ট, অনেকদিন আগে মিনুরা চলে গেলে স্টেশনে তার যেমন কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এ যে তার চেয়েও বেশি। চলে যাবার দিন এত তাড়াতাড়ি আসে কেন মানুষের! কেন চিরকাল ধরে থাকে না—থাকতে পারে না!

কালকের পল্টুর হাতে পাওয়া চিঠিখানা আজ আবার বার করে সে,

হাতে কাঁপে থর থর করে : আমি চলে যাচ্ছি···কিন্তু তোমাকে যে আমার অনেক কথা বলবার আছে ছবি !

এতদিন সময় হয়নি ? কি বলবে তমাল তাকে ? কেন ছবিকে সেকথা শুনতেই হবে ? সে যদি না যায় ? না—সে যাবে না।

সেকথা ভেবেও বেশিক্ষণ শক্ত রাখা যায় না মনটাকে। রিলিফ কিচেনে গেলে অরুণ বলে : তমালের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর ? এইমাত্র গেল এখান থেকে। আজ দুপুরের গাড়িতে ও চলে যাবে—দেখা হয়নি ?

দেখা তো করতে ছবি চায় না। কি হবে দেখা করে ! তমাল কি দুদিন পরে তাকে মনে রাখবে শহরে গিয়ে ?

সে বলে : আমার ঘাড়ে কত কাজ তো দিয়েছেন চাপিয়ে—আমার সময় কোথায় !

কিন্তু কাজ করতে গিয়ে ভুল হয়ে যায় বারে বারে। বিরক্ত হয়ে শেষে সে উঠে আসে। আজকের দিনটার জন্যে ছুটি চাই তার—শুধু আজকের দিনটা ! তারপর কাল থেকে আবার কাজে লাগবে ছবি, অনন্তকাল ধরে এই হতাশ্বাস মানুষগুলোর সুখ-দুঃখের ভাগ নেবে। বোঝাবে, শোনাবে, এক করবে। আজকের দুঃখটা শুধু তার একার, কোথাও বসে চুপি চুপি সে একটু কাঁদতে চায়।

জাল বুনতে বুনতে বসুদেব জেলে রাধার বিরহ-গাথা গাইছে। যুবক সে ! তার গলায় সুর আছে, খুব শীর্ণ হয়ে যায়নি সে আর সবায়ের মতো। তার চোখদুটো এখনও আশায় জ্বল জ্বল করে। থেকে থেকেই ছুটে আসে তাদের কাছে ; বলে, কি কন্ দিদি ? এই দিনই তো আর সব না ! কি কন্ ? দিন আবার ফিরবি আমাগারে না কি ?

তার গান ছবি কান পেতে শোনে :

কৃষ্ণ কালো তমাল কালো
তাইতে তমাল ভালোবাসি।

ছবির বুকের মধ্যে যেন কান্নার তুফান ওঠে, ভালোবেসেছে যে ছবিও। তার গলা শুনলে বুকের মধ্যে চমক লাগে, তার হাসি দেখলে কান্না পায় এ যে যন্ত্রণার ভালোবাসা !

যখন ছোট ছিল বেশ ছিল সে। এখন আর ফেরা যায় না সে দিনগুলোতে ?

ছবি কয়েকবার কাগজ-পত্র রেখে উঠে পড়ে, দুবার ঘাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, আবার ফিরে আসে! দুপুরেই চলে যাবে তমাল! যাক চলে! কেন সে এসেছিল! এলো যদি তো কেন আগেই চলে যায়নি! খাঁচার পাখিকে সে বনের স্বাদ দেখাতে চায় কেন!

অনেকক্ষণ ছটফট করে ছবি শেষে বলে: বসুদেব, নৌকোয় করে আমাকে একটু ওই পাড়ায় দিয়ে আসবে? খানিকক্ষণ পরে আবার নিয়ে আসতে হবে—পারবে না?

তমালদের বাড়িটা অনেক দিনের পুরনো, ধসে যাওয়া দালান। গ্রামের একেবারে আর এক প্রান্তে। ওর বাবা কোলকাতায় চাকরি নিয়ে গ্রাম ছেড়েছিলেন ছোট্ট তমালের হাত ধরে। আসতেন কখনও—দু'এক দিনের জন্যে—থাকতে নয়। ওরা শহুরে হয়ে গেছে তারপর থেকেই। শহুরে ছেলে তমাল! লম্বা বারান্দা বেরিয়ে যেতে যেতে ছবি ভাবে, গ্রামে এসে এতদিন ছিল কি করে! ওই জল-কাদা ভাঙা, মশা—অন্ধকার—কত কষ্ট হয়েছে। এতদিন কেউ শুধু শুধু থাকে কেন—সত্যি সত্যি কাজের জন্যে নাকি····?

অত বড় বাড়িখানায় কেউ থাকে না। ঘরগুলোয় তালা দেওয়া, কতগুলো ভেঙে পড়েছে। খুঁজে খুঁজে তমালের ঘরখানাকে বের করতে হয়—খোলা দরজার দিকে পেছন ফিরে কি যেন লিখছে তমাল।

ছবির বুকের ভেতরটা কাঁপছে—কেন তা সে নিজেও জানে না। লুকিয়ে এসেছে বলে?

নিঃশব্দ পায়ে সে ঘরে ঢোকে, থমকে দাঁড়ায় একবার দরজার কাছে। এখনও চলে যাওয়া যায়। এখনও কেউ দেখতে পাবে না তাকে যদি সে পালায়।

কিন্তু পায়ের শব্দ কানে গেছে। পেছন ফিরে তাকে দেখে তমাল খুসি মুখে হাসে: এলে? ভেবেছিলাম বুঝি আসবে না।

ছবি চুপ করে থাকে। তার মুখের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। কেন আবার এলো সে! কেন আবার দেখল ওকে! কলে থেকে যখন থাকবে

না, সারা গ্রামটার কোথাও খুঁজলে পাওয়া যাবে না তখন কেমন করে দিন কাটবে ছবির!

: তুমি কি আমার চিঠি পেয়ে রাগ করেছ, ছবি?—তমাল জানতে চায়?

: না—মাথা নেড়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে ছবি।

হাসার চেষ্টা করে তমাল বলে: যেতে ইচ্ছে করছে না ছবি—বড় মায়া পড়ে গেছে······সেই কোন ছোটবেলায় চলে গেছি···এলাম ভালই হোল, অনেক কিছু দেখে গেলাম, শিখে গেলাম···কিন্তু একজনকে কেবল রাগিয়ে গেলাম,—হাসতে থাকে তমাল কথা শেষ করে।

তারপর আস্তে আস্তে কখন তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, সে নিজেও বুঝি তা জানে না, বলে: যাবার দিন ঠিক করে করেও যাইনি—কিন্তু আর থাকা যায় না। সুশোভন কাকা বড্ড কড়া চিঠি লিখেছেন। তাঁর ছেলে-মেয়েদের পড়ার ক্ষতি হচ্ছে, আমার বছরটা এমন করে নষ্ট করলাম কেন জানতে চেয়েছেন।

ছবি বলে: ঠিকই তো, এমন করে নষ্টই বা করলেন কেন বছরটা? শুধু শুধু····?

: শুধু-শুধু,—জোর করে হাসে তমাল: আসলে পরীক্ষা দিলে এবার পাস করতে পারতাম না ছবি। গত বছরটা কি পড়েছি নাকি! মিটিং-মিছিল-গুলি—আন্দোলন নিয়ে কেটেছে না? এবার এখানকার শিক্ষা নিলাম। কিন্তু··· চলে গেলে তুমি কি খুসি হতে?

: খুসি!—এবার আর ধরে রাখা যায় না নিজেকে। ছবি কেঁদে ফেলে মুখ ঢাকে লজ্জায়, তার দুহাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায়।

তার হাতটা জোর করে নামিয়ে দিতে দিতে তমাল বলে: হে সবিতা, তোমার সত্যের মুখ আচ্ছন্ন, দূর কর সেই আবরণ—কেঁদো না ছবি, কাঁদলে আমার বড় কষ্ট হয়।

তারপর ছবির আঁচল দিয়েই চোখ মুছিয়ে দিয়ে তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে হাসিমুখে তমাল বলে: তোমাকে যদি একেবারে নতুন এক নামে ডাকি রাজী আছ? সে নাম কিন্তু আর কেউ জানবে না।

: কি ?

: সবিতা।

জল-ভরা চোখে ছবি বলে: ধ্যেৎ, সবিতা তো পুরুষের, সূর্যদেবের নাম। জানেন, ছোটবেলায় সূর্যদেবের রথ দেখবো বলে অন্ধকার থাকতে উঠে ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর···হারাণ ঠাকুরের নেই ছড়াটা—ওঁ জবাকুসুমসংকাশং······, ছবি অন্যমনস্ক হয়ে যেন পুরনো দিনগুলোয় ফিরে যায়।

তমাল তাকে আর একটু কাছে টেনে নেয়, তার মুখ উঁচু করে তুলে ধরে বলে: হোক পুরুষের নাম, তোমাকে আমি ওই নামেই ডাকবো ছবি—শুধু আমার নাম হয়ে থাকবে ওটা। ছবি, তুমিও আমার···তমাল ছবির মুখটা নিজের গালের সঙ্গে চেপে রাখে। মেয়েটা কাঁপে থরথর করে, তার চোখের জলে তমালের গাল ভিজে যায়, তার মুখের দিকে তাকিয়ে তমালেরও চোখ কখন ভিজে উঠেছে। লজ্জিত হয়ে মুছে ফেলে তমাল বলে: তুমি তো আমার কথা কিছু জান না ছবি, একটু বলি। সুশোভন কাকা আমার বাবার বন্ধু, বাবা আমাকে আর মাকে খুব নিঃসহায় রেখে মারা গেলে উনিই আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, এখনও পড়াচ্ছেন। ওঁর অনেক বড় ইচ্ছে আছে, আমাকে অনেকে বড় করে ওঁর মেয়ে অরুণার সঙ্গে বিয়ে দেবেন।

নতুন নামটা শুনে ছবির হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যায়, আলাকরা অনুভূতি ভরা মনে হঠাৎ একমুহূর্তে তার সমস্ত কেমন বিস্বাদ লাগে। চোখের জল মুছে ফেলে আড়ষ্ট হয়ে যায়, সরে বসে তমালের কাছ থেকে। এখানে এসেছে কেন তবে ছিঃ হ্যাংলার মতন,—নিজের মনের সঙ্গেই যেন কথা বলতে থাকে সে।

তমাল ছবির মুখের নতুন ভাবটা ধরতে পারে। সে করুণ একটু হাসে : জান ছবি, গরিব হওয়া বড় কষ্টের, বুদ্ধিমানরা তার সুযোগ নেয়। এবার কোলকাতায় গিয়েই আমি যেমন করে হোক ওবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বো, একটা চাকরির চেষ্টা করব—পড়া আমার না হয় নাই হবে!

ছবি এবার শাসনের সুরে বলে: না, পড়া বন্ধ করলে চলবে না। এখনই কি চাকরি ?

তমাল আবার ছবিকে কাছে টেনে নেয়, তার মুখটা দু'হাতের মধ্যে

উঁচু করে বলে : তোমার শাসন সব মেনে নেব—যা বলবে, কিন্তু একটা শর্তে, বল তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে ?—ব্যাগ্র দুই চোখ মেলে ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তমাল।

কি উত্তর দেবে ছবি ? তমাল কি তা জানে না যে কেন বারে বারে ছবির চোখ ছাপিয়ে এত জল নামছে ! উঃ এত কষ্ট হয় ছেড়ে দিতে !

ছোটবেলায়ও তার কান্না এসেছিল মিনুরা যেদিন চলে গেল। কেঁদেছিল নিলু নিখোঁজ হয়ে গেলে—কেঁদেছে সুধাদির কথা মনে করে; বখাটে একটা ছেলের জন্যেও কবে যেন তার চোখ জলে ভরে উঠত থেকে থেকে। কিন্তু আজকের কান্না ! এ যেন ছবির বুকের মধ্যে আর কোথায় জমানো ছিল—সেখান থেকে অবিরল ধারায় বেরিয়ে আসছে। ছবির সাধ্য নেই রোধ করার।

তাকে দু'হাতে নাড়া দিতে দিতে তমাল বলে : কিছুই কি বলবে না, ছবি ?

এবার নিজেই চোখের জল মুছে ফেলে ছবি বলে : কি বলবো আমি ? তুমি কি জান না কিছুই ?

জানে তা তমাল, আর জানে এর জন্যে ছবিকে সহ্যও করতে হবে অনেক কিছু। বলে : জানি সে কত কষ্টের ! তোমার সে কষ্টের কথা ভেবে আমারও মন ছটফট করবে কিন্তু এটাই সব নয় ছবি। তারপরেও দিন আছে —পৃথিবী আছে। তোমার আমার সমান অধিকারে এক নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে—সে সব দিন আমাদের, ছবি।

বলে : তোমাকে সবিতা বলেছি, সূর্যের আলোর মতো জীবনে ওমনি উজ্জ্বল যেন হতে পার।······পাস করলে পর যেমন করে পার কোলকাতায় এসো ছবি···গ্রামের শিক্ষাও মস্তবড় কিন্তু ওখানে না গেলে পৃথিবীটাকে ধরতে পারবে না তুমি। বাঁচতে হলে সে জগতটার সঙ্গে লড়াই করতে হবে তবু তাকে ছাড়া চলে না।

ছবি বলে : অমি কি পারবো ? যদি দুর্বল হয়ে পড়ি—যদি বাধার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারি।

: পারবে ছবি,—তমাল উৎসাহভরা গলায় বলে : আমি জানি তুমি পারবে।

বাইরে বসুদেবের গলা শুনে দুজনেই চমকে উঠে চোখের জল মুছে

একা... হাসবার চেষ্টা করে চোখে চোখে তাকিয়ে। এই নির্জন দুপুরে গ্রামের একটা ...লের ঘরে, একটা মেয়ে লুকিয়ে এসেছে দেখা করতে, এমন লজ্জার কথাটা এই প্রথম মনে পড়ে যায় তাদের।

তমাল নিজেই হাত ছেড়ে দেয়, বলে : যাও এবার, আর থেকো না।

ছবি নড়ে না। একদৃষ্টিতে সে তমালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, বারে বারে কান্না দমন করবার চেষ্টা করে কিন্তু শেষে আর পারা যায় না। কান্নায় ভেঙে পড়ে সে, তমালের কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে যন্ত্রণাভরা ভয়ার্ত গলায় তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে : তুমি চলে যাবে! আর যদি দেখা না হয়? যদি...।

তার মুখ জোর করে তুলে চোখের ওপর চোখ রেখে তমাল অতি কষ্টে হাসবার চেষ্টা করে বলে : ও কি কথা ছবি? কি বলছ?

: কি জানি...। আমার ভয় করছে! আমি বুঝতে পারছিনে।

এবারও তমাল দাঁতে দাঁত চেপে নিজের চোখের জলকে সংযত করে রাখে, বলে : কেঁদো না। চোখের জল দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়।...... কেন ভয় পাচ্ছ? আমাদের কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না, সবিতা। যদি তোমার আশংকা সত্যি হয় তবে সে আমার জীবনের দুর্দিন—তোমারও। সে একমাত্র মৃত্যুতেই স...।

ছবি ...য় উঠেছে বুঝতে পেরে তমাল তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে : এত মনের ...র আমার কেমন করে হোল জান? তোমাকে দেখে। তুমি আমার চেয়ে ...নক বড় ছবি—কত বড় তা তুমিও জান না।

ছবির কাছে ওসব কথার এখন আর কোনো মানে নেই, সে জলভরা চোখে কেবল তমালকেই দেখে। আর একটু পরে আর তো দেখতে পাবে না....হয়তো আর কোনোদিন...কিন্তু বারে বারে একথা মনে হচ্ছে কেন? তমালের এত প্রতিশ্রুতির পরেও?

কিন্তু আর থাকাও যায় না—বাইরে বসুদেব অধীর হয়ে উঠেছে—ছবিকে এবার যেতে হবে। এবার সে চোখ মুছে ফেলে উঠে দাঁড়ায়, তমালের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে : যাই।

তমাল বলে : কাঁদতে পাবে না—হেসে যাও। তারপর হাসার চেষ্টা করে দুজনেই কিন্তু সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ, ম্লান।

দরজা পর্যন্ত তমাল তা... এগিয়ে দেয়। ছবি নৌকোয় গিয়ে বসলেও

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বন-জঙ্গলের আড়ালে মিলিয়ে না য একটা ওয়া পর্যন্ত।

চোখ মেলে

ছবি ভেবেছিল কেউ তাকে দেখেনি। অনেকটা চলে আসবার পর বুঝতে পারে তার ধারণা ভুল। ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে তার বয়সী, কন বা তার চেয়ে ছোট, চেনা-অচেনা কয়েকটা ছেলে সমস্বরে চিৎকার করে গান ড় দিতে ধরেছে : সখি! মরিলে বাঁধিয়া রেখো তমালেরই ডালে.... ।

রা

হয়তো আরও অনেক লোকই দেখেছে তাকে। সুধাদি এইবার নিন্দে রটবে সারা গ্রামে।

চোখ

ওদের সমস্বর সুরটা খানিক দূরে চলে এসেও বুকের কানে বাজতে থাকে : সখিগো···ও···ও—ও।

আস

সকালে বসুদেব গাইছিল মনের খেয়ালে, অন্তর দিয়ে। ওরা গাইছে, কুৎসিত করে, মনের পাঁক মিশিয়ে। নিন্দে হবে গাঁয়ে! কি হোক! ছবি যে তমালের জন্যে প্রাণও দিতে পারে। তমাল! আবা র কখন নামটা উচ্চারণের সঙ্গে দু'গাল বেয়ে জল গড়ায়, নামবার বলে আগে ছবি তাড়াতাড়ি তা মুছে ফেলে।

মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন এসে দুহাতে, সহও াকে জড়িয়ে ধরে। : কে?

স্তব দ কষ্টের

মায়া সামনে দাঁড়িয়ে হাসে, বলে : পালিয়ে এলউ রপরেও কতদিন আর ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখবে—ওদের সংসারই দেখো এক নতু হয়ে পড়বে তাহলে? দুপুরে সবাই ঘুমোচ্ছে, ঘাটে মামার ডিঙি খে —বেয়ে চলে এলাম।

লা

ছবির মুছে-ফেলা চোখের জল কিন্তু মায়ার চো থকে ফাঁকি দিতে পারে না, বলে : কেঁদেছিস্ কেন রে ছবি? বাড়িতে বু ঝি কেবল গালাগালিতে কুলোয়নি—অন্য কিছু······?

স

: না, তা নয়, ছবি মাথা নেড়ে চুপ করে থাকে।

: তবে?

প

ছবি লজ্জিতমুখে বলে : তমালদা আজ চলে গেল মা য়াদি—!

: ও তাই, তাই ছবি!—মায়া তার হাতখানা নিজে র হাতের মধ্যে তুলে নেয় : আমি আগেই জানতাম—বুঝেছিলাম! চলে গেল···হ্যাঁরে ও যে বলেছিল অধীরদার জন্যে কি ব্যবস্থা করবে? কিছু বলে ছ?

: ও, স্যানাটোরিয়াম ? গিয়েই প্রাণপণ চেষ্টা করবে বলে গেছে।

মায়া কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। ছবির ইচ্ছে ছিল তমালের কথা আর একটু মায়াদির কাছে বলবে কিন্তু অধীরের নামে তার মুখের ওপর যে বিষাদ করুণ ছায়া নামে তারপরে আর কিছু বলতে ইচ্ছে করে না।

মায়া তখনও অন্যমনস্কের মতো একদিকে তাকিয়ে আছে—তেমনি ভাবেই বলে : ছবি, আমি তোদের মতো লেখাপড়া জানিনে, বুদ্ধি-বিদ্যে নেই কিন্তু ওই একটা মানুষের নামে আমি কি যে জোর পাই !—কিছু ভয় থাকে না ! ও যদি কোনোদিন না থাকে···ছবি, সেদিন আমি কি করবো ?···কি হবে ছবি···!

কিন্তু এটা কাজের জায়গা। অরুণ একটা নোটিস হাতে করে এসেছে। বলে : রিলিফ কিচেন আর থাকছে না ছবি—পয়লা থেকে ওয়ার্ক হাউস হয়ে যাবে, সার্কুলার এসেছে। এসো আমরাও কাজ-কর্মের একটা প্ল্যান করে ফেলি।

ছবি এগিয়ে যায়, মায়াও যায় তার সঙ্গে। কাজ আছে···অনেক কাজ। বসে থাকলে চলবে না, কাঁদলে চলবে না। হৃদয়াবেগকে এখানে কেউ প্রশ্রয় দেয় না।

উনত্রিশ

কুলদা এসেছেন সে খবরটা রান্নাঘরে বসেই মমতা পেয়েছেন, কিন্তু উঠে আসেননি। কেবল রান্না করতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন মাঝে মাঝে, হোক্—যা হবার হোক্। আর ভাববেন না তিনি। আর ভাবতে পারবেন না…।

সরস্বতী বলে : কি হবে দিদি ?

: দেখতো, মেয়ে চলে গেছে নাকি ?

ফিরে এসে সে বলে : না, এখনও যায়নি ! ডেকে আনবো ?

মমতা করুণ চোখে তাকালেন আসন্নগর্ভা শংকিত-মুখী বৌটার দিকে। ছবির জন্যে ওর যেন দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সবায়ের সঙ্গে সায় দিয়ে সেও বলে সত্যি বড় জেদী মেয়ে—কি যে হবে……।

কিন্তু মমতা জানেন ওটা ওর মনের কথা নয়। ছবিকে মনে-মনে সবায়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসে সে, প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যেমন করে মা তাকায় তার সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলেটার দিকে।

এ সংসারে এসে ও যেন এক ভয়ের রাজ্যে এসে পড়েছে। প্রত্যেক বছর ছেলেমেয়ের মা হতে হতে মনের কোণে বিরক্তি জমা করা থাকে কিন্তু প্রকাশ করবার সাহস ওর নেই।

সরস্বতীর অসহায় ভীত মুখখানার দিকে তাকিয়ে মমতা হাসবার চেষ্টা করে বলেন : তুই অত ভয় পাচ্ছিস কেন ? ও মেয়ের একটু শাস্তি হওয়া ভালো, বড্ড বাড় বেড়েছে,—কিন্তু কথাটা বলে মমতাও স্বস্তি পাচ্ছেন না। তাঁর মুখেও কিসের ছায়া নামে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন : এ যন্ত্রণা আমার আর সহ্য হয় না সরস্বতী ! দুটো মেয়ে হয়ে বাঁচেনি, প্রদীপটা যখন হোল তখনও খুশি হতে পারিনি, সেই মেয়েগুলোর জন্যে কেঁদেছি। ভগবান শেষে আমাকে এমন মেয়ে দিলেন ! ওর জ্বালায়…কতদিন ভেবেছি কি জানিস ? মরে গিয়ে জ্বালা জুড়োই !

সরস্বতী চমকে উঠে দুহাতে মমতাকে জড়িয়ে ধরে বলে : ছি ছি,

ওসব কথা মনে করতে হয় কখনও? আপনি এত ভাবছেন? এমনিতে একটু ছটফটে ছবু কিন্তু বিয়ের নামে দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

কি বলবেন মমতা? কেন ছটফট করছেন কাকে তিনি বোঝাবেন? ছবিকে লেখা তমালের চিঠি তিনি মা হয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছেন। পড়ে ছুটে গিয়েছিলেন অধীরের কাছে—সেদিন দুপুরবেলা। খুব রাগ ছিল, অনেক গালাগালি করেছেন তিনি ওদের আদর্শকে, নীতি-নিয়মকে। শেষে চোখের জল ফেলেছেন, সব কিছুর জন্যে দায়ী করেছেন অধীরকে: ছেলেটাকে ঘর-ছাড়া করার মূলে তুমি! মেয়েটাকে পর্যন্ত এক সর্বনাশা পথ ধরিয়েছো, শুধু বাড়ির বাইরেই টেনে নাওনি, ঘর-ভাঙাচ্ছ ওকে দিয়ে!

তাঁর অভিযোগ শুনে, রাগ দেখে হেসেছে মৃত্যুপথ-যাত্রী মানুষটা! বলেছে: অনেক তো দেখলেন বৌদি। জীবন ভোর একটা নিয়মই দেখে এলেন। এবার ওরা জারি করুক না আর একটা নিয়ম। সুখটা তো আপনার নয়—সমাজেরও নয়, সুখটা ওদের।

: জাতের কথা আমি না হয় ভুললাম মেয়ের সুখের আশায়, কিন্তু সবাই মানবে কেন? কতবড় একটা সংস্কার···ওটা কি কিছু না?

অধীর বলেছে: আপনিও যেমন? ওটা আবার একটা সমস্যা নাকি? সত্যিকার সমস্যা মানুষের অজস্র—! দুঃখ-যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করা আছে, মরণ-বাঁচনের কত প্রশ্ন আছে। ওসব কি সমস্যা নাকি! ভাবলেই বেশি। অত ভাববেন না।

: কিন্তু তোমার দাদা যে ওর পাত্র ঠিক করেছেন। আমরা তো আর অসুখী করবো না, ওর লেখাপড়ায় বাধা পড়বে না, তুমি একটু বুঝিয়ে বলো অধীর।

অধীর অস্বীকার করে বলেছে: ওকে জোর করে কিছু করানো যাবে না বৌদি। নিজেরা তো মনের টুঁটি টিপে মেরেছেন, ছবিকে দিয়ে ওটা আর নাই বা করালেন। আর তাছাড়া···ওর যদি মনের জোর থাকে ওর পথ ও নিজেই বেছে নেবে···।

মাঝরাতে ঘুমন্ত ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে মমতা সেই আসন্ন আশংকার কথা ভেবেছেন: এত অবাধ্য হবে ছবি! ছবি···এত কষ্ট দিবি তুই আমাকে.... নিঃশব্দে চোখের জলও ফেলেছেন বিনিদ্র চোখে।

কেন তিনি ভয় পাচ্ছেন সে কথা তিনি জানেন, সরস্বতী তা বুঝবে না। বুঝবে না এ বাড়ির একটা মানুষও।

সরস্বতী কখন যেন ডেকে এনেছে ছবিকে। সে বলে : আমাকে ডেকেছো মা ?

মমতা তাকে কাছে ডাকেন, আদর করে তার মুখের ওপরকার চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে মিনতি ভরা চোখে তাকান : আমার একটা কথা রাখবি ছবু ? লক্ষ্মী, সোনা ! আর আমাকে কষ্ট দিস্‌নেরে। আমি আর সহ্য করতে পারিনে।

ছবির ঠোঁট কাঁপে, সেও শুনছে খবরটা। বুকের ভেতরটা কেমন শিরশির করে উঠছে থেকে থেকে। তমালের শেষ চিঠিখানা সে বুকের মধ্যে রেখেছে।

মমতা বলেন : ছেলে খুব ভাল, লেখাপড়া জানা হৃদয়বান ছেলে, ভাল চাকরিও করে। ওদের ওখানেও কলেজ আছে, বলেছে পাস করলে তোকে পড়াবে···ওরা···।

ছবি হেসে ফেলে হঠাৎ : অত বিজ্ঞাপন দিচ্ছ কেন ? আসল কথাটা বল না, মা ?

: কিছু করতে হবে না তোকে। ওরা তো গেঁয়ো নয় যে সাত-পাঁচ জিগ্‌গেস করবে। ছেলের বাপের সামনে গিয়ে একবার কেবল দাঁড়াবি।

: তারপর ?

: উনি তো দেখেছেন ছেলেকে, রাজপুত্রের মতো চেহারা। অবস্থা ভাল, বিয়েটা হলে কত সুখে থাকবি তুই, ওই একমাত্র ছেলে !

তমালের চিঠিটা বুকের মধ্যে একবার স্পর্শ করে ছবি। রাজপুত্রের মতো চেহারা তার নয়—সে কালো। সে ভাল চাকরি করে না—পরের বাড়ি ছেলে পড়ায়। সে গরিব—তাই সুযোগ নেয় বড়লোকেরা। তবু তমাল ! তার সেই স্নিগ্ধ হাসি ভুলে যাবে ছবি ! তার কাছে করা প্রতিজ্ঞা—প্রতীক্ষা করে থাকার, সহ্য করার ! এখনও যে একমাসও হয়নি !

না, মমতার চোখের জল দেখলে ছবির সব গোলমাল হয়ে যায়। সে শক্ত হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে : কত বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখেছ ? ওয়ার্ক হাউসে যেতে হবে না ? তোমাদের যা কাণ্ড !—হেসে সব কিছুকে তুচ্ছ করে দিয়ে সে পা বাড়ায় বাইরের দিকে।

: ছবি !—কুলদা ডাকেন।

দক্ষিণা বলেন : দাঁড়াও।—তাঁদের পেছনে পূর্ণশশীও আছেন।

ছবি জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকায় বাবার মুখের দিকে। কুলদা কোমল গলায় বলেন : কথাবার্তা সব বলাই আছে। একটু কেবল দেখে যাবেন ওঁরা তোমাকে।

: আমি তো যেতে পারবো না বাবা।

: কি বললে ?—দক্ষিণা হঠাৎ ছুটে আসেন সামনে। ছেলের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলেন : তুমি কি শুনতে পাওনি কুলদা ? আমি তো যেতে পারবো না বাবা,—বিকৃতমুখে ছবির কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে বলেন : খুব ভাল লাগছে মেয়ের কথা শুনতে ? মেয়েকে যে মেমসায়েব বানিয়েছ, ফল দেখেছ ? কুলাঙ্গার ছেলে কোথাকার···।

: বাবা !— কুলদা যেন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠেন, রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ছবির হাত ধরে টেনে আনেন সামনে। ছবি অবাক হয়ে একবার কুলদার মুখের দিকে তাকায় তারপর চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবার হাতের মধ্যে ধরা হাতখানা কাঁপছে অল্প অল্প—সেটা বাবার না তার নিজের, বুঝে উঠতে পারে না সে।

দক্ষিণা খানিক শান্ত হয়েছেন ততক্ষণে, স্থির গলায় বলেন : ঘরে তালা বন্ধ করে রাখোগে মেয়েকে, যদি ভালো চাও। কত বড় আস্পর্ধা ! বলে যাবো না সামনে !

পূর্ণশশী কাছে এসে ছবির গায়ের ওপর সস্নেহে হাত রাখেন : কথা শোন দিদি ! যা বলে কর। ওরা তো তোর ভালর জন্যেই করছে, লেখা-পড়াই শিখিস আর যাই করিস···মেয়েমানুষের কি বিয়ে ছাড়া গতি আছে ?

কুলদা বলেন : অনেক তো চুন-কালি মাখিয়েছ মুখে—গ্রামে তোমার জন্যে আমার কান পাতা দায়। ওদিকে আমার মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল—দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা। তারপর আবার তোমার অবাধ্যতা—আর সহ্য করবো না। যাবে কিনা বলো ?

: না—একটামাত্র কথা বলে তেমনি চুপ করে থাকে মেয়ে।

কুলদার মাথায় এবার আগুন জ্বলে। দক্ষিণা পাশে দাঁড়িয়ে টেনে টেনে ব্যঙ্গের হাসি হাসছেন। কুলদা ছবির হাত ধরে টানতে

টানতে নিয়ে গিয়ে সুখদার ঘরের পাশের অন্ধকার ঘরখানায় ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দেন। তাঁকে বাধা দেবে এমন সাহস এ বাড়িতে কারুর নেই। কেবল পূর্ণশশীর করুণ কণ্ঠ শোনা যায়: করিস কি, ও কুলদা। ওতে যে মেয়ে আরও বেঁকে বসবে। ভাল কথা বল, মিষ্টি করে বোঝা।

যারা দরজার কাছে এসেছিল দক্ষিণারঞ্জন ধমক দিয়ে তাদের স'রিয়ে দেন। কুলদার উচ্চকণ্ঠ অনেকটা আর্তনাদের মতো শোনায়: কেউ কিছু বলো না আমাকে, আমি আজ দেখে নেব। কুলাঙ্গার ছেলে শোনার যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না।

অন্ধকার ঘরে পায়া ভাঙা তক্তপোষখানার ওপর বসে অনেকক্ষণ পরে ছবি হাসে একটু নিজের মনে। বাড়ির ভাঁড়ার ঘর এটা। ভ্যাপসা গন্ধ বার হওয়া প্রায়ান্ধকার ঘর একটা, ছোট্ট একটা জানলার ফাঁকে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে। সেই আলোয় চিঠিখানাকে সে বার করে আর একবার পড়ে, একবার উচ্চারণ করে মৃদু অস্ফুট গলায়: তমাল!—তারপর আঁচল বিছিয়ে শুয়ে থাকে চুপ করে।

তারপর কতক্ষণ কেটেছে কে জানে। ছবি ঘুমিয়ে পড়েছিল, গায়ের ওপর দিয়ে ইঁদুরের মতো ছোট কিছু একটা লাফিয়ে যেতে তাড়তাড়ি সে উঠে বসে। ওয়ার্ক হাউসের কথা মনে পড়ে। না গেলে সবার অসুবিধে হয়, তারও ভাল লাগে না। আজ ওরা ষড়যন্ত্র করে যেতে দিল না তাকে। না দিল! কিন্তু এভাবে বন্দী হয়ে থাকা এ বাড়িতে এই বোধহয় শেষ—আর কোনদিন কারও ভাগ্যে যেন না ঘটে। আর ঘটবে না ছবি তা জানে। সেখানে একটা সান্ত্বনা আছে।

দরজার শেকলে মৃদু শব্দ ওঠে। কে যেন সন্তর্পণে শেকল খুলে ঢুকেছে ভেতরে, তার মাথায় হাত রেখেছে, নাম ধরে ডাকছে।

ছবি দুহাতে মাকে আঁকড়ে ধরে চুপ করে থাকে। মমতা কাঁদছেন, তাঁর চোখের জল ঝরে পড়ে ছবির মাথায়: কি কেলেঙ্কারি করলি, ছবি! আর যে সহ্য করতে পারিনে আমি! একটু কেবল গিয়ে সামনে দাঁড়া, নইলে তোর বাবা যে আরও কি করবেন!

নিস্তব্ধ হয়ে থাকে মেয়ে। পুরনো দিনের মতো মমতা আবার ডাকেন: ছবু!

ছবি মায়ের মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, বলে: হয়তো যেতাম মা, আগে হলে। কিন্তু তুমি তো জান, মন আমি ঠিক করে ফেলেছি। এখন তো আর উপায় নেই···।

ভূত দেখার মতো মমতা চমকে আর্তনাদ করে ওঠেন চাপা গলায়: উপায় নেই তোর? মন ঠিক করে ফেলেছিস? হায় ভগবান, আমার কেন মরণ হয় না।

ছবি বলে: ছোটবেলায় তুমিই আমাকে লেখাপড়া শেখার জন্যে কত উৎসাহ দিয়েছ—সাহস দিয়েছ। আমাকে দিয়ে কি বড় কিছু ভাবতে পার না মা—বিয়ে ছাড়া?

: বিয়ে হলে তুই শান্তিতে থাকবি, সুখে থাকবি, এর চেয়ে বেশি কি ভাবে—মা তার মেয়ের জন্যে?

: সে সুখ-শান্তি কি জোর করে হয়? আরও বড় কিছু ভাব, মা। ভাব যে একদিন তোমার ছবু একটা মস্তবড় আদর্শের জন্যে প্রাণটাই দেবে।

: ও সব কথা বলিসনে ছবি,—মমতা যেন আর্তনাদ করে ওঠেন। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলেন: যা ইচ্ছে তোর তাই কর। আর আমি ভাববো না—তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে শেথল তুলে চলে যান।

উঠে বসেছিল, বসেই আছে ছবি। পূর্ণশশী একবার এসে হাত ধরে সেধেছেন ভাত খাবার জন্যে—যায়নি। বসে বসে সে সবায়ের পায়ের শব্দ পাচ্ছে।

বেলা ক্রমশ বেড়ে বেড়ে বিকেলের দিকে চলেছে। কারা দু'একবার দরজার কাছ দিয়ে ঘুরে গেল। শেকলে দু'একবার নাড়া পড়ে থেমে গেল একসময়।

হঠাৎ এক ঝলক আলো ঘরে ঢুকতে ছবি সোজা হয়ে বসে। অনেকক্ষণ পরে চোখে আলো লেগে জ্বালা করে চোখ।

দাদু এসেছেন, বাবা এসেছেন, ঠাকুমা আছেন সঙ্গে—নেই কেবল বড়কাকা। হয়তো ইচ্ছে করেই নেই।

কুলদা কোথা থেকে লিকলিকে একটা বেত যোগাড় করে এনেছেন—

গম্ভীর গলায় বলেন : যাও, খেয়ে তৈরি হওগে। সাজ-পোষাক নয়—কেবল কাপড়টা বদলে নেবে।

পূর্ণশশী তার মুখের দিকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছেন। দক্ষিণারঞ্জন বলেন : যাও, যা বলা হচ্ছে শোন।

ছবি এবার জ্বলে ওঠে : যাব না। কি করবেন আপনি?

: কি বল্‌লে?—দক্ষিণা কাঁপতে থাকেন রাগে :- তা যাবে কেন? যত চাষা-ভূষো, জেলে-কুমোর তোমার সঙ্গী। দেখ কুলদা, ওরই মধ্যে কাকে বুঝি বিয়ে করতে চান মেয়ে, ডেকে আন তাকে।...সব গেল আমার—এত বড় বংশের মুখে চুন-কালি পড়ল...।

কুলদা এগিয়ে এসে হঠাৎ চেপে ধরেন ছবির চুলের গোছা : যাবি নে?

না, না—

এবার বাতাসে কিসের একটা শব্দ হয় সপাং করে। সুখদার সবচেয়ে ছোট ছেলেটা হঠাৎ হাঁউমাউ করে কেঁদে ছুটে পালায় সেখান থেকে। শব্দ হয় আরও একটা। কুলদা চেঁচিয়ে বলেন : যাও, সেফুকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দাও গে। ও পাত্র আমি হাতছাড়া করবো না। ওরা যা টাকা চায় আমি দেব সেফুর জন্যে—যাও!

তারপর চুল ছেড়ে দিয়ে ধাক্কা দেন সামনের দিকে : যা, চলে যা এবাড়ি থেকে। লজ্জায় গাঁয়ে আমার মুখ দেখানোর যো নেই তোর জন্যে!

পূর্ণশশী আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে সরে গেছেন। কিন্তু সরস্বতী মমতাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে : না দিদি, আমি তা দেব না। ছবি মার খাবে আর সেফুকে ওরা দেখবে, সে আমার সহ্য হবে না।

মমতাকেই আবার বুঝিয়ে শান্ত করতে হয় তাকে।

ছবি তবু বসে থাকে ঘাড় বাঁকানো ঘোড়ার মতো। লজ্জা-অপমান কিছুই তার গায়ে লাগছে না, কেবল একটা নিঃশব্দ হাসি তার সারা মুখে ভেসে বেড়াচ্ছে আর হাতের যেখানটায় বেতের দাগ বসে গেছে সেখানটা জ্বালা করছে থেকে থেকে।

সব একে একে চলে গেছে। দক্ষিণা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেফুকে বার করে এনেছেন আর মমতা সেফুকে সাজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ছবির সামনে এসে সেফু একবার থমকে দাঁড়ায়, কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে

তার শরীর। তার মুখ দেখলে বোঝা যায় সে যেতে চায় না তবু যেতে হচ্ছে তাকে। মমতা বলেন: চোখের জল মুছে ফেল সেফু, ওকি। ওদের সামনে গিয়েও কাঁদবি নাকি? ছিঃ···।

কেউ নেই, কেবল সিঁড়ির ওপর আধো অন্ধকারে ভূতের মতো ছবি বসে থাকে। সে যেন আলাদা হয়ে গেছে এবাড়ির হৃদপিণ্ড থেকে। তার জাত আলাদা, চিন্তা আলাদা।

আরও একজন আছে। সে ছায়ার মতো পাশে এসে দাঁড়ায়, মৃদু গলায় ডাকে: ছবি।

বড়কাকা!

সুখদা আলগোছে তার মাথার ওপর হাত রেখে ডাকছেন: ছবু।

অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা এতক্ষণে ছবির বুক থেকে সশব্দে বেরিয়ে আসে। চোখ তুলে সে সব গ্লানিভোলা হাসি হাসে: বড়্‌কা?

সুখদা ব্যথিত গলায় বলেন: অমন করলি কেন রে? একবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই হোত?

: তাতো পারিনে বড়্‌কা।

: কেন রে? এত জোর করছিস! কাউকে কি কথা দিয়েছিস?

প্রত্যাশিত উওরের অপেক্ষায় চুপ করে থাকেন সুখদা—ছবি উত্তর দেয় না। অধীরের মতো সুখদার কাছে সে সহজ হতে পারছে না।

: বল না, লজ্জা কি? এত কাজ করে বেড়াস, লেখাপড়া শিখছিস—লজ্জা কি?

ফিস্ ফিস্ করে ছবি নামটা বলে।

একমুহূর্তে সুখদার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় সে কথা শুনে, তারপর সামলে নেন তিনি। খুশির হাসি হাসবার চেষ্টা করে বলেন: আমিও কিছুটা জানতাম। ছেলেটা ভাল কিন্তু ছবি—বড় কঠিন কাজ···। একটা কিন্তু ভাল দেখিয়েছিস তুই···অদ্ভুত। কোথায় রইল দুজনে দুদিকে কিন্তু মনের জোর!···এটা খুব ভাল। এরকম সবায়ের থাকে না···বেশ।

ঠাকুমার ঘর থেকে সেফুকে দেখানো শেষ করে আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। অনেকগুলো গলার শব্দ শুনে সুখদা নিঃশব্দ পায়ে সরে যান সেখান থেকে।

ঘরে ঢুকেই সেফু তার সিল্কের কাপড় খুলে ফেলে ছবিকে দুহাতে ধরে কাঁদে—লজ্জা আর আনন্দ মেশানো কান্না।

ছবি তার মুখটা তোলার চেষ্টা করে বলে: ওঠ না, কাঁদছিস কেন শুধু শুধু। রাজপুত্রের মতো বর হবে তোর। দেখবি বিয়ের দিন কি সুন্দর করে সাজিয়ে দেব তোকে।

অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহেই সেফুর বিয়ে হয়ে গেল। সাজানো সেফুকে বারে বারে দেখে ছবি অতৃপ্ত চোখে। মানুষের আর একটা সুন্দর রূপকে উপেক্ষা করা যায় না। সেফুর এই আশংকা-লজ্জা মেশানো থরোথরো চোখ, কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের সলজ্জ ভঙ্গি—এমন কখনও দেখেনি ছবি। কবে বিন্তিপিসিকে দেখেছিল বিয়ের কনে হিসেবে—তার কোথাও সুখ ছিল না, আনন্দ ছিল না।

সেই বিন্তিপিসিও এসেছে বিয়েতে। তার স্বামীর আগের দুটি ছেলে-মেয়ে ছাড়াও এই কবছরে বিন্তিপিসির নিজেরও হয়েছে আরও তিনটি। কঙ্কালের মতো রোগা হয়ে গেছে পিসি। একটা হাতকাটা সেমিজ আর আধময়লা শাড়ি পরনে। মাথার সামনের দিকের চুলগুলো সব গেছে উঠে—সেই চওড়া সিঁথিতে খুব টকটকে লাল, তেল-গোলা সিঁদুর পরা—কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তা। শুকনো হাড়সার মুখ, ঘামাচিভরা কপালে মস্ত এক সিঁদুরের ফোঁটা। পাঁচটা ছেলেমেয়ে পিসির পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল।

কোলের ছোট ছেলেটার গা ভরা ঘা—ন্যাড়ামাথা। সব ছেলেমেয়েগুলো রোগা রোগা—হাড় জিরজিরে চেহারা। সব মিলে যেন আর এক দুর্ভিক্ষের প্রতিমূর্তি হয়ে নামলো পিসি।

ছবি মমতাকে জিজ্ঞেস করেছিল: বিন্তিপিসির বয়স কত, মা?

: কত আর,—ভেবে জবাব দিয়েছিলেন মমতা: সুকুমারীর চেয়ে ও অনেক ছোট—পঁচিশও হয়নি এখনও। কি হয়েছে মেয়েটার দশা

দেখেছিস? কালো মেয়ের বিয়ে হয় না, বয়স বেড়ে যাচ্ছে বলে পাগলের মতো এক দোজবরের গলায় দিল ঝুলিয়ে—দেখেছিস শান্তি? অবস্থাও শুনছি খারাপ—ওরা সত্যি কথা বলেনি। সুকুমারীটাকে তবু যা হোক… সুখী হয়নি সে ওর ভাগ্য…যাকৃগে। কিন্তু,—হঠাৎ মমতার বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়েছিল: কিন্তু তোকে তো আমি সেরকম!…দেখে শুনে খুঁজে-পেতে……তুই সুখী হবি বলেই তো…তাও নিলিনে তুই! ছবি! মা হয়ে বলতে আমার বুক ফাটে কিন্তু তোর জীবন খুব দুঃখের হবে ছবি…আমার মনে হয়…কেন জানিনে…।

কথা শেষ করে মমতা আঁচলে চোখ মুছেছিলেন আর কেন কে জানে ছবিরও বুকের ভেতরটা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।

ছাদনাতলায় দাঁড়িয়েও সেই চেপে রাখা কান্নাটা ছবিকে বারে বারে অভিভূত করে ফেলছিল।

মমতা বলেন ছবিকে শুনিয়ে: কপাল! আমার কপাল! অনেক ভাগ্য করেছিল সেফুটা! যার কপালে যা।

যার কপালে যা। আমরা দুজনে দুজনের জন্যে—কে যেন একদিন বলেছিল কথাটা। তমাল! ছবির ঠোঁট কাঁপে থরথর করে, মনটা হাহাকার করে যে কেন! কতকাল অপেক্ষা করতে হবে তার জন্যে? কত কাল! ছবি পারবে তো? তমাল তো নেই—তাকে চোখে দেখতে পাচ্ছে না—কথা শুনছে না তবুও এক অদ্ভুত শক্তি পাচ্ছে সে মনে!

সে কি শুধুই তমাল! নাকি একটা অদৃশ্য প্রেরণা। ছবিকে টানছে সে আরও বড়র দিকে—মহতের দিকে। তমাল যদি সে পথ থেকে সরে যায় কোনোদিন! যদি সে দুর্বল হয়ে পড়ে—যদি বলে, ছবি, আর পারছিনে আমি!—তখন কি করবে ছবি?

ছাদনাতলায় মাথার ওপর তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে নিজের মনেই ছবি বলে: তবু চলবো।

পথ তো একটাই, পৌছতে পারা নিয়ে কথা। ক্লান্তি আসবে হয়তো, কষ্টও অনেক কিন্তু থামবিনে ছবি—অধীরকাকা বলে।

পেছন থেকে এসে ছবির পিঠে হাত রাখে বিস্তি। বলে: একা একা কি করছিস ছবি? সবাই যে ঘরে চলে গেছে।

ছবি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে।

: আমি সব শুনেছি ছবি !—বিস্তিপিসি গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর তার দুচোখ জলে ওঠে আগ্রহে: কি চাস রে তুই ? এর চেয়ে বেশি কি চায় মেয়েরা—সত্যি ভেবে পাইনে। দেখেছিস সেফুর বর—কি সুন্দর ! মেয়েটার কপালে সুখ হবে…নারে ?

কিন্তু তোর জীবন খুব দুঃখের হবে ছবি,—মমতার বলা কথাগুলো হঠাৎ কেন যেন মনে পড়ে যায় ছবির, বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে কিন্তু হাসিমুখে সে বলে: চল পিসি, সেফুকে দেখি আগে—দেখেছ কাণ্ড…আমি একাই কেবল…বিস্তিকে পেছনে ফেলে ছবি দৌড়য়।



ত্রিশ

দক্ষিণারঞ্জন এখনও শিরদাঁড়া শক্ত করে ঘুরে বেড়ানোর চেষ্টা করেন কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি যে কত দুর্বল হয়ে পড়েছেন সেটা বোঝা গেল সেদিন—যেদিন ছবির বদলে হাতজোড় করে নানা মিথ্যে কথা বলে সেফুকে দেখাতে হোল। সবাই চলে গেলে হঠাৎ জ্ঞান হারালেন তিনি।

ওরকম হয়েছিল আরও একটা দিন কিন্তু সেকথা কেউ জানতো না এক মানিক ছাড়া।

রিলিফ কিচেনে ছবিকে ফিরিয়ে আনতে গেলে—যাব না, বলে ঘাড় বাঁকিয়ে থাকলো মেয়ে। তাকেও হয়তো শায়েস্তা করতে পারতেন কিন্তু শশী মাঝির অপমান তিনি সহ্য করতে পারেননি, রাগে কাঁপতে কাঁপতে কেবল নৌকোয় উঠেছিলেন তিনি—তারপর কিছু মনে নেই।

মাণিক তাঁর মাথায় জল দিয়ে সুস্থ করে হাত ধরে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু সেকথা গোপন ছিল, সে লজ্জার কথা পূর্ণশশীকে পর্যন্ত বলেননি তিনি।

দ্বিতীয় দিনটায় সবাই দেখে ফেলেছে। ছেলেরা তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে—বাধা দেবার কিছু নেই।

শরীরের যন্ত্রণাকে সারাবে ওষুধ কিন্তু তাঁর মনের যন্ত্রণা!

সেফুর বিয়েটা পর্যন্ত তবু চেষ্টা করে সুস্থ রাখা গিয়েছিল তাঁকে কিন্তু আর গেল না।

খবরটা গোপন রাখবার যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু কেমন করে যেন কানে পৌঁছে গেছে দক্ষিণার, কুলদাকে এ্যারেস্ট করেছিল পুলিশ—আজ ছেড়েছে। কুলদার ধান-চাল সব আটক করেছে কৃষক-সমিতির লোকেরা। ধান-চালের ব্ল্যাকমার্কেটিং সম্প্রতি সুরু করেছিলেন

কুলদা, দক্ষিণারই আগ্রহে। সে আগ্রহটা এসেছিল রায়কর্তার কাছ থেকে। রায়কর্তার বড় ছেলে অনিলের সঙ্গে ভাগে কারবার—তিনিই ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

কুলদা ছাড়া পাবার পরে সমস্ত বাড়িটা যেন লজ্জার পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছে। কুলদা এসে সন্ধের অন্ধকারে সেই যে মাথা নিচু করে রোয়াকে বসেছিলেন হাজার ডাকাডাকিতেও তিনি ঘরে ওঠেননি।

দক্ষিণা লাঠি ভর দিয়ে উঠে এলেন ছেলেকে সান্ত্বনা দেবেন বলে—গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন অসহায় মানুষের মতো।

কুলদা বলছেন: ছিলাম ভালো, গ্যাও, এবার হোল আমার ব্যবসা। অতি লোভ করতে গিয়ে অনিলের চালাকিটাও ধরতে পারিনি আমি।

মমতা আজ শাশুড়ীর সামনে মাথায় ঘোমটা টানতেও ভুলে গেছেন। আজ কেন যেন স্বামীর লজ্জিত-অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর কান্না পাচ্ছে, কুলদার যন্ত্রণাটা খানিক তিনি অনুভব করতে পারছেন।

মমতা আস্তে আস্তে বলেন: ও ছাই, মুখের খাবার নিয়ে ব্যবসা তুমি আর কোরো না। ভাত খেতে যাই—ভাতের গ্রাস আমার গলা দিয়ে নামে না। শুনেছি ব্ল্যাকমার্কেট যারা করে তারা অমানুষ—মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে···ছিঃ। তুমি ছোট' ব্যবসাই কর, ওসব থাক রায়কর্তাদের জন্যে···।

দিশেহারার মতো কুলদা বলে ওঠেন: আমি কি চেয়েছিলাম করতে? অত সাহস আমার নেই—উনি, আমার বাবাই তো ধরালেন এ ব্যবসা। টাকার লোভে আমিও ভুললাম। ওঁরই জন্যে···।

শুনে কাঁপতে কাঁপতে সেই যে বিছানায় এসে শুয়েছেন আর ওঠেননি দক্ষিণা। উঠবেন না, তাও যেন বুঝে ফেলেছে সবাই। একটা পঁচাত্তর বছরের দাপট আর অহংকার, একটা যুগ শেষ হতে চলেছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। বাড়িতে সবাই যেন সেই সম্ভাবনায় স্তব্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ।

কত কি তো বলবার থাকে মৃত্যুপথ-যাত্রী-মানুষের। দক্ষিণার যেন সব ফুরিয়েছে। তিনি নির্বাক।

ছবি কি করবে ভেবে পায় না। সবাই রোগীর ঘরে যায়, সে দরজার বাইরে থেকে দেখে চলে আসে। এবাড়ির বুকে অপমান,

অসম্মানের বোঝা খানিকটা সেও চাপিয়ে দিয়েছে—তার নামও তাই নাকি সহ্য করতে পারেন না দক্ষিণা।

চোখ বুজে থাকেন, চোখের কোল বেয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে কখন অজ্ঞাতে। দুর্বল হাতে দক্ষিণা মুছে ফেলেন তা।

কথা বলে না মানুষটা। কুলদা, সুখদা, পূর্ণশশী মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েন : কিছু বলতে চান? কাউকে লেখাপড়া করে দেবেন কিছু?

নিঃশব্দে মাথা নাড়েন। কি আছে তাঁর যে দেবেন! জমি নেই। মামলা করে, ফন্দি করে, হিসেব খতিয়ান দেখিয়ে ওই বড় রায় তা দখল করেছে—জীর্ণ করেছে নিজের উদরে। কখনও গায়ের জোরে—কখনও হাসিমুখে নিয়েছে। নিয়ে আবার দয়া দেখাতে এসেছে—দুর্বলের ওপর সবলের দয়া! আর শেষ চালটাও রায়েরা ভালই দিয়েছে—টাকার লোভ দেখিয়ে চাল-কাপড়ের কারবার ধরিয়েছিল ভাগে। সেখানেও চালাকি! সেখানেও হেরে গেলেন দক্ষিণা।

এখন আর কিছু নেই তাঁর—জমি নেই, জমা নেই, টাকা-পয়সা নেই। ছিল কেবল একটা জিনিস। কিন্তু সেটাতেও ফাটল ধরেছে। ফাটল ধরেছে এ বংশের দাপটে—দক্ষিণার হুংকারকে অগ্রাহ্য করার সাহস এসেছে এ বংশে।

মাঝে মাঝে বিড় বিড় করেন আপন মনেই। পূর্ণশশী ঝুঁকে পড়ে শোনার চেষ্টা করেন কিন্তু বোঝা যায় না। কোনো ইচ্ছে নয়—শেষের দিনের জন্যে আক্ষেপ নয়। অন্য কথা! ভাল বোঝা যায় না—অসংলগ্ন কথার টুকরো : সব ভেঙে গেল! কিছু রইল না···কিছু না।

অনেক কষ্ট পেয়ে সরস্বতীর এক মেয়ে হয়েছে।

পূর্ণশশী এসে বলেন : নাতনী হয়েছে তোমার! সুখদার মেয়ে!

: মেয়ে!—বিকৃতমুখে আবার চোখ বোজেন দক্ষিণা। আস্তে আস্তে বলেন : মেরে ফেলগে যাও। বাড়তে দিও না—বুঝলে?

পূর্ণশশী রাগ করেন সে কথা শুনে : কথা শোন একবার—মেরে ফেলবে কোন্ দুঃখে? আহা!

ছবি যখন বাড়ি ঢোকে ততক্ষণে নবজাতকের কান্না ছড়িয়ে পড়েছে

সারা বাড়িময়। অনেক কালের পুরনো বাড়িটার পাঁজরে পাঁজরে কচি গলার কান্না যেন নাড়া দিয়ে দিয়ে ফিরছে। ঢুকেই একটু থমকে থেকে হাসিমুখে ছবি ছুটে গেল খড়ের ছোট ঘরখানার কাছে! বাচ্চা হাত-পা ছুঁড়ে কাকীমার কোলের কাছে শুয়ে কাঁদছে। হাসিমুখে ছবি বলে: বোন্, কাকীমা?

ছবির খুশি মুখের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত মুখে সরস্বতীও বুঝি একটু হাসবার চেষ্টা করেন: কি দেখছিস রে ছবু, অমন হাঁ করে।

ছবি বলে: দেখছি বোন্‌টাকে—কি দস্যি মেয়ে দেখেছ, এখুনি এত হাত-পা ছুঁড়ছে? ও তোমাকে বড় হয়ে আমার মতোই জ্বালাবে কাকীমা—দেখো তুমি,—কথা শেষ করে দুষ্টুমিভরা হাসি হাসতে থাকে ছবি।

কিন্তু সরস্বতী আর হাসে না, কি এক ভাবনায় তার ক্লান্ত মুখ আরও বিষণ্ণ দেখায়। গম্ভীর হয়ে আস্তে আস্তে বলে: কোলে নিলে চান করতে হবে তোকে এই অবেলায়, নইলে তোর কোলেই ওকে প্রথম তুলে দিতাম ছবু।...জ্বালাবে বলছিস—গভীর দৃষ্টিতে ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে সরস্বতী হঠাৎ এক অদ্ভুত কথা বলে: ও যেন তোর মতোই হয় ছবু... তোকে তো কেউ দেখতে পারে না...কিন্তু তুই জানিসনে ছবু...।—ছলছলে চোখে অসমাপ্ত কথার মাঝেই চুপ করে যায় কখন একসময় সরস্বতী। আর ছবির মুখে ফুটে ওঠে লজ্জার হাসি: যাও, কি যে বলো তুমি? আমি কি...আমাকে নিয়ে তো এবাড়িতে...তুমি যে কি কাকীমা!

কিন্তু সরস্বতীর এও এক নতুন রূপ। মাকে চেনে ছবি—কাকীমাকেও আজ চিনল। তার চোখ ছলছলে হয়ে ওঠে।

আজকাল জল শুকিয়ে গেছে কিন্তু কাদা শুকোয়নি। সেই এক হাঁটু কাদা ভেঙে সুখদার ছোটো ছেলে ওয়ার্ক হাউসে এসেছে দৌড়ে: শিগগির চল বড়দি! দাদু যে মরে যাচ্ছে!

: মরে যাচ্ছে ! সেকি রে ! হঠাৎ কি হোল ?

কাজ ফেলে রেখে ছবি ছোটে প্রাণপণে।

দক্ষিণাকে ততক্ষণে উঠোনে বার করা হয়েছে, ঘরে রাখতে নেই এ সময়। খোলা আকাশের নিচে শান্তি পেতে দিতে হয় মুমূর্ষুকে। কানের কাছে গীতাপাঠ করছে হারাণ ঠাকুর।

চোখ দুটো বিস্ফারিত, ঠোঁট তখনও কাঁপছে মৃদু মৃদু। মা, বাবা, বড়কা সবাই মাথার কাছে বসে নিঃশব্দে কাঁদছেন—কেবল পূর্ণশশী পায়ের কাছে মাথা রেখে পড়ে আছেন। তখনও পাকা চুলের মধ্যে সিঁদুরের জ্বলজ্বলে রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঠাকুমার।

ধীরে ধীরে কখন একসময় ঠোঁঠের কম্পনও থেমে এসেছে। চোখের খোলা পাতা দুটো বন্ধ করে দিয়ে কুলদা চোখের জল ফেলতে থাকেন মুখ ফিরিয়ে। দক্ষিণার বন্ধ করা চোখের কোল বেয়ে একরাশ জমানো জল গড়িয়ে পড়ে শুধু।

পূর্ণশশী এবার মুখ তুলে তাকান। খানিক তাকিয়ে থাকেন নিষ্প্রভ, প্রাণের-চিহ্নহীন মুখখানার দিকে—তাকিয়ে দেখে, বুঝেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। কিন্তু সে একটা মুহূর্ত মাত্র—তারপরই অসহ্য চিৎকারে ফেটে পড়ে মাটিতে মাথা কুটতে থাকেন তিনি : ষাট বছর ধরে খুব সুখ দিয়েছিলে আমাকে, আজ সে সুখের ভারা পূর্ণ করে গেলে··· তাঁর দীর্ঘ বিলাপ ভরা কান্না সারা বাড়িটায় যেন প্রতিধ্বনি তুলে তুলে ফিরতে থাকে।

বাড়ি ভরে গেছে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীতে। তখনও দক্ষিণার নিষ্প্রভ দীর্ঘ চেহারাটায় ঢাকা দেওয়া হয়নি—অনাবৃত হয়ে পড়ে আছে খোলা আকাশের নিচে। স্তিমিত চোখদুটো দিয়ে যেন শেষ দেখা দেখে নিচ্ছেন আজন্মের আবাসকে। এই তাঁর সাতপুরুষের ভিটে—এবাড়ি ছেড়ে তিনি কোথাও যাননি, এ গ্রাম ছেড়ে অন্য কোনো জীবন চোখেও দেখেননি তাঁর পঁচাত্তর বছরের জীবনে। জমিদারীর দাপটের মধ্যে পঁচাত্তর বছর আগে শঙ্খরবে জন্ম ঘোষণা করেছিল যে প্রাণ—তাকেই আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। হেরে গিয়েও স্বীকার করেননি। ভেঙে যাচ্ছে বুঝতে পেরেও মেনে নেননি।

কে যেন বলে: ঢেকে দাও কুলদা। অমন করে খোলা রাখতে নেই।

এতক্ষণ কাঁদেনি ছবি। আড়ষ্ট সজল চোখে দক্ষিণার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল পুরনো কথা, এবার ঢাকা দেহটা দেখে হঠাৎ সে কেঁদে ফেলে।

পূর্ণশশীর হাতের শাঁখা ভাঙতে কাউকে লাগে না। তিনি নিজেই তা ভেঙে ফেলেন—একখণ্ড পাথরের ঘা দিয়ে দিয়ে। ঘসে ঘসে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেন নিজেই, হাত বাড়িয়ে থানখানা টেনে নেন। তবু ঠাকুমার থান-পরা নিরাভরণা মূর্তি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না চোখে দেখেও।

চৌষট্টি বছর ধরে যে মানুষ একভাবে চলে এসেছে তার সখ-সুখ-ইচ্ছেগুলো এমন করে শেষ হয়ে যায় একটা মুহূর্তের পরেই?

ইচ্ছে থাকলে হোক। কিন্তু ইচ্ছে না থাকলে? দুর্গার তো ইচ্ছে নেই। তার যে জীবনের এখনও অনেক সাধ! সে বাঁচতে চায়, সাজতে চায়। স্বামীকে পেয়ে সে খুশি হয়েছিল কিন্তু সে খুশিটুকু তার মাঝপথ থেকে চুরি হয়ে গেছে বলেই কি মনে ওর অত জ্বালা। ঠাকুমার বলি-রেখাঙ্কিত মুখে কি দুর্গার ভবিষ্যৎ আঁকা আছে?

ভাবতে গিয়ে ছবি শিউরে ওঠে। শুধু কি দুর্গা! কি হবে বিধবা হয়েও ভালোবাসার সাহস নিয়ে ঘুরে বেড়ানো বেহায়া মায়াদির?

দুর্গা তাকে বলে, তুই ঠিক বড় হবি ছবি···আমার মনে হয়।

কে জানে ছবি বড় হবে কিনা। কিন্তু দুর্গা যেন পথ পায়, যেন পথ পায় মায়াদি! সেদিন যেন আসে যেদিন এ সব দুঃখ-কষ্ট কিছু থাকবে না। ঠাকুমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছবি মনে মনে সেই কামনাই করে।

একত্রিশ



এবার পৌষের ফসল উঠলো না কারো ঘরে—ওয়ার্ক হাউসের অঙ্গনে বসে সজল চোখে মানুষগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। রিক্ত শূন্য মাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে কখন যেন চোখ মুছে ফেলেছে, আবার প্রস্তুত হচ্ছে নতুন করে।

ওয়ার্ক হাউসটা উঠে যাবার নোটিশ এসেছে—ছবি সেটা হাতে করে চুপ করে বসেছিল। ওরা শুনেছে সে খবর, শুনে বিষাদ-ম্লান হাসি হেসেছে। ওরা নিজেরাও উঠে দাঁড়াতে চায় এবার—এ দান নেবার লজ্জা শেষ হলে বাচে। গুদামে জমানো হাজার হাজার মন চাল ওরা দেখেছে—চেয়ে চেয়ে তার সামনেই কুঁকড়ে মরেছে তবু লুট করেনি—ছিনিয়ে নেয়নি। তারা জানে এ দান নেওয়ার দুঃখ—ঘেন্নার খাওয়া। তবু বাঁচিয়ে রেখেছে প্রাণটাকে। চোখের জল মুছে বাজরার খিচুড়ি খেয়েছে কেবল সামনের দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে। আশা করেছে একদিন আবার হাসবে তারা, লাঙ্গল চালাবে, ফিরে দাঁড়াবে একজোট হয়ে। সেকথা বলে হামিদ আর নগরবাঁশী: সেইজন্যিই গেরাম ছাড়ি নাই। না খাত্তি পায়ে বউ-ছেলে-মেয়ে শুকোয়ে গেছে তবু বাঁচার চেষ্টায় ঘুরিছি—হাত পাতে খিচুড়ি নিছি। সে তো এই দিনের জন্যি। জানতাম, একদিন পথ পাবোই।

আরও কটা দিন থাকলে হোত এ ব্যবস্থাটা কিন্তু সরকারী নির্দেশ আর সাহায্য আসবে না। দাবি করে করানো গিয়েছিল যা, তাই বলে আবেদন নিবেদন করে সমিতি কিছু করবে না।

ওরা ঘুরছে-ফিরছে কাজ করছে, কেবল ছবির মনটা কেমন করতে থাকে সকাল থেকে—সমস্ত কলরবের মধ্যে সে-ই কেবল নিস্তব্ধ।

খুব মৃদুপায়ে ধীরেন এসে দাঁড়ায় সামনে—তার মুখের দিকে তাকিয়ে এক অনির্দেশ্য আশঙ্কায় ছবির বুকের ভেতরটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে ওঠে: কি হয়েছে ধীরেন কাকা? আবার কি খবর এল?

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁপা গলায় ধীরেন বলে : অধীরদাকে আর রাখা গেল না ছবি—শেষ দেখা দেখে এস একবার।

: কি !—তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রেতিনীর মতো চিৎকার করে ওঠে ছবি : আমি যে পর্শুও দেখে এসেছি—কাকা আমার সঙ্গে কত গল্প করল। তমালের চিঠি আসবে স্যানাটোরিয়ামের ব্যবস্থা করে···ধীরেন কাকা ?

: তমালের চিঠিও এসেছে ছবি। লিখেছে কোনমতে কোলকাতায় পৌছে দিলেই আর সব ব্যবস্থার ভার ওরা নেবে···কিন্তু এ অসুখ···ছবি, কাঁদিস নে।

ছবি বলে : আজকাল কাকার কাছে ভাল করে গিয়ে বসতেও পারতাম না—জানতাম আপনারা আছেন। পর্শু গেলাম ··কত গল্প···আমার পড়াশোনা···ভবিষ্যৎ। কিন্তু কাকার কি হোল ?

ছবি চোখের জল মুছতে মুছতে ছোটে। দাদুর মরে যাবার খবর শুনে সে দুঃখিত হয়ে ছুটেছিল সেদিন—আজ সে আতঙ্কিত হয়ে ছোটে। কাকা, অধীরকা ! ছবির জীবনের শ্রদ্ধা, বিস্ময় আর সাহস আজ মরে যাচ্ছে ! নিভে যাচ্ছে একটা আগুন—চলে যাচ্ছে একটা অমূল্য জীবন !

অন্যদিনের নিস্তব্ধ হয়ে থাকা ঘরখানা আজ ভরে উঠেছে লোকজনে। কুলদা এসেছেন, সুখদা এসেছেন, ছবিদের বাড়ির সবাই। নতুন দিদিমাকে কারা যেন ধরে রেখেছে তাঁর মাথা কোটা বন্ধ করবার জন্যে। এর মধ্যেই কপালটা তিনি ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত করে ফেলেছেন।

সবাই কাঁদছে নিঃশব্দে—কেবল কাঁদছে না একজন, সে মায়া। নিস্তব্ধ তৎপরতায় সে অধীরের মুখের উঠে আসা রক্ত মুছিয়ে দিচ্ছে, ঠোঁটের ফাঁকে ওষুধ দিচ্ছে। কখন এসে সে তার জায়গা বেছে নিয়েছে সে নিজেও বুঝি তা জানে না। সবাই বিস্মিত চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে—কিন্তু তার আজ লজ্জা কিসের ! মাথার ওপর একটুখানি ঘোমটা টেনে দিয়ে নির্বাক হয়ে কাজ করে যাচ্ছে সে। মাঝে মাঝে কেবল শিউরে উঠে তাকাচ্ছে অধীরের বারে বারে বুজে আসা চোখের দিকে—। যেন ওর শেষ হয়ে আসা প্রাণটাকে শেষ শক্তি দিয়ে আটকে রাখবে সে।

ছবি ঢুকেছে ঝড়ের মতো। সে অধীরের মুখের ওপর অপলক চোখে তাকিয়ে ডাকে : কাকা !

আর একবার রক্ত উঠে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসে অধীরের। ছবি তার একখানা হাত সজোরে আঁকড়ে ধরে কাঁদে: এত তাড়াতাড়ি? কাকা? তমাল যে চিঠি দিয়েছে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। আমার কি হবে কাকা?

অধীর হাসবার চেষ্টা করে রক্তাক্ত ঠোঁটে। দম নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলে: তোর সত্যিকার লড়াই এখনও বাকি···ছবি। সে জগতটা কঠিন! ···ওরা কই?

ধীরেন, অরুণ, প্রসন্ন জল-ভরা চোখ নিয়ে ঝুঁকে পড়ে মুখের ওপর।

অধীর বলে মায়াকে দেখিয়ে: এই মেয়েটাকে দেখো ধীরেন—আমার মা, বাবা, সমিতি—তোমাদের।···দেখো। ভয় পেও না—ভয় পাসনে ছবি।

ছবি মনে মনে বলে, ভয় পাব না, আমি ভয় পাব না।

আবার রক্ত উঠেছে, নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে তবু ফিস্‌ফিস্ করে অধীর বলে: বড় কষ্ট—জীবনটাই কষ্টের। তোরা কষ্ট পাসনে···তোরা,—মায়ার মুখের দিকে তার দুচোখ স্থির অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ওষুধ দিতে গিয়ে মায়া হঠাৎ চমকে ওঠে, তারপর তীক্ষ্ণ চিৎকারে সে লুটিয়ে পড়ে অধীরের বুকের ওপর। আবার সে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দেখতে থাকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তার দুচোখ শুকনো—কেবল ঠোঁট দুখানা থরথর করে কাঁপছে, কাঁদতে পারছে না মায়া।

নতুন দিদিমা আর মাথা কুটছেন না, মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদছেন। ছবি কাছে যেতে বলেন: ওকে শেষের দিনগুলোয় ভাল করে খেতে পর্যন্ত দিতে পারিনি ছবি। আমার একটা মাত্র ছেলে, খ্যাপা সন্ন্যাসী হয়ে গেল—তাই বলেও দুঃখ করিনি। কিন্তু ও কেন বেঁচে থাকলো না?

সব মানুষকে সুখী করার স্বপ্ন দেখতো যে মানুষ, স্বচ্ছল জীবনের কামনা ছিল যার মনে সে মরে গেছে খেটে খেটে, না খেয়ে—বিনা চিকিৎসায়।

বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যায়, ছবি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ছাদের এক কোণে। কান্নার শব্দ সে সহ্য করতে পারছে না—এত দুঃখ অসহ্য!

অরুণ এসে পাশে দাঁড়িয়ে বলে: সব গাঁয়ে গাঁয়ে খবর চলে গেছে এরই মধ্যে—দেখেছিস ছবি ?

ছবি দেখছে অজস্র মানুষ। অনেক দূর থেকে, কাছ থেকে দলে দলে মানুষ আসছে।

অরুণ বলে: ওরা অধীরদাকে শেষ সম্মান দেখাতে চায়—কৃষক-সমিতির নিশান নিয়ে আসছে দেখছিস নে ? অধীরদার নিজের হাতে গড়া সমিতি।

রায়কর্তা এসেছেন—গ্রামের আরও কয়েকজন প্রৌঢ় আছেন—তাঁরা হরিনন্দনকে ঘিরে বসে আছেন।

তাঁরা প্রস্তাব শুনে বিস্মিত চোখে হরিনন্দনের মুখের দিকে তাকান: বামুনের ছেলে! প্রায়শ্চিত্ত হোক—তারপর কাঁধ দেবে যারা দেয়। ওই ছোটলোকগুলো নিয়ে যাবে—সে কি ? মরা মানুষ নিয়ে আবার মিছিল কি!

কিন্তু সে আপত্তি টেকেনি। অসহ্য যন্ত্রণায় হরিনন্দনের বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু তিনি চোখের জল ফেলেননি একফোঁটা। কেবল ভাঙা ভাঙা আর্তস্বরে কখন একসময় বলে ফেলেছেন: নিয়ে যাক—ওরাই নিয়ে যাক! ও যাদের—তাদের হাতেই ছেড়ে দেব আমি ওকে। ও তো আমাদের নয়, আমাদের কথা কি ভেবেছে কোনদিন! —বলে এতক্ষণের উচ্ছ্বসিত কান্না চেপে সেই যে তিনি উঠে গেছেন আর এসে বসেননি এই সমাজপতিদের সভায়। তারপর কোথা দিয়ে কেমন্ করে কারা যেন সব ব্যবস্থা করেছে। ফুল এসেছে, মালা এসেছে, ছোট ছোট নিশান এসেছে—পরম যত্নে ওরা দেহটাকে সাজিয়েছে সারা দিন ধরে, নিয়ে চলেছে।

শ'য়ে শ'য়ে খালি গা, খালি পায়ের কালো কালো মানুষ—যারা খাজনা মকুবের জন্যে কোনোদিন কেঁদে গেছে রায়কর্তার বৈঠকখানায়, ধানের সব-ভাগ দিতে না চেয়ে পায়ে ধরেছে—সেই মানুষগুলোই অসমসাহসী হয়ে উঠেছে কবে যেন।

রায়কর্তা বিকৃত চোখে তাকিয়ে থাকেন—তাঁদের ঘরের ছেলে, কঠিন অসুখে মরেছে। প্রায়শ্চিত্ত হোল না পুরুত ডেকে, ব্রাহ্মণের আগুনে গতি হোল না, ওই ছোটলোকগুলো নিয়ে চলল ঘাড়ে করে।

মানুষগুলো চলেছে নিঃশব্দে। পুরুষরা গামছার খুঁটে চোখ মুছছে—মেয়েরা অনেকে শব্দ করে কাঁদছে। ওদের মধ্যে অনেকে অধীরকে দেখেছে, অনেকে দেখেনি। তবু কাঁদছে। শুনে কাঁদছে, কান্না দেখে কাঁদছে।

মমতা, পূর্ণশশী এসে বসেছিলেন আমতলায়। ওই পথ দিয়ে চলে গেছে মিছিলটা। পূর্ণশশী কিছুদিনের মধ্যে একেবারে বুড়িয়ে গেছেন, সোজা হয়ে হাঁটতে পর্যন্ত পারেন না। চোখের দৃষ্টি কমে গেছে—তবু চোখের ওপর হাত রেখে তাকিয়ে থাকেন তিনি চলে যাওয়া সারিটার দিকে; কত মানুষ হয়েছে দেখেন। ছেলেটাকে কোনোদিন ভাল-চোখে দেখেননি তিনি। হরিনন্দন আর তার বউকে করুণার চোখে দেখেছেন, ভেবেছেন, একটা ছেলে তাও মানুষ হোল না—পাগল, বাউণ্ডুলে। কিন্তু আজ আর সে কথা মনে হচ্ছে না। তাঁরও তো বড় বড় ছেলেরা মারা গিয়েছে—সেদিন স্বামী মারা গেলেন। কই এমন করে মানুষ এসে তো কাঁদেনি—সম্মান দেখায়নি। কেমন করে হোল! একটা মানুষের জন্যে এতগুলো মানুষ কাঁদে—কেমন করে!

বেলাশেষের স্তব্ধ শ্মশানটায় কয়েকশো জোড়া চোখ নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে দেহটার দিকে। ফুলে-চন্দনে-নিশানে সাজানো এক কাজ-পাগল মানুষের নিস্তব্ধ দেহ।

তারপরের সেই যন্ত্রণাভরা মুহূর্ত এল—কেউ যেতে চায় না এগিয়ে, সবাই কাঁদে।

শেষ হোল তাও। একটা শরীরকে ঢেকে দিল আগুনের লকলকে শিখা। ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগলো আকাশে। আগুনের আভা কালো কালো হাড়-সার মানুষগুলোর মুখে পড়েছে—চোখে পড়েছে—আলো হয়ে উঠেছে আসন্ন সন্ধ্যার বুক।

ছবি ছটফট করে সেখান থেকে চলে আসে। মায়াকে ঘিরে বসে আছে হরিদাসী, ফুলমণি আর বাতাসী। ছবি বলে যন্ত্রণাকাতর গলায়: চল মায়াদি—আর সহ্য করতে পারছিনে।

মায়া বলে: কোথায় যাব, ছবি?

: বাড়ি যাবে না?

খুব শান্তস্বরে মায়া বলে: ওখানে আর ফিরবো না, ছবি। আমি

হরিদাসীদের গাঁয়ে চলে যাব—ওরা আমাকে থাকবার জায়গা দেবে। ওদের লেখাপড়া শেখাবো যতটুকু পারি, ওদের ছেলেমেয়েরা আছে তারপরেও।

ছবি অবাক হয়ে মায়ার মুখের দিকে তাকায়: সে কি তুমি পারবে মায়াদি—ওদের মধ্যে?

মায়া ম্লান হেসে ছবির সব সংশয়কে উড়িয়ে দেয়: হয়তো কষ্ট হবে কিন্তু আমার মামার বাড়ির কষ্টের চেয়ে—অধীরদা ছাড়া জীবনের চেয়েও সে কি বেশি কষ্টের, ছবি?

ছবি ধীরেনের কাছে যায়। ধীরেন বলে: যাচ্ছে বাধা দিস্‌নে ছবি। আমরা রইলাম, ওর ভার নেব। মনে হয় পারবে।

যাবার সময় ছবির হাত ধরে মায়া কাঁদে আবার: ভালোবেসে না পাওয়া একটা পাপ, ছবি। আমার মতো দুঃখ যেন কেউ না পায় কোনোদিন—দেখিস তোরা।

বত্রিশ



মানুষের জীবনে দুঃখ আসে, দুর্বিপাক আসে কিন্তু স্থায়ী হয় না—সংসারেও নয়, বাইরের জগতেও নয়—এটাই যা সান্ত্বনা।

দুর্বিপাক শুরু হয়েছিল। ভেঙে তছনছ করে দিয়ে গেছে গ্রামকে গ্রাম, হাজার হাজার মানুষের সুখ-দুঃখ দিয়ে ঘেরা সংসারগুলোকে, কিন্তু সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি সব। সেই মানুষগুলোই আবার তুলেছে মাথা। ভেজা ভেজা মাটিতে নেমেছে আবার হাড়-সার গরু আর মরচে পড়া লাঙল নিয়েই। হারিয়ে-যাওয়া, পালিয়ে-যাওয়া মানুষগুলো কতক ফিরেছে—কতক ফেরেনি। তবু তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই। এক হাতে চোখের জল মোছে, আর এক হাতে মাটি গুঁড়ো করে তারা। ঘরে ফিরে এসেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না—একজন আর একজনের গলা জড়িয়ে কাঁদে। এখনও মাথার ওপর দিয়ে শব্দ করে উড়ে যায় এরোপ্লেন—ম্লান হাসি ঠোঁটে ফুটতে গিয়ে আবার মিলিয়ে যায়! যুদ্ধ যে থামেনি এখনও! এখনও শেষ হয়নি এ পোড়াকপালে দিনগুলোর!

তবু মিছিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে গাঁ থেকে গাঁয়ে মানুষের দল। সাহস দেয় এক গাঁয়ের লোক আর এক গাঁয়ের লোককে। ওদের সঙ্গে ঘুরেছে ছবিও—সেও হেসেছে, কেঁদেছে। ওরা বলেছে, ভয় নেই ভাই—আর যুদ্ধ বাধাতে দেব না আমরা—আর মরবো না।

সেও মনে মনে বলেছে, ভয় নেই—ভয় নেই।

ছাদের উপর দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় সে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে দূর-দূর গ্রামগুলোর দিকে পরম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। অস্পষ্ট দেখা যায় ঘুরে-ফিরে বেড়ানো মানুষগুলোকে। মাথায় টোকা-পরা, তামাটে মুখগুলোকে দেখা যায় না—কর্মব্যস্ত কালো হাত চোখে পড়ে না কিন্তু ওদের নতুন করে বেঁচে ওঠার আনন্দটা যেন অনুভব করা যায়, ওদের গলার নতুন সুরটা কানে লাগে। দূর-দূরান্তর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে বাতাসে প্রতিরোধের

ভাষা, প্রতিজ্ঞার সুর। আবার না-মরবার, বেঁচে থাকবার প্রতিজ্ঞার গান গায় ওরা। ছবি তা কান পেতে শোনে ছাদে দাঁড়িয়ে।

সদর দরজা দিয়ে সুখদা ঢোকেন খুশিমুখে। চেঁচিয়ে বাড়িটা ফাটিয়ে দিতে পারলে যেন শান্ত পান এত জোরে বলেন : ছবি পাস করেছে বৌদি।

রান্নাঘরের বারান্দা থেকে মমতা প্রায় দৌড়ে এসে রুদ্ধশ্বাসে বলেন : আর পণ্টু ?

: পণ্টুও করেছে, ছবি ভালভাবে পাস করেছে।

আনন্দে ছবির হঠাৎ চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়—তমালের সঙ্গে দেখা হবার আনন্দটা প্রথমেই তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। গত একমাসের মধ্যে তমালের কাছ থেকে কোনো চিঠি পায়নি সে—কেন, কে জানে !

—মানুষের ওপর বিশ্বাস না হারানো পর্যন্ত তোমাকে আমি ভুলবো না ছবি। আমরা এক, আমরা অভিন্ন,—তমাল বলেছিল।

তেমনিই আছে তো সে ? শহরের রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়ায় গিয়ে, স্বার্থপর বিচিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে যদি সে ভুলে গিয়ে থাকে ছবিকে ! ভুলে গিয়ে থাকে তার প্রতিজ্ঞা ? তা হলে ! ভাবতে গিয়ে ছবি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। ভাঙা বাড়ির আড়াল ছেড়ে-যে অগ্নিগোলক সরতে সরতে এসে তার মুখের ওপর আলো ফেলেছে, যাকে দেখবার জন্যে খুব ছোটবেলায় সে পালিয়ে আসতো ছাদে—সেদিকে তাকায়। ওখান থেকেই তো প্রাণরস সঞ্চারিত হয় প্রতিটি লতায়-পাতায়, প্রাণীর প্রাণকোষে ওই তো সবিতা ! ওর গতি কি রুদ্ধ হয় ! ও কি আলো থেকে বঞ্চিত করে কাউকে !

মনে মনে আবৃত্তি করে সে,

আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে তোমারে ঘেরে যেন।

ছবি কাউকে বাঁধবে না জোর করে। সে যেন পথের বাধা না হয়, নিজেও যেন মুক্ত থাকে সমস্ত আবিলতা থেকে।

নিচে থেকে সুখদা ডাকেন চেঁচিয়ে : ছবি ! ছবি কই ?

চোখ মুছে নিচে নেমে আসে ছবি।

কতবার যে পিসিমা আর পিসেমশাই-এর কথা মনে পড়ছে! কোথায় চলে গেছেন আজ পিসেমশাই—আর কোনোদিন ছবি দেখতে পাবে না তাঁকে!

বোমা পড়েছিল—শহর খালি হয়ে গিয়েছিল তবু পিসেমশাই আসতে চাননি—তখনও আশা ফুরোয়নি তাঁর। কিন্তু যেদিন বোমার আগুন দোকানটাকেই শেষ করে দিল সেদিন হতাশ্বাসে চলে আসতে হয়েছিল তাঁর পৈতৃক ভিটে নবদ্বীপে। ভেঙে পড়া বাড়িটাকে সংস্কার করিয়ে বাস করার ব্যবস্থা করতে করতেই একদিন সামান্য জ্বরে হার্টফেল করলেন হঠাৎ। পিসেমশাই মারা যাবার পর মারা যায় পিলুর ভাইটা—এখন পিসিমা একা আছেন পিলুকে নিয়ে। নবদ্বীপের বাড়িটার ভাড়া আর পিসেমশাই-এর ইনস্যুরেন্সের কিছু টাকা এখন পিসিমার ভরসা।

ছবির পাস করার খবর পেয়ে সুকুমারী লিখেছে···'আমার ক্ষমতা থাকলে তোকে আমার কাছেই রেখে পড়াতাম কিন্তু তুই তো জানিস কি দশা আমার। এ যুদ্ধ আমার সব শেষ করেছে। শেষ বয়সে আমাকে এখন দাদাদের গলগ্রহ না হতে হয় সেটাই শুধু ভাবনা····।'

শেষ বয়সের কথা বলছে পিসিমা এখনই। তার কৈশোর, তার যৌবন সব মিথ্যে হয়ে গিয়ে শেষ বয়সটাই যেন একমাত্র সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে! আঃ পৃথিবীতে এত দুঃখ কেন জমানো থাকে মানুষের জন্যে! ছবির সাধ্য কি সে যন্ত্রণার পাথরটাকে সরায়। কেবলই কেন যে কান্না পায়! পাস করার খবরটা পাবার পরেও কেন যে উদ্দাম আনন্দ হয় না!

পল্টু পড়বে না—সে ব্যবসা করবে। শুনে কুলদা তার পিঠ চাপড়ে হাসেন: তুই-ই আমার মুখ রাখবি, পল্টু। আমার কষ্টটা বুঝলি—আরগুলো তো সব···।

কিন্তু ছবির কি হবে?

সে ভার কবে যেন মমতাই নিয়ে রেখেছেন, কেউ জানতো না। তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাই সন্তোষদা আছেন—তাঁর বাড়িতে থেকে ছবি পড়বে, মমতা চিঠি লিখে ঠিক করে রেখেছেন।

ছবি মাকে জড়িয়ে ধরে খুশিতে কি করবে ভেবে পায় না, বলে : তুমি যে আমার মা · লক্ষ্মী মা। নইলে আমার পড়াই হোত না…থুবড়ি হয়ে তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতাম কেবল।

মমতা বলেন : কি করবো, দস্যি মেয়ে, জেদী মেয়ে—যেমন করেই হোক তুমিই একটা কিছু করতে যে তা না হলে। যাও, যা থাকে তোমার ভাগ্যে।

কি আছে ছবির ভাগ্যে? কে জানে! ছবি ভাগ্য মানে না, অধীরকা মানতো না, হাসতো।

যাবার আগে ছবি দুর্গার সঙ্গে দেখা করতে যায়। দুর্গা বলে : তুই যাবি ছবি আমি জানতাম। তুই অনেক বড় হ ভাই।

তার জ্বালাকরা চোখের দিকে তাকিয়ে অনেকদিন আগে বলা অধীরকার কথাটা মনে পড়ে ছবির, সেই কথাটাই সে দুর্গাকে বলে : তোর মধ্যে জ্বালা আছে দুর্গা—দেখিস এমন করে তোর জীবন যাবে না। দেখিস…আমি বললাম।

এর বেশি ছবি আর কিছু বলতে পারে না, বেশিক্ষণ সে তাকিয়েও থাকতে পারে না থান-পরা, রুক্ষ, শীর্ণ এই শৈশব-কৈশোরের বন্ধুর দিকে। তারও চোখ জ্বালা করে।

চোখ জ্বালা করে অধীরকার কথা মনে পড়ে।

ভেবেছিল চুপি চুপি শূন্য ঘরখানায় ঢুকে একটু কেঁদে নেবে কিন্তু ভেজানো দরজাটা খুলেই সে চমকে ওঠে, মেঝের ওপর কাপড়ে শরীর ঢেকে কে যেন চুপ করে পড়ে আছে। ঘর থেকে অধীরকার তক্তপোষখানাকে বার করে নেওয়া হয়েছে, ঘরের এ-কোণে ও-কোণে, দেওয়ালে কোথাও তাঁর এতটুকু চিহ্ন নেই। সারা ঘরটা শূন্য-নিরাভরণ-নিস্তব্ধ; কেবল ঐ কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটার কাছ থেকে মৃদু কান্নার ধ্বনি উঠে আসছে।

নতুন দিদিমা!

ছবি চুপ করে মাথার কাছে বসে থেকে নিঃশব্দে কাঁদে। কখন এক-সময় নতুন দিদিমা যেন নতুন একটা কান্নার শব্দে নিজের কান্নাটা থামিয়ে

মুখ তুলে তাকিয়ে বলেন: কাঁদিসনে ছবি, কত কষ্ট পাচ্ছিল বল তো?—শেষের দিকে আমি পর্যন্ত ওর কষ্ট চোখে দেখতে পারতাম না। তুই, তুই তো পাস করেছিস, পড়তে যাবি শুনলাম? আমরাও চলে যাচ্ছি রে···তোর দাদু আর আমি···আমার দাদার কাছে যাচ্ছি। কি করে থাকবো বল এখানে? কি নিয়ে থাকবো?

চলেই যাক নতুন দিদিমারা। কি নিয়ে থাকবে—কেমন করে কাটবে দুটো নিঃসঙ্গ জীবন। মেয়ে মরেছে, খ্যাপা সন্ন্যাসী ছেলেটাও মরেছে—চলে যাওয়াই ভাল।

বেরিয়ে এসে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ছবি একবার অন্য শরিকদের পরিত্যক্ত ভাঙা ঘরগুলোর দিকে তাকায়। নতুন দিদিমারা চলে গেলে এ দিকটাও আস্তে আস্তে ওইরকম ভেঙে-চুরে যাবে—মাঝে মাঝে ছাদ ধসবে, মাঝে মাঝে ঝুপঝাপ ইট খসে পড়বে। ঘরের মাথায় বট, অশ্বত্থ গাছ গজাবে। নির্জন হয়ে পড়ে থাকবে একটা অংশ—অধীরকাকার ঘর।

তা হোক! ছবি দূর-দূরান্তের দিকে দৃষ্টি মেলে দেয়। অধীরকাকা বেঁচে থাকবে ওই মাঠে-ঘাটে-প্রান্তরের মানুষের মনে। ভবিষ্যৎ মানুষের মুখে মুখে অধীরকাকা শহীদ!

পূর্ণশশী একসময় ছবিকে ডেকে নিয়ে যান ঘরে। মস্ত বড় কাঠের সিন্দুকটার ডালা কাঁপা কাঁপা হাতে খুলে বার করেন একজোড়া কানে পরবার লবঙ্গ-ফুল। সে দুটো ছবির হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলেন: তোর বিয়ের সময় দেব বলে রেখেছিলাম ছবি—তা বিয়ে তো···নে তুই। যদি পড়ার জন্যে কাজে লাগে।

ছবির চোখ ভরে জল আসে। সে যাচ্ছে অনেক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়তে। সেখানে কেমন অভ্যর্থনা সে পাবে কে জানে? কত বিস্ময় আর সংগ্রাম অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে তাও সে জানে না। তবু পূর্ণশশীর চামড়া ঝুলে পড়া নিরাভরণ হাত থেকে ওই লবঙ্গ-ফুল জোড়া নিতে তার মন ওঠে না। সে ঠাকুমার হাতের মধ্যে নিজের হাত রেখে বলে: পড়ার জন্যে নয় ঠাকুমা—ও তুমি রেখে দাও।

পূর্ণশশী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলেন : রেখে দিয়ে কি হবে, ছবি? তোর বিয়ে তো আমি দেখে যেতে পারবো না……তোর বরকে। কিন্তু যাতে তোর ভাল হয় তাই করিস।

পূর্ণশশীর লোল নগ্ন গায়ে হাত বুলিয়ে ছবি বলে : ও তুমি রেখে দাও ঠাকুমা। এমনিই আমাকে আশীর্বাদ করো।

আজও মমতার চোখে জল ভরে ভরে আসছে কিন্তু সেই ছোটবেলার মতো করে ছবিকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদা চলে না—সে এখন বড় হয়েছে। এ বংশের সব কিছুকে অগ্রাহ্য করবার মতো বড়! পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়বার মতো বড়!

তাই তিনি কান্না গোপন করেন। ছবির মুখের দিকে তাকান, ইচ্ছে করে চুলে হাত বুলিয়ে দেন, তাঁর ঠোঁট কাঁপে থরথর করে : মণি ছেলে, তাকে ছেড়ে দিতে ভয় হয় না……কিন্তু তোমাকে একেবারে একা ছেড়ে দিলাম, ছবু।

ছবি বোঝে মা কি জানতে চান, কিসের প্রতিশ্রুতি চান তার কাছ থেকে মমতা। মমতার ঝরে-পড়া চোখের জল সে নিজের হাতে মুছিয়ে দেয়, বলে : যা ন্যায়, যা সত্যি আর মহৎ, আমি সেই পথেই থাকবো মা। যদি জীবনের বদলেও হয় তা।

মমতা ছবির মাথাটা এবার বুকের মধ্যে চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ওঠেন : ও-কথা অমন করে বারে বারে বলতে নেই, ছবু!

অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যায় সবাই তাকে—মা, ঠাকুমা, কাকীমা। সে বারে বারে পেছন ফিরে তাকায়, তার চোখ ভরে কেবলই জল আসে।

সবাই চলে গেলে মমতা তখনও দাঁড়িয়ে থাকেন। বাতাসে তাঁর চুল ওড়ে মাথার ঘোমটা পড়ে যায়—তাঁর দৃষ্টি মেয়েকে অনুসরণ করতে করতে হারিয়ে যায় অন্যমনস্কতায়। তিনি যেন ছবির পথের দিকে তাকিয়ে নেই—একটা সফল না হওয়া অতীতের দিকে তাকিয়ে আছেন ঝাপসা চোখে।

বোসপুকুরের পশ্চিম পাড়ের ছাতিম গাছটা এ গ্রামের সীমানা—তারপর থেকে স্টেশনের পথ। ছোটবেলায় মাঝে মাঝে ছবি এসে দাঁড়িয়ে

থাকতো এখানটায় আর অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতো স্টেশনের রাস্তাটা। একটা দিগন্তবিস্তৃত জগৎ তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতো —তখন ভেবে পেত না ওই পথ ধরে গেলে কোথায় যাওয়া যায়, কতদূর যাওয়া যায়!

আজ সেই পথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে আছে ফুলমণি, বাতাসীরা। তারা জানতে চায়ঃ শহরে যায়ে আমাগারে ভোলবানা তো? গেরামরে ভোলবানা তো?

তাকি ভোলা যায়! ছবি যে তার গ্রামের ঘাসের গন্ধ—তার প্রতিটি ঋতুবদলের গন্ধ পায়——। এ গ্রাম তার সব কিছুর সঙ্গে জড়ানো——। এ গ্রামে তার তমালের প্রতিজ্ঞা, অধীরকাকার উৎসাহ! কেমন করে ভুলবে ছবি!

কোলকাতায় চাকরি-করা সুখদার বন্ধু উমাপতি ছবিকে কোলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছেন। প্রদীপ জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে···সে আসবে স্টেশনে। সুখদা এসেছিলেন তুলে দিতে।

কুলদার সঙ্গে আসবার কথা ছিল না, কিন্তু তিনিও স্টেশনে চলে এসেছেন। কি একটা কথা তিনি ছবিকে বলতে চান। অনেকবার ছটফটিয়ে বেড়ালেন আশে-পাশে কিন্তু বলেননি।

গার্ডের বাঁশি বাজলে হঠাৎ কুলদা কাছে আসেন, ইতস্তত করেন একটু তারপর বলেন: বলিস···প্রদীপকে বলিস যেন বাড়ি আসে। রাগ করে গেছে··· আমি না ডাকলে নাকি আসবে না।···বলিস···আমি ডেকেছি।

তারপর এক তাড়া নোট বার করে ছবির হাতে গুঁজে দেন হঠাৎ: নে, ওকে দিস, তুই নিস! যখন যা দরকার লিখবি আমাকে······।

ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসে সবায়ের চেহারা। যতদূর দেখা যায় ছবি তাকিয়ে থাকে, তারপর স্টেশনটা পার হয়ে গেলে হঠাৎ তার চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। জানলার বাইরেই ছবি তা মুছে ফেলে স্থির হয়ে বসে।

তখন অন্য এক ভাবনায় সে অস্থির হয়ে ওঠে, ওখানে না গেলে পৃথিবীটাকে ধরতে পারবে না তুমি,—কে যেন একদিন বলেছিল কথাটা!

কোন্ পৃথিবী! সেখানে জায়গা হবে তো ছবির! সেই স্বার্থপর জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে টিকে থাকতে পারবে তো সে? যে নতুন ভাবনাটা তাকে চঞ্চল করে তুলেছে সেটা আনন্দের না দুঃখের—নাকি আশংকার! কিসের সঙ্গে তার মিল?

বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় মিলটাকে সে খুঁজে পায় গাড়ির গতির সঙ্গে—চলার তালে।

চলাটাই আসল—চলতে হবে।

ততক্ষণে নতুন আর এক প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে তার মন আর সমস্ত চেতনা।

সুলেখা সান্যাল ঃ জীবন ও সাহিত্য

তরুণ সান্যাল

জীবনের ঘটনা কখনও কখনও কপোলকল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়, নইলে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জাত সুলেখা সান্যালের জীবন এত আশ্চর্যজনক হবে কেন। বহুবার আমার মনে হয়েছে, তাঁর সৃষ্ট নায়িকাদের সঙ্গে তাঁর চরিত্র ও জীবনের বহু মিল আছে, তাঁর সাহিত্য যেন আত্মজীবনীমূলক। তবুও শিল্পকে যদি জীবনের চেয়ে বড়ো বলেও মানি, সুলেখা সান্যালের ব্যক্তিজীবনের পাদপীঠে তাদের ম্লান বলেই মনে হবে। বিশেষত তাঁর ১৯৫৮ সালের পরবর্তী রচনাসমূহে এত বেশি পরিচিত মানুষের মিছিল দেখা গেল যে আমি সুলেখা সান্যালের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম বলেই তাঁর সাম্প্রতিক সাহিত্যকর্মকে প্রায় আত্মজীবনী রচনা বলে মনে হয়েছে। এসব কথা আজ যদিও মনে পড়ছে, তথাপি যাঁকে 'সুলেখা দি' বলে ডাকতুম সেই অতি পরিচিত লেখিকাকে অনেক লেখক-লেখিকাদের থেকে তফাৎ করে দেখতে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তিনি জীবনের শেষদিকে কলকাতার পরিচিত সাংস্কৃতিক সমাজ থেকে এত দূরে এবং এত বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতেন যে নানা সংঘর্ষ ও নিন্দাপ্রশংসার বাইরে সাহিত্যকর্ম, কেবলমাত্র জীবন ও সাহিত্যের জন্য বেঁচে থাকতে, তিনি মৃত্যুর কৃষ্ণ যবনিকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আশ্চর্য মানসিক শক্তি নিয়ে আত্ম-পরীক্ষা দিয়ে গেলেন। শ্রীযুক্তা সুলেখা সান্যাল দুরারোগ্য লুকোমিয়া বা রক্তের কর্কট রোগে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে বর্ধমানে তাঁর পিত্রালয়ে, গত ৪ঠা ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সাহিত্যকর্মীর সাহিত্যই তাঁর একমাত্র পরিচয়, একথা মেনে নিয়েও আমরা বলব, সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে তাঁর আত্মজীবনের বহু ঘটনার বিম্বন দেখা যায়। সুলেখা সান্যালের অধিকাংশ রচনাই আত্মজীবনীমূলক একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যে ভাগ্যের সঙ্গে দ্বৈরথে শ্রীযুক্তা সান্যাল পরাজয় স্বীকার করেন নি; সেই ভাগ্য যদি পুরুষশাসিত—কী প্রচলিত, কী প্রগতিশীল—সংস্কৃতিসেবীদের বিচারের শেষ পর্যন্ত মানদণ্ড হয়ে থাকে, তবে, কলুষকল্মষসাপেক্ষ মধ্যযুগ এবং

লোভ চরিতার্থ করার মূলধনাশ্রয়ী মনই জয়ী হবে। সুলেখা সান্যালের রচনাই তাঁর জীবনের বিপ্লববার্তা বলে গণ্য হোক, অন্তত আমি সে কথা সর্বদাই মনে রাখব।

সুলেখা সান্যাল ১৯২৮ সালের ১৫ই জুন (১লা আষাঢ়, ১৩৩৫) অবিভক্ত বঙ্গের ফরিদপুর জেলার কোঁড়কদি গ্রামে ক্রমক্ষীয়মান জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দু পুরুষ আগে এঁদের কয়েকটি নীলকুঠিও ছিল। কিন্তু তাঁর শৈশবে আর সেই পরিবারের পুরাতন মহিমা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না বললেই চলে। শিক্ষক জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা যেমন ব্যক্তিজীবনে তাঁকে শিক্ষা-জীবনের সরল নিষ্ঠা দান করেছিলেন, তেমনি মাতৃকুলের ধারায় রামতনু লাহিড়ীর ঐতিহ্যপূত অচলায়তন ভাঙার তরঙ্গভঙ্গও সে চরিত্রে দাগ রেখেছিল। তাছাড়া, কোঁড়কদি গ্রামটিরও বৃটিশরাজের পুলিশের খাতায় বিপ্লবী ও 'স্বদেশী'দের ঘাঁটি বলে নাম ছিল। উত্তীর্ণ কৈশোরে সুলেখার, অগ্রজদ্বয় এবং তাঁদের অন্যান্য বন্ধুদের নিকটে নতুন সমাজগত দর্শনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

সুলেখা সান্যালের বাল্য ও প্রথম কৈশোর কাটে চট্টগ্রামে পুত্রকন্যাহীন মাসিমার নিকটেই। যুগান্তরের 'ছোটদের পাততাড়ি'তে তাঁর সাহিত্যজীবনের হাতে খড়ি। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও শচীন মিত্র (এঁদের দুজনকেই সুলেখা সান্যালের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সিঁদুরে মেঘ' উৎসর্গীকৃত) তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম উৎসাহদাতাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৪২ সালে চট্টগ্রামে বোমা পড়ার পর তিনি স্বগ্রামে ফিরে আসেন এবং প্রাইভেট ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পরে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতায় প্রথমে ভিক্টোরিয়া পরে স্কটিশচার্চ কলেজে বি. এ. পড়েন। এম. এ-তেও ভর্তি হয়েছিলেন তারপর কিন্তু পাঠ সম্পূর্ণ করেন নি। ১৯৪৮ সালে তিনি বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহিত জীবন তাঁর নানাকারণে সুখের হয় নি।

কৈশোরেই তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা ১৩৫১ সালে 'অরণি'তে প্রকাশিত হয়। রচনাটির নাম 'পঙ্কতিলক'। ১৯৪৮-৪৯ সালের বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন, এবং নির্যাতন ভোগও করেছিলেন। সুলেখা সান্যালের ১৯৪৪ সালের পূর্বের রচনাগুলির মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জনজীবনের বিপ্লবাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গ-বিভাগের ফলস্বরূপ ছিন্নমূল পিতৃপরিবার ও বাঙালী জীবনের নিদারুণ দুর্ভোগ তাঁকে জীবনের কঠিন পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। কলকাতায় শিক্ষয়িত্রী হিসাবে

নিদারুণ সংগ্রামে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে সংযুক্ত থেকে তিনি কখনই সাহিত্যশিল্পকে বর্জন করেন নি বরং বাঙালী সংগ্রামশীল নারীর অনন্য অভিব্যক্তি তিনি নানা কাহিনীর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

সুলেখা সান্যালের সৃষ্ট চরিত্রগুলির অধিকাংশই নারী চরিত্র। যারা সামাজিক বিচারে, অর্থনীতির হাটে উপযুক্ত মূল্য না পেলেও হেরে যায় না। সম্ভবত এই বিচারে সুলেখা সান্যালের 'সিঁদুরে মেঘ' গল্পপুস্তকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ('সিঁদুরে মেঘ' নামে গল্পটি জনৈক চিত্রপরিচালক ব্যবহার করবেন বলে ইতিপূর্বেই কনট্রাক্ট করেছেন)।

সুলেখা সান্যালের সাহিত্যকর্মকে মোট দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে তাঁর ১৯৫৪ সালের রচনাগুলি পড়ে। এই রচনাগুলির চরিত্র তাঁর একমাত্র প্রকাশিত উপন্যাস 'নবাঙ্কুরে' (প্রথম সংস্করণ ১৩.২, ২য় সংস্করণ ১৩৬৭, নয়া প্রকাশ) এবং গল্পগ্রন্থ 'সিঁদুরে মেঘ'-এ স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে। নবাঙ্কুর-এ নায়িকা বালিকা ছবির ক্রমে ঘাতপ্রতিঘাতে যুবতী হয়ে ওঠার কাহিনী। ভেঙে পড়া একান্নবর্তী বনেদী পরিবারের মেয়ে ছবির গ্রামের স্বদেশী অধীর কাকার সাহচর্যে, মা মমতার বেদনায় অভিষিক্ত হয়ে, লেখাপড়া শেখার জন্য পিসিমার সঙ্গে শহরে যাওয়া, তারপর গ্রামে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে এসে সাধারণ মানুষের বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া প্রভৃতি দিকগুলি মোটা দাগে আঁকা হয়েছে। 'নবাঙ্কুর' সুলেখা সান্যালের একটি অত্যাশ্চর্য ও অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। 'সিঁদুরে মেঘ'-এর গল্পগুলির মধ্যে অবিস্মরণীয় নাম-গল্পটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শিকার মালতী ও অনন্ত ঘর বেঁধেছে। দুজনেরই অতীত জীবনে দুঃখ ছিল। মালতী যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বাবাকে ও সংসার বাঁচাতে কালো ধলা অফিসারের লোকের শিকার হয়েছিল। অনন্ত তার আগের বউটিকে কনট্রাক্টের লোভে কর্তাব্যক্তিদের হাতে তুলে দিয়েছিল। দু জনের সম্পর্কের মলিনতা দুজনেই চোখের জলে ধুয়ে দেয়, নায়ক অনন্ত বলে, "তুমি তো দেখেছ রাতে ঘুমোইনে আমি। ঘুমোব কি—? শান্তি পাইনে যে। এমন ভয় ধরে গেছে মনে। উঠে তোমাকেই পাহারা দিই···গাছটা উড়িয়ে নিয়ে গেছে বলেই তো চারাটাকে আরও সাবধানে রাখতে চাই।" 'জীবনায়ন' গল্পের নায়িকা সীমা বেকার স্বামী ও বৃদ্ধা শাশুড়ীর সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম। দুঃখের সংসারে আগন্তুক শিশুটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। ঘর থেকে একদা বেরিয়ে যাওয়া মেয়ে লতা (অন্তরায়) এবং 'ছোটমাসী'র (ছোটমাসী) নতুন

মর্যাদা আমাদের সামাজিক সমস্যার অন্য একটি দিককে স্পষ্ট করে তুলেছে। ঘর থেকে উৎখাত উদ্বাস্তু মা তার শিশুটিকে ('আমার মানিক সোনারে পিষ্যা মারল কেন অরা ? আমি পারি নাই রাখতে') জেলখানায় বন্দিনী মায়ের ভূমিষ্ঠ নবজাতকের মধ্যে ফিরে পায় (জন্মাষ্টমী)।

এককথায় বলতে গেলে সুলেখা সান্যালের 'সিঁদুরে মেঘ' বইখানি বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'নবাঙ্কুর', 'সিঁদুরে মেঘ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের প্রথম ধারায় উল্লেখযোগ্য রূপায়ণ।

ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনার কথা প্রসঙ্গত বাদ দেওয়াই ভালো। বিশেষভাবে ১৯৫৬ সালের পরবর্তী বহু ঘটনাই নানা ব্যক্তির মনঃপূত না হবারই কথা। তবে একথাটি বলা ভালো যে, কার্যত এ সময়েই তাঁর দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদ ঘটে এবং তিনি বর্ধমান জেলায় বড়শুল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টের বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারূপে যোগ দেন। সম্ভবত সুলেখা ব্যক্তিজীবনের এ সময়ে এমন ভুল করে বসেছিলেন যে ভুল শোধরাবার আর এ জীবনে অবসর হলো না। কিন্তু ভুল করেছিলেন বলেই বোধ হয় ভালোবাসা, প্রীতি, ঘৃণা নামক মানসিক যে বোধগুলিকে তিনি পূর্বতন রচনায় বিচার করেন নি, সেগুলিকে নতুন করে তাঁর বিচার করতে হলো। এতে তাঁর ব্যক্তিজীবনে কী লাভ লোকসান হলো তা তিনিই শেষ দিন পর্যন্ত মনে রেখেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি এই প্রচণ্ড ব্যর্থতা থেকেই পেলাম।

শ্রীযুক্তা সান্যালের ১৯৫৭ সালে লিলুকোমিয়া রোগ ধরা পড়ে। ডাক্তারদের মতে অন্তত আরও দু বছর আগেই এ রোগের আক্রমণ হয়েছিল ১৯৫৫ সাল থেকে। তখন ~~পর্যন্ত~~ তিনি খুব উল্লেখযোগ্য কোনও রচনা প্রকাশ করেন নি, ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েনে তিনি তখন অত্যন্ত উৎক্ষিপ্ত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে লুকোমিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করেন। ভারত সরকারের পাশপোর্ট দপ্তর অতিক্রুত তাঁর ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করে দেন। মিসেস কস্টের অধীনে তিনি মস্কোয় লেনিন হাসপাতালে চিকিৎসিত হন (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মহামতি লেনিনের শরীর থেকে বুলেট বের করার জন্য এই হাসপাতালেই অস্ত্রোপচার হয়)। সোভিয়েত স্বাস্থ্য মন্ত্রণা বিভাগ ও ভারতীয় ছাড়পত্র

দপ্তর সুলেখা সান্যাল ও তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধবের নিকটে এজন্য ধন্যবাদার্হ।

মস্কোয় তিনি নিরাময়ের দিকেই চলেছিলেন, সেখানে পেয়েছিলেন সোভিয়েত কর্মীদের আন্তরিক প্রীতি ও সহানুভূতি। শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীযুক্তা সান্যাল তা স্মরণ করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন মানুষের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অসামান্য। নিরাময়ের পূর্বেই তিনি ভারতভূমিতে ফিরে আসেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের হেমাটোলজির অধ্যাপক ডাঃ জে. বি. চ্যাটার্জির চিকিৎসাধীনে ছিলেন। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি মস্কোতে ছিলেন।

মৃত্যুর কালো ছায়ার নিচে থেকেও সুলেখা সান্যাল জীবনের প্রতি মমতা হারান নি। যেন মৃত্যুকে পরাভূত করবার জন্যই তিনি ১৯৬১ সালে বি. টি. ডিপ্লোমার অধিকারিণী হলেন; ১৯৬২ সালে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে অনার্স ডিগ্রি পান। তিনি এম. এ. পরীক্ষা দেবারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মাঝে মাঝে রক্ত পরিবর্তন করে যাঁকে বেঁচে থাকতে হয়েছে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অদম্য মনের শক্তির জোরে ১৯৫৫ সাল থেকে মৃত্যুকে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

মস্কো থেকে ফেরার পর সুলেখা সান্যাল কলকাতার সাহিত্য সংস্কৃতির জগৎ থেকে প্রায় নিজেকে গুটিয়ে এনেছিলেন। তাঁর অতি শুভানুধ্যায়ী অনেকেই তাঁর সংবাদও ভুলে গেছেন। তাঁর অতি পরিচিত সাহিত্য সহকর্মীর অনেকে তাঁর সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। আমার সৌভাগ্য যে আমি তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষদিকের বহু তথ্যই জানি বলে। জানি, কী নিদারুণ বেদনাকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সাহিত্যকর্মে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। অপস্রিয়মান জীবনের রৌদ্রটুকু ধরে রাখার জন্য তাঁর আকু...

...ন জড়িয়ে রেখেছিল!

...তাঁর যে রচনাগুলি

এবং পুরুষের রৌপ্য অনুসরণে ব্যয়িত হতে চলেছে। অনেক সময় মানুষ ঘটনাক্রমে শিকার হয়ে পড়ে। তবু সে ঘটনাগুলি যে অপরের জীবন পুরোপুরি নষ্ট করে দিতে পারে সেকথা আমরা যেন ভুলে না যাই। জীবনের প্রবাহ নানা ধারা-উপধারায় কখনও সংঘর্ষে, কখনও মিলিত প্রধাবনে বয়ে চলেছে ঃ মানুষ যেন তার আপাত বহিরঙ্গ দেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে। সুলেখা সান্যাল যেন শেষ জীবনে পলকের জন্য জীবনের ধারাপ্রবাহের মেলবন্ধনটি আবিষ্কার করেছিলেন, যা ব্রহ্মবাদিনীদেরই একমাত্র আয়ত্তাধীন। 'উলুখড়', 'একটি মামুলি গল্প', 'খোলা চিঠি', 'যে গল্পের শেষ নেই' প্রভৃতি আত্মবিশ্লেষণ-মূলক গল্পগুলির পরিণতি 'দেয়াল পদ্ম'। 'দেয়াল পদ্মে'র নায়ক সঞ্জয় নায়িকা 'অসীমা'র ভগ্নিপতি। অসীমা ডাক্তার। অসীমা মধ্যপ্রদেশের এক হাঁসপাতালে কাজ করে তার ব্যর্থ দিনগুলি সেবা দিয়ে ভরিয়ে রাখে। অসীমার পিতৃ পরিবারের ধারণা সঞ্জয় তার স্ত্রীকে খুন করেছে, অথচ শিশু দুটিকে মানুষ হতে দিচ্ছে না। সঞ্জয় পাকিস্তানের সম্পত্তি বিক্রী করা টাকায় একটি বিশাল জোতের পত্তন করে, শুকনো মাটিতে ফসল ফলাবার চেষ্ট করে। কিন্তু ফসল ফলে না, ঝড় বন্যা অনাবৃষ্টি লেগেই আছে। অসীমা এসেছিল সঞ্জয়ের কাছে, তার বোনের শিশু দুটিকে নিয়ে যেতে। সঞ্জয় অসীমাকে বলল, তার বোন অর্থ ও শহুরে চাকচিক্যের লোভে তাকে ছেড়ে, শিশু দুটিকে ফেলে একটি আধুনিক চৌকস যুবকের সঙ্গে পালিয়েছে। অসীমাও তার নিজের কথা বলে। বহু কষ্টে কলকাতায় ডাক্তারী পড়া শেষ করে তার দয়িত অশোকের সঙ্গে মিলতে লণ্ডনে যায়। কিন্তু অশোক সেখানে একটি সস্তা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না-করা ঘর বেঁধেছে। সেই মেয়েটি লরা অশোককে ছাড়ে না, অশোক ..অসীমাকে কথা দিয়েছিল শুনে বলে, "কথা? কথার কি দাম? তাও ওই

প্রকাশ করেন নি, ব্যমেয়ে! তোমার বন্ধু চন্দ্র চক্রবর্তী কথা দেয় নি আমাকে" ...তাস্ত উৎক্ষিপ্ত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে না আমার পেটে?...ওকে দ... ...স্থ্য মন্ত্রণালয়ে লুকোমিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থাপনার জন্য কলকাতায় ফে... ...ন। ভারত সরকারের পাশপোর্ট দপ্তর অতিদ্রুত তাঁর ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করে দেন। মিসেস কস্টের অধীনে তিনি মস্কোয় লেনিন হাসপাতালে চিকিৎসিত হন (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মহামতি লেনিনের শরীর থেকে বুলেট বের করার জন্য এই হাসপাতালেই অস্ত্রোপচার হয়)। সোভিয়েত স্বাস্থ্য মন্ত্রণা বিভাগ ও ভারতীয় ছাড়পত্র

ভীষণ উঁচুতে ফোটে···ও জিনিস নাকি ওই রকম নির্জন আর ঠাণ্ডা আর পোড়ো বাড়ির গা ছাড়া জন্মায় না।"

সুলেখা সান্যাল তাঁর সাহিত্যকে বুঝি ঐ দেয়াল পদ্মই ভেবেছিলেন। নাকি কোনো বাংলাদেশের মেয়ে? তার জীবনের লতাটি কোন পোড়ো মন্দিরের দেয়াল বেয়ে সুন্দর হয়ে ফুটে উঠে ঝরে পড়ে গেল। হায়, লতাটি যে মন্দির বেষ্টন করে উঠেছিল, একদা সে মন্দিরের অন্তরেও বিগ্রহ ছিল। সুলেখা সান্যালের জীবন ও সাহিত্য অভিন্ন। আমি তাঁর সাহিত্য অন্বেষণ করে মন্দিরের দেবতাটিকে অন্বেষণ করি না, কেন না আমি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকেই শিখেছিলাম, যে দেবতা জীবনকে স্খলন পতন ত্রুটি সত্ত্বেও ফুটে উঠতে দেন, সেই দেবতা মানুষকে খাটো করেন না, তিনি অমর। তাই বুঝি সুলেখা সান্যাল তাঁর দেয়াল পদ্মের নায়িকাকে অসীমা নাম দিয়েছিলেন।

আত্মজীবনীমূলক রচনায় তখন তিনি নতুন বাঁকে এসেছিলেন,—যেখান থেকে জীবনের নিগূঢ় অভাবনীয় সত্যেরই অনুভূতি জন্মায়—তখনই অকালে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল।

পরিচয়

পৌষ। ১৩৬৯